সঞ্জয় ভট্টাচার্য্য

সবিতা প্রকাশ ভবন
১৭-এ, মনোহরপুকুর রোড, কলিকাতা-২৬

দ্বিতীয় সংস্করণ
আশ্বিন, ১৩৬৬

প্রচ্ছদশিল্পী : শ্রীসুবোধ দাসগুপ্ত

দাম : আট টাকা

প্রাপ্তিস্থান : শ্রীগুরুলাইব্রেরী
২০৪, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

সবিতা প্রকাশ ভবন পক্ষে প্রকাশক শ্রীসুকুমার দত্ত,
১৭-এ, মনোহরপুকুর রোড, (ত্রিতল) কলিকাতা- ২৬
মুদ্রাকর : শ্রীভোলানাথ হাজরা, রূপবাণী প্রেস
৩১, বাদুড় বাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

রাত্রির অভিযাত্রীদের

"যেথা ঢেকে রেখে দেয় দিনশ্রীর অরূপ সম্ভারে
সেথায় করিতে লাভ সত্য আপনারে
খেয়া দেয় রাত্রি পারাবারে।" —রবীন্দ্রনাথ

১৯৩৯

এক

ছোট্ট ঘরটাতে সুদাস পায়চারি করছিল। দু'পা হাঁটলেই জায়গা ফুরিয়ে যায়—মোড় ফিরতে হয়। মোড় ফিরে টিনের তোরঙ্গ, ছোট একটা আলনা আর ভাঙা চেয়ারের ফাঁকে অলিগলি ঘুরে হাঁটার পথ একটু বড় করে নেয়। এখন তবু তক্তপোষটা নেই—তিনটাকা বারো আনার তক্তপোষ, কিন্তু জায়গা জুড়ে ছিল অনেকখানি। সে-জায়গাটা এখন ফাঁকা। সেখানেই অনেকক্ষণ হাঁটা যায়। সুদাস হাঁটে।

কালও এম্নিসময় তক্তপোষটা এখানে ছিল আর তার মা। তিন বছরের অভ্যস্ত ছবি চোখের উপরে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছেনা। কিন্তু চোখ থেকে যেন মুছে যায়নি সে-ছবি। অভ্যাসমত চোখের স্নায়ুগুলো নড়ে চড়ে পুরোণো ছবির পুরোণো অনুভব তৈরী করে তোলে। সুদাস সরে এসে ফাঁকা জায়গাটার দিকে চেয়ে থাকে। স্পষ্টই দেখ্‌তে পায় সে, তার মার অসহায় চোখ দুটো—চার বছর পঙ্গু, শয্যাশায়ী থেকে যে উজ্জ্বল চোখ অসহায় হয়ে গিয়েছিল!

আশ্চর্য লাগে সুদাসের, ফাঁকা জায়গা থেকে গোটা একটা মানুষের চেহারা উঠে এসে কি করে তার চোখে এম্নি সজীব হয়ে উঠ্‌ল! কোনো চিহ্ন সে রাখেনি মার—আল্‌নাতে একটা কাপড় পর্য্যন্ত না। টিনের তোরঙ্গ থেকে খুলে খুলে সব কিছুই মার সঙ্গে সে ছুঁড়ে দিয়েছে—এমন কি গরদের শাড়িটাও, বাবা বেঁচে থাকতে মা যেটা পরতেন। ঘর থেকে মাকে মুছে পরিষ্কার করে দিতে চেয়েছিল সুদাস। তাহলে যদি মন থেকে তাঁকে মুছে ফেলা যায়। যে মরে গেল—জীবিতের জীবনের কাছে তার আর কি দাবী আছে! মন থেকে তাকে মুছে ফেলাই ভালো।

চোখের পাতা ভারি হয়ে আস্‌ছিল সুদাসের। মৃতের দাবী নিয়ে তর্ক তুলে চোখের পাতা সে হাল্কা করে নিলে। এ-চোখ নিয়ে এখন বাইরে রাস্তার দিকে সহজভাবে তাকানো যায়। বারান্দার রেলিং-এর উপর ঝুঁকে খানিকক্ষণ রাস্তার দিকেই তাকিয়ে থাক্‌তে চাইল সুদাস। কিন্তু সত্যিই কি সে রাস্তার দিকে তাকিয়ে ছিল—ঘরে ঢুক্‌তে ঢুক্‌তে মনে করতে চেষ্টা করল—এতক্ষণ রাস্তার দেবদারু চারার মাথায় চোখের সামনে কি ছিল না তার মারই মুখ ? তাছাড়া ঘরেও বা সে ঢুক্‌তে গেল কেন এখন ? ওই ফাঁকা জায়গাটাইত তার চোখদুটাকে টেনে নিচ্ছে ! সুদাস টানাটানি করে আল্‌না আর তোরঙ্গ দিয়ে ফাঁকা জায়গাটা ভর্তি করে দিলে। মনে হল, যেন সে পরিশ্রান্ত হয়েছে, যদিও পরিশ্রান্ত হবার কোনো কারণই নেই। চেয়ারে বসে পড়ে ভাবছিল সুদাস পরিশ্রান্ত হবার হয়ত তার কারণ আছে—কেননা পায়চারি করেছে সে অনেকক্ষণ। কিন্তু তাই কি কারণ ? এ কি সত্য নয় যে এ-ঘরটা ছেড়ে সে যেতে পারছেনা ! তার মার ঘর। আজ আর মার ঘরে না এসেও নিজের ঘরে সে বসে থাক্‌তে পারত। পারত চাকরকে ধরে রেখে দুপুরটা তার সঙ্গেই আলাপ করে কাটাতে। একরকম জোর করেইত সীধুকে সে বাইরে বেড়াতে পাঠিয়ে দিয়েছে—তারপর সদরদরজায় আগল তুলে দিয়ে চুরি করে এসে ঢুকেছে মার ঘরে। মাকে একা পাবার জন্যেই হয়ত তার এই ষড়যন্ত্র—দুর্ব্বল হবার জন্যেই এ আবহাওয়া তৈরী করে নিয়েছে সে।

দুর্ব্বলতার হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে নিতে আর চেষ্টা করলনা সুদাস। মার মুখটাকে চোখের উপর সযত্নে, সন্তর্পণে তুলে ধরতে চাইল। মুখের প্রত্যেকটি রেখা—মসৃণ আর রুক্ষ, ম্লান আর উজ্জ্বল, হুবহু মনে পড়ে যাচ্ছে তার। পেছন থেকে কতগুলো মুহূর্ত্ত যেন সুদাস ছিনিয়ে নিয়ে এলো। সেই মুহূর্ত্তের মৃদু কলরবে

নিবিড় হয়ে এলো জীবনের উত্তাপ—জীবন নিয়ে বেঁচে উঠলেন তার মা। বেঁচে উঠলেন সুদাসের মনে। সুদাসের তা-ই মনে হল। মনে হলনা, মার জীবনটা মাত্র যে তার মনে ভেসে উঠেছে।

এই দীর্ঘ ষাট বছরের জীবন থেকে কি পেয়ে গেলেন মা? প্রশ্নটা সুদাসেরই—মার মনে হয়ত এ প্রশ্ন আসেনি কোনদিন। প্রশ্ন করবার মন নিয়েই গড়ে ওঠেন নি মা। হয়ত জীবনের মানে ছিল তাঁর কাছে শুধু বেঁচে যাওয়া। বেঁচে থাকতে হলে অত্যন্ত সহজভাবে যে ছোটখাট দাবীগুলো মেটানো যায় তার বাইরে দৃষ্টি তাঁর পৌঁছয়নি কোনোদিন। জীবনের এই মানে ধরে নেওয়াও বা মন্দ কি? ছোট ছোট আশা পূরণ করে যদি নিরুত্তাপ, ঠাণ্ডা রাখা যায় জীবন, তা কি ভালো নয়? জীবনের গায়ে জ্বর এনে অনবরত ছটফট করাই কি ভালো?

ভালো—ভালোই ছিল মার জীবন—শপথের মতো জোর দিয়ে মনে মনে উচ্চারণ করল সুদাস। গাঁয়ের স্নিগ্ধ আবহাওয়ায় হয়ত স্নিগ্ধ হয়ে উঠেছিল—তাঁর শৈশব আর কৈশোর। ১৮৮০-র বাংলাদেশের পাড়া-গাঁ, এখনকার মতো দুর্ব্বহ জীবন নয় যার। মাটির নিবিড় সবুজের মতোই মেয়েদের ছিল নিবিড় স্বাস্থ্য—চোখ ছিল গাঢ় নীল আকাশের মতই চকিত। অন্ধকারে, জ্যোৎস্নায়, তারাভরা আকাশে—বর্ষায়, হেমন্তে লুকোনো ছিল তাদের জন্য কত কুহক, কত রহস্য। ব্রতকথার স্বপ্ন দিয়ে মন হয়েছে তৈরী—তারপর সেই স্বপ্ন থেকেই একদিন নেমে এসেছে শিব, পার্ব্বতীকে নিয়ে যাবার জন্যে।

বিয়ের এই মানেই হয়ত ছিল মার কাছে—এই স্বপ্ন। স্বামীর কাছে কিছু চাওয়ার ত ছিলনা তাঁর—জীবনে তাঁর শিবের আবির্ভাব হয়েছে, এই ঢের। সেই আবির্ভাবের ঋণ-শোধ করাই তাঁর কাজ। সুদাস জানেনা দেখ্‌তে কেমন ছিল তার বাবা যৌবনে—ছেলেবেলায় যখন বাবাকে দেখেছে, তখন তাঁর চেহারায় ছিল প্রৌঢ়ত্বের ছোঁওয়া।

তবু মনে পড়ে, তাঁর খড়্গের মতো নাক—আর বিশাল চোখ; তার সঙ্গে মনে পড়ে নন্দলাল বসুর আঁকা শিবের ছবি।

হয়ত সার্থকই হয়েছিল মার কৈশোরের স্বপ্ন। তারপর তাঁর জীবনের পরিধি জড়িয়ে ধরল আর দু'টি মাত্র প্রাণীকে—একটি মেয়ে, আরেকটি ছেলে। সুলেখাকে যে পরের ঘরে তুলে দিতে হবে একদিন, সে খেয়ালও যেন ছিল না তাঁর। পেছনে তাকিয়ে যতদূর মনে করতে পারে সুদাস—দিদিকে সে দেখতে পায় মারই সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো। সে ছায়া যখন ছিলনা দিদির বিয়ের পর মার স্নেহের উত্তাপ যেন কতকটা নির্ম্মমই মনে হত সুদাসের কাছে। চোখের একটু আড়াল হবার আর তার উপায় ছিলনা—ছলছল করে উঠ্‌তো মার চোখ, অভিমানী ছোট মেয়ের মতো।

চেয়ার ছেড়ে হঠাৎ সুদাস দাঁড়িয়ে গেল। স্মৃতি শুধু ক্লান্তির ভাটার টানেই টেনে নেয়না, উত্তেজনার জোয়ারেও মনকে কাঁপিয়ে তোলে। দেয়ালের কাছে সরে গিয়ে সুদাস হাতের পাঞ্জা দিয়ে চেপে ধরলে দেয়াল। তক্তপোষের উপর যখন উঠে বস্‌তেন বা শুয়ে থাকতেন মা, এই দেয়ালেই তাঁর ছায়া পড়ত। দুদিন আগেও এই দেয়ালে সে-ছায়া ছিল। মরবার আগেকার সেই অসহায় মুখ মরবার পর সেই শান্ত, তৃপ্ত মুখ—সব—সব মুখই একেকবার ছায়া ফেলে গেছে এই দেয়ালে!

সুদাসের চোখে মার অনেক মুখই ভেসে ওঠে। মুখের মিছিল। যেদিন সুদাস চাকরি করতে চলে আসে কলকাতায়, সেদিনকার মুখ—বাবা যেদিন মারা যান সেদিনকার মুখ—তারপর অবশ শিথিল শরীর নিয়ে মেয়ের সেবা-প্রার্থী হয়ে যেদিন ঢাকা চলে গেলেন, সেদিনকারও মুখ। মৃত্যুরই ছোট ছোট আঘাতে বিহ্বল প্রত্যেকটি মুখ, তেম্নি ব্যাকুলতা চোখে—যেন অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছে সুদাস, তাকে আর খুঁজে পাচ্ছেনা তাঁর হাত।

যা পেয়ে গেলেন, তার বাইরে কি সত্যি কিছুই পাবার কামনা

ছিলনা মার? কেমন যেন সন্দেহ আসে সুদাসের মনে। জীবনের গায়ে একটুও কি জ্বর ছিলনা তাঁর? সবটুকুই তৃপ্তি? মৃত্যু কি তাঁর নিরুপদ্রব সমাপ্তি? শেষ তিনটি বছর সুদাসের সঙ্গে এই বাড়িতে থাক্‌তে পেরেছিলেন তিনি যা ছিল তাঁর শেষ কামনা। কিন্তু ব্যাঙ্কের কাজ করে কতটুকু সময় খরচ করেছে সুদাস মার সান্ত্বনার পেছনে? তাছাড়া বাবার অবসর-প্রাপ্ত জীবনে একা তাঁর সঙ্গে মফঃস্বলের একটা সহরে পড়ে থেকেও কি খুব শান্তি পেয়েছিলেন মা? বাবাকে ভালোবাস্‌তেন সত্যি—খুবই ভালোবাসতেন—তা-ই হয়ত বাবার মৃত্যুর পর তাঁর স্নায়ুগুলো আর সুস্থ সবল থাকতে পারেনি—বিছানায় শুয়ে শুয়েই কাটিয়ে গেছেন তিনি জীবনের শেষ ক'টি বছর। কিন্তু সে-ভালোবাসার প্রতিদান কি বাবার কাছ থেকে তিনি পেয়েছেন? বাবা তাঁর মাকে [illegible]লেন খুব ছোট বয়সে—আদর পেয়ে মানুষ হতে পারেন নি তিনি—জীবনকে ভালোবাস্‌তে পারেন নি তাই। জীবনের মানেই ছিল তাঁর কাছে অপচয়। নিজেকে যে ভালোবাস্‌তে পারেনা, স্ত্রীকে সে ভালোবাস্‌বে কি করে? প্রৌঢ়ত্বের সীমায় এসে কিশোরীমনের স্বপ্ন নিয়ে মাও আর নিশ্চয়ই পরিতৃপ্ত থাকেন নি—শিবের মূর্ত্তি ভেঙে গিয়ে তার জায়গায় দাঁড়িয়েছিল এসে তখন একটি মানুষ—যে মানুষের কাছে দাবী জানানো যায়, প্রত্যাশা করা যায়। কিন্তু সুদাস জানে, মার সে দাবী পূরণ হয়নি। সুদাস আবার এসে বারান্দায় দাঁড়ায়। রাস্তার লোকচলাচলের দিকে তাকিয়ে থাকে। আজ যেন হঠাৎ সে আবিষ্কার করে, একটি পথচারীর মুখেও প্রাণের উচ্ছলতা, হাসির উজ্জ্বলতা নেই। অভিশাপগ্রস্তের মতো সবাই চলেছে, পাণ্ডুর মুখ। হয়ত সবারই জীবন অপূর্ণ। খুসীতে জীবনটাকে ঝরঝরে করে নেবার উপায় নেই কারু। এ একটা সার্ব্বজনিক দুর্ভাগ্য। শুধু তার মা-ই নন, এ দুর্ভাগ্যের হাতে সবাই গিয়ে পড়তে বাধ্য। কালিঘাট ফেরতা একটা [illegible]র

দল এইমাত্র যে চেঁচামেচি করে রাস্তা পার হল, কতটুকু পূর্ণতা আছে তাদের জীবনে ? একটু আগে একটা ডজ্ গাড়ির গহ্বরে যে বুড়ো দম্পতির সাদা চুল উড়তে লক্ষ্য করল সুদাস, তাঁরাও কি জীবনের সম্পূর্ণতায় তৃপ্ত ? মনের সুনিপুণ ভৃত্য নয় জীবন ; জীবন যে-ঘটনা তৈরী করে চলে, মন তা নিয়ে আরামে চোখ বুঁজে থাক্‌তে পারেনা। বস্তুর নিয়মেই জীবন চলে—মন তাকে চালাতে চায় মনের নিয়মে—যা অসম্ভব। তাই একা একা পুড়তে থাকে মন—পুড়ে ছাই হয়ে যায়—ছাই-এর মতো নিরুত্তাপ পাণ্ডুর দেখায় শেষটায়। হয়ত সেই পাণ্ডুরতারই নাম বার্দ্ধক্য।

মার ঘরের ভেতর দিয়ে হেঁটে নিজের ঘরে চলে আসে সুদাস। সৈন্যের মতো নির্ব্বিকারভাবে হেঁটে—কোনদিকে দৃক্‌পাত করবার যেন সময় নেই। বিছানায় একটু গড়াগড়ি দেওয়া যাক্—ঘুম আসে ত ভালো, তাজা হয়ে বিকেলের দিকে একটু বেরোন যাবে। স্বাভাবিক হয়ে উঠবার প্রখর প্রতিজ্ঞা মনে নিয়ে টেবিলের আয়নায় সুদাস একবার মুখটা দেখে নেয়। তিন দিন ব্যাঙ্ক কামাই হচ্ছে—কাল না গেলে আর চলেনা। অখণ্ড অবসরে আজকের দিনটা খুবই ভারি মনে হচ্ছে। এত বড় দিন—কিছুই তার করবার নেই। বেদানার একটু রস কাপে করে এগিয়ে দিতে হয়না : "সীধু বল্‌লে দুপুরে আমায় ডেকেছিলে, কেন ? ভুলে বুঝি বসে আছ দুপুরে যে আমি কাজে চলে যাই !" কোন কাজই আর বাড়িতে নেই এখন সুদাসের—খেয়ে ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া। নূতন জীবনের দিকে একটু কৌতুহল নিয়েই তাকায় সে—চোখের সামনে যেন অনেকটা জায়গা ফরসা হয়ে গেছে, যেন অনেকখানি আলো এসে লাগ্‌ছে চোখে।

ঘুম তার আসবেনা—সুদাস জানে। শুয়ে থেকে তবু যেন নিঝুম হয়ে আস্‌ছিল তার শরীর। নিজেকে যেন সে হারিয়ে ফেলেছে—আর হারিয়ে ফেল্‌তে ভালোও লাগ্‌ছে। নিজেকে

ঢিলের মতো যেখানে খুসী ছুঁড়ে হারিয়ে ফেল্‌তে আর কোনো বাধা নেই, নেই পেছনে টেনে রাখবার জন্যে মার শঙ্কিত চোখ। একমাত্র দিদি, প্রহরীর সামান্য সতর্কতা যার কাছে আশা করা যায়—কিন্তু সে-ও ত কত দূরে—কলকাতা থেকে অনেক দূরে, মন থেকে হয়ত আরো বেশি দূরে। বাঁচতে হলে সুদাসকে বাঁচতে হবে নিজের গৌরবে—মরলে মরতে হবে নিজের জন্যে ব্যথিত হয়ে। অসাধারণ নূতন জীবন!

ভীষণ জোরে কড়া নড়ে উঠল। সীধু কি? এতো দুঃসাহস সীধুর হবেনা। আওয়াজে বুক টিপ-টিপ করছে সুদাসের। শোওয়া থেকে উঠে পড়া তার উচিত ছিল। কিন্তু শুয়েই রইল সুদাস। যতো জোরেই আওয়াজ হোক, তার পেছনে কোনো দুঃসংবাদ নেই—দুঃসংবাদ থাকতে পারে না, তাই আর দুর্ভাবনাও নেই সুদাসের। তবু যে বুক কেঁপে উঠ্‌ল—তা শুধু শরীর-যন্ত্রেরই নিয়মে, মনের দুর্ব্বলতায় নয়।

কড়া নড়েই যাচ্ছে। ভদ্রতা-বোধ সুদাসকে ঠেলে তুলে দিলে। কারু হয়ত জরুরী দরকার আছে—ব্যাঙ্কেরই কেউ হয়ত বা। দরজা খুলে দিয়ে নিরুৎসাহ হয়ে দেখল সুদাস, এত অস্থিরতার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে চিরপ্রত্যাশিত, সুস্থির প্রবীর; পোষাকও তার চিরপুরাতন, উৎসুক হবার মতো কিছু নেই, বোতামহীন খদ্দরের পাঞ্জাবী—পায়ে ষ্ট্র্যাপ-ছেঁড়া স্যাণ্ডেল। প্রবীরের ভেতর আর কিছু আবিষ্কারের চেষ্টা না করে সুদাস সোজা এসে আবার ঘরে ঢুকে পড়ল।

তার পেছনে তাড়া করল প্রবীরের চীৎকার: "যুদ্ধ—লেগে গেছে, বলেছিলাম কিনা?"

সুদাস ভাব্‌ছিল মাতৃ-বিয়োগে সমবেদনা জ্ঞাপন করতে প্রবীর তার কাছে চুপ করে বসে থাক্‌তে এসেছে—তা-ই নিয়ম, বন্ধুরা তা-ই করে থাকে। প্রবীরের আবির্ভাব প্রথম—তারপর আরো

আস্‌বে। প্রবীরের কথায় তাই অবাক্‌ হয়ে গেল সুদাস। একটু ভালোও লাগল। পেছন ফিরে দেখ্‌ল ভাজ-করা এক শীট দৈনিক কাগজ হাতের মুঠোয় নিয়ে প্রবীর উত্তেজিত হয়ে আবার যেন কি বল্‌তে যাচ্ছে।

সুদাস প্রবীরকে আর সময় দিলেনা: "যুদ্ধ? কে বাধালে?"

"কে আবার? রণকামুক হিটলার!" সশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে প্রবীর বসে পড়ল—উত্তেজনা থামিয়ে এখন যুদ্ধের কূটনৈতিক পাকচক্রের আলোচনায় মন দিতে হবে।

"যুদ্ধ লাগ্‌বে এতো জানাই ছিল। ওটা অমৃতবাজার স্পেশ্যাল?"

কাগজটা সুদাসের হাতে তুলে দিয়ে প্রবীর বল্‌লে: "হিটলারের ছবির নীচে ফ্যানাটিক লেখা—উপযুক্ত পদবী।"

খুব উৎসাহ বা উত্তেজনা ছিলনা সুদাসের চোখে—একটা ক্লান্তিকর খবরের উপর যেন সে চোখ বুলোচ্ছে। পোল্যাণ্ড যেন তার এই হাজরা রোডের ঘর থেকে অনেক দূরে। অথচ সাতদিন আগেও পোল্যাণ্ড এত দূরে ছিল না। দূর বলে কি, ছিল একেবারে গা-ঘেঁসে। সমস্ত য়ুরোপ তাদের জীবনের উপর ঝুঁকে ছিল—সে, প্রবীর, রঞ্জন, শমীন অনেক পরমায়ু খরচ করেছে য়ুরোপের সমস্যার উপর। সমস্ত পৃথিবীকে জড়িয়ে বিশাল অস্তিত্বের একটা অনুভব তৈরী করে এতদিন তৃপ্তি পেয়েছে সুদাস। এমন কি একেক সময় উৎফুল্ল হয়ে ভেবেওছে যে চরিত্রে বুঝি তার উদারতা শিকড় মেলে দিয়ে বস্‌ল। এখন সন্দেহ হয়। মনকে সে য়ুরোপের যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে তুল্‌তে পারছেনা। পৃথিবী যেন তাকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে হাজরা রোডের এ বাড়িটার ভেতর—বাড়িটার ভেতরও ঠিক নয়, বাড়িটায় একটা ঘরের ভেতর, তার মার ঘরে। একটু আগে ভাবছিল সুদাস, মা মরে গিয়ে অনেকখানি আলো এসে লেগেছে তার চোখে—হয়ত লেগেছে। কিন্তু সে-আলোতে দেখ্‌তে পাচ্ছে সুদাস নিজেরই

একটা সঙ্কীর্ণ সত্তা—উদারতার ফাঁপা মানুষটা চুপ্‌সে গিয়ে সঙ্কীর্ণতার শক্ত কঙ্কাল বেরিয়ে পড়েছে।

এত দীর্ঘ সময় চুপ করে বসে থাক্‌তে আসেনি প্রবীর—কিন্তু সুদাসকে চুপ করে থাক্‌তে দেখে কথা বল্‌তেও সাহস হচ্ছিল না। সুদাসের উপর বিরক্ত হয়ে উঠ্‌তে গিয়েও সাম্‌লে নিলে সে—হঠাৎ যেন মনে পড়ল, মাত্র কাল সুদাসের মা মারা গেছেন। এত বড় কথাটা ভুলে গিয়ে ঘরে ঢুকেই যে চেঁচামেচি করতে সুরু করেছিল, বরং তার জন্যেই তার অনুতাপ হচ্ছিল এখন। মুখটা যথাসম্ভব কাতর করে সুদাসের দিকে চেয়ে রইল প্রবীর।

কাগজ থেকে মুখ তুলে সুদাসই কথা বল্‌লে: "যুদ্ধ ত সবাই চেয়েছিল—হিটলার তা হলে ফ্যানাটিক হতে গেল কেন?"

"পরের স্বাধীনতার উপর যার এতো আক্রোশ—ফ্যানাটিক বিশেষণ তার পক্ষে খুবই হাল্কা—আরো জোরালো একটা গালাগাল তৈরী করা দরকার।" এক মুহূর্ত্তেই প্রবীর তার অনুতপ্ত মুখটাকে উত্তেজনায় ভরে তুল্‌ল।

"তোরা কম্যুনিষ্টরা ধনতন্ত্রের পতনের জন্যে একটা যুদ্ধ কায়মন-প্রাণে আকাঙ্ক্ষা করছিলি নে?"

"সে-যুদ্ধ মানে পোল্যাণ্ড আক্রমণ নয়—"

"এ যুদ্ধও পোল্যাণ্ড ছেড়ে গত যুদ্ধের মতো পৃথিবী আক্রমণ করতে পারে।"

"তুই ত প্রো-হিট্‌লার ছিলিনে দাসু—হঠাৎ তুই হিটলারের পাগলামি সমর্থন করতে সুরু করলি কোন্ হিসেবে?"

সুদাস তার্কিক হয়ে উঠ্‌ছিল ধীরে ধীরে: "প্রথমত আমি প্রো-হিট্‌লার নই। তোর গালাগালির সুবিধের জন্যে যদিও তা আমাকে হতে হয় তাহলেও কম্যুনিষ্টদের কিছু বলবার থাকে না। কেননা তোদের সোভিয়েট রাশ্যার সুহৃদ-রাষ্ট্র এখনও নাৎসী জার্ম্মেণী!"

"নন্-এগ্রেশ্যন প্যাক্ট? ওত একটা স্ক্র্যাপ অব পেপার!"

"কাগজের টুক্‌রোটা ষ্ট্যালিনের পক্ষে যেম্নি, হিটলারের পক্ষেও ত তেম্নি হতে পারে !"

"পারে। তাই যতদিন মিত্রতা রাখা যায় তা-ই বা মন্দ কি ? পাওয়ার পলিটিক্সের খেলায় রাশ্যা বা পেছিয়ে থাক্‌বে কেন ?"

"বিপ্লবী রাশ্যা চেম্বারলেনের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে ?"

"এটা তোষণ নীতি নয়, কূটনীতি।"

"বিপ্লব কূটনীতি নয়, পাওয়ার পলিটিক্সও নয়। তাই যদি হত, লেনিন রাশ্যার ভাগ্য নিয়ে জারের সঙ্গে জুয়ো খেল্‌তেন, বিপ্লবের জন্যে ক্ষেপিয়ে তুল্‌তেন না লোক।"

"রাশ্যা এখনও বিপ্লবের ঝাণ্ডা তুলে বসে নেই—এখন তাকে বাঁচতে হবে।"

"এবং শত্রুর সাথে গলাগলি করতে হবে ?" আলোচনায় উদ্দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ছিল সুদাস। চোখ দুটো তার চক্‌চক্‌ করছিল। প্রবীর তার দিকে তাকাতে পারছিল না—মুখ ফিরিয়ে নিলে সে—মনে হল যেন খানিকটা অসহায়ই হয়ে পড়েছে—কথার সূত্র খুঁজে পাচ্ছে না।

"প্যাক্টটাকে গলাগলি বলা যায় না—" যেন অন্যমনস্ক থেকেই বল্‌লে প্রবীর আর তার সঙ্গে সঙ্গেই যোগ করে দিলে: "একটা সিগারেট দে দাসু—"

"গলাগলি নয় ?" সিগারেট আর দেশলাই এগিয়ে দিয়ে বল্‌লে সুদাস: "কম্যুনিজ্‌ম্‌ একটা বিপ্লবী মতবাদ—It is a struggling force against the die-hard world order—তার জিরোবার অবসর নেই, তার জন্যে সুখশয্যা তৈরী নেই। যে-শত্রুর সঙ্গে তার লড়াই, বাঁচবার জন্যে যদি তার সঙ্গেই তাকে হাত মেলাতে হয় তাহলে তার বিপ্লবী সত্তার কিছু আর বেঁচে রইল কি ? পৃথিবীর কোন বিপ্লবী মতবাদ এ ধরণের আত্মহত্যা করেনি। ক্রিশ্চিয়ানিটি রোমান সম্রাটদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে শান্তিতে বসবাস

করতে পারত কিন্তু তা করেনি বলেই ক্রিশ্চিয়ানিটির বিপ্লবীশক্তি পৃথিবীকে অভিভূত করেছে।"

মনে হলনা প্রবীর সুদাসের কথায় কর্ণপাত করছে—সিগারেটেই সে নিবিড় হয়েছিল। পরের কথায় কান না দেওয়া তার ইদানীংকার অভ্যাস—কম্যুনিষ্ট হবার আগে এ অভ্যাস ছিল না। সুদাসের কথার একটুমাত্র সূত্র ধরে প্রবীর বলতে সুরু করলে: "যে অবস্থা দাঁড়িয়েছিল তাতে রাশ্যার কি করা উচিত—এ প্রশ্নই আজ আমরা করতে পারি। রাশ্যার বস্তুনিষ্ঠতা আমরা যাচাই করব—বিপ্লবী মতবাদ নয়। পোল্যাণ্ডের স্বাধীনতার সম্মান দিতে রাশ্যা অনিচ্ছুক ছিলনা, অনিচ্ছুক ছিলনা মিত্র পক্ষের সঙ্গে যোগ দিতে; আবার ঠিক তেম্নি যুদ্ধলিপ্সু হিটলার সম্বন্ধেও তার আশঙ্কা ছিল আর তাই আত্মরক্ষারও ছিল ইচ্ছা। চেম্বারলেন রাশ্যাকে বিশ্বাস করতে পারলেন না—আত্মরক্ষার জন্যে রাশ্যা তখন আর কি করতে পারে—ওই প্যাক্ট করা ছাড়া?"

"পারত অনেক কিছু কিন্তু ষ্ট্যালিনের রাশ্যা কিছু করবে না—"

"অনেক কিছু—যথা—?"

"যথা—সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে শ্রেণীযুদ্ধে পরিণত করতে পারত—আর সে-সাহস না থাক্‌লে পারত পক্ষপাতহীন হয়ে চুপ করে বসে থাক্‌তে।" উত্তেজনা ঝিমিয়ে আস্‌ছিল সুদাসের, মনে হচ্ছিল তার এসব কথা বলার যেন কোনো মানে নেই।

দরজায় আওয়াজ হল—চোখে আতঙ্ক নিয়ে তাকাল সুদাস, প্রবীরের মতো আবার কেউ নয় ত! প্রবীরকে যেন এখন আর তার সহ্য হচ্ছিল না। তার চেয়ে সীধুও ভালো ছিল। সীধুর সঙ্গ পেলে মগজটা অন্তত বিশ্রাম পেত।

সীধুই এসেছে। স্বস্তিটা সুদাসের চেয়ে প্রবীরের কম হলনা: "এই যে সীধু—চা খাওয়া ত বাবা—কখন থেকে এসে বসে আছি, তোর দেখাই নেই!"

"উনুন ধরতে যে দেরী হবে বাবু—" সীধু বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

"দোকান থেকে নিয়ে আয় না বাবা—"

"বাবু খাবে না ?"

"কেন খাব না ? দুকাপ নিয়ে আয়"—সুদাস বল্‌লে।

রান্নাঘরে ঢুকে টি-পটটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে সীধু অন্তর্হিত হল।

অমৃতবাজার থেকে চোখ তুল্‌তে ইচ্ছা করছিলনা সুদাসের—পাছে তার মুখের বিরক্তি প্রবীরের চোখে ধরা পড়ে যায়। শত হোক প্রবীর তার বন্ধু—অসহ্য ঠেক্‌লেও বন্ধু। তাছাড়া এখন অসহ্য ঠেক্‌ছে বলে কি বরাবরই তাকে অসহ্য মনে হবে ? হয়ত আরেক সময় বন্ধুর মতই প্রিয় মনে হবে প্রবীরকে। মনে মনে অপরাধী হয়ে উঠ্‌ল সুদাস।

"দোকানের চা তুই খাস না নাকি দাসু ?" প্রবীর জিজ্ঞেস করলে।

"কেন খাবো না ?" মুখ তুল্‌তে তখনও সাহস হলনা সুদাসের।

"সীধু বলছিল যে—"

"সাংঘাতিক হিন্দু কিনা সীধু—" মুখ নীচু রেখেই একটু হাস্‌লে সুদাস তারপর মুখ তুলে তাকালে প্রবীরের দিকে : "বুঝতে পারছিস্‌নে ? দোকানের চা এসময়ে খেলে পাছে নিষ্ঠাভঙ্গ হয় ওর সে-চিন্তা। পারলে ও আমায় হবিষ্যি খাওয়ায় ! কাচা নিইনি বলে ভয় পেয়ে গেছে ও !"

প্রবীরও যেন হঠাৎ সুদাসের পায়ে স্যাণ্ডেল, গায়ে গেঞ্জি আর পরণে ধোপদুরস্ত কাপড় আবিষ্কার করে অভিভূত হয়ে গেল। তারপরই সশ্রদ্ধ হয়ে উঠল তার চোখ। গাঢ় গলায় বল্‌লে প্রবীর : "I congratulate you—দাসু, তোর সাহস আছে !"

"সাহস ? মানে ?" সুদাস অসহায়ের ভঙ্গীতে চেয়ে রইল।

"সমাজকে উপেক্ষা করবার সাহস।"

"আমার সমাজ কোথায়? আমার সমাজ আমি—যা আমি বিশ্বাস করিনে, তা পালন করবার প্রয়োজন আমার নেই।"

"যাই হোক বিশ্বাস মাফিক কাজ করাটাই প্রশংসার।"

"নিজেকে নিজের বিশ্বাস মাফিক চালিয়ে নেওয়াটাও কি খুব কঠিন ? এতে এতো উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠবার ত কোনো মানে নেই।"

"বিশ্বাস যা করি তা কি সব সময়ই করা যায়?"

"না করাটা আফশোষের কিন্তু করাটা প্রশংসার নয়।" সুদাস লক্ষ্য করল আবার একটু রূঢ়তা এসে গেছে তার গলায়। প্রবীর কি ভুল বক্‌ছে—না প্রবীরের কথাগুলোই তার ভালো লাগ্‌ছে না—না কি প্রবীরের আসাটাই পছন্দ করতে পারছেনা সুদাস? কারণ যা-ই হোক, সুদাসের এ অন্যায়। প্রবীরকে একটু খুসী করে তুল্‌তে ইচ্ছা হল তার কিন্তু কি বলা যায় ভেবে বার করতে পারল না।

সুদাস জানেনা যে কথার হুল প্রবীরের কাছে ব্যর্থ। চমৎকার একটা নির্ব্বিকারত্ব আয়ত্ত করেছে প্রবীর। সুদাস যখন অনুশোচনা করছিল, প্রবীর অক্লেশে একটা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে: "আরেকটা সিগারেটই দে দাসু—সীধু হয়ত চা আন্‌তে চৌরঙ্গীতেই পাড়ি দিয়েছে।"

অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় সুদাস প্রবীরের হাতে সিগারেটের বাক্সটা তুলে দিলে। প্রবীরের উপর অন্যায় ব্যবহারের এ যেন খানিকটা প্রায়শ্চিত্ত।

ঠোঁটে একটা সিগারেট চেপে নিয়ে প্রবীর বল্‌লে: "সিগারেট খাওয়া ছেড়ে দিয়েছিস না কি তুই?"

"আজ খাইনি, ভালো লাগছিলনা"। সহজ অন্তরঙ্গ হয়ে কথা বল্‌তে গিয়েও সুদাস যেন একটু রুক্ষই থেকে যাচ্ছিল।

"আমার একটা থিওরী আছে জানিস্ দাসু। নেশা জিনিষটা

সুস্বাদু নয়, স্বাভাবিকভাবে ওটা মানুষ গ্রহণ করতে পারে না—তাই নেশা খাই আমরা বলিনে, বলি, নেশা করি। ব্যাপারটা বাধ্যতামূলকের পর্য্যায়ে, স্বাভাবিকতার পর্য্যায়ে নয়।"

একটু মাথা নেড়ে সায় দিলে সুদাস। কথা বললে না। অথচ নেশা সম্বন্ধে অনেক কথাই বলার আছে তার। মহাত্মাজির তালগাছ কাটবার ব্যাপারে, মদের সুপারিসে সুভাষ বোসের বক্তৃতার উপর বন্ধুদের মধ্যে সুদাসই কথা বলেছে বেশি। এখন কিছু বলছে না কেন সুদাস—? প্রবীরের উপর এখনও কি সে বিরক্ত? তাত' নয়। প্রবীরকে ভুল বুঝেছে বলে বরং অনুতপ্তই হয়ে উঠছিল সে। প্রবীরই হয়ত তার সত্যিকারের বন্ধু। মার মৃত্যুতে সমবেদনা জানাবার মামুলি বুলিতে ব্যথায় বা বিষণ্ণতায় তাকে ডুবিয়ে দিতে আসেনি। এসেছে সহজ স্বাভাবিক কথাবার্ত্তায় তাকে ব্যথার হাত থেকে উদ্ধার করতে। কিন্তু উদ্ধার পেতে হয়ত ইচ্ছা নেই সুদাসের। নেশা সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে যাওয়া, মনে হচ্ছিল, এখন তার পক্ষে গর্হিত। মনের শুচিতা যেন নষ্ট হয়ে যাবে তাতে। প্রবীরকেই অসহ্য মনে হয়েছিল একবার, তার সঙ্গে যুদ্ধের আলোচনা করে মনের শুচিতা নষ্ট করেছে বলে। সুদাস ভেবে স্থির করতে পারছিলনা কোন অবস্থায় তার মন স্বাভাবিকতা ফিরে পাবে। দরকার হয়ত তার প্রবীরকে—সীধুকে—হয়ত দরকার তার একা থাকবারই। হয়ত এসব কিছুই দরকার হত না, দরকার ছিল শুধু মার বেঁচে থাকার যা সে আগে মনে করেছে অবান্তর।

সীধু এল। প্রবীর যেন আশ্রয় পেল সীধুকে পেয়ে। "চায়ের দোকান-গুলো উনুন নিভিয়ে বসেছিল—না সীধু?" অ্যাশ-ট্রে-তে সিগারেট টিপতে টিপতে বল্‌লে প্রবীর।

"বিকেলের ভীড় কিনা দোকানে—" কৈফিয়ৎ তৈরী করতে সীধুর একটু দেরী হয়না।

"তা বটে—" প্রবীর সুদাসের দিকে তাকালে: "পোল্যাণ্ডে

আর কি যুদ্ধ হচ্ছে—আমাদের চায়ের দোকানগুলোতে যা সুরু হয়েছে এতক্ষণে—”

“রাস্তায়-ঘাটে খুব উত্তেজনা, না?” সুদাস এতক্ষণে স্বাভাবিক গলায় ফিরে এল।

“খুব আর কোথায়? তবে চৌরঙ্গির চেহারাটা জানিনে।”

দু'কাপ চা রেখে গেল সীধু। ঠাণ্ডা চা। সুদাস এক চুমুকে সবটুকু টেনে নিয়ে একটা সিগারেট তুলে নিলে—সেদিনের প্রথম সিগারেট।

চৌরঙ্গিতেও তেমন কোনো সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে যায়নি। শুধু খবরের কাগজের স্পেশালগুলো হিট পিকচারের টিকিটের মতো বিক্রি হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু ক্রেতাদের চোখে-মুখে কোনো উত্তেজনা নেই—নেহাৎ দায়গ্রস্ত হয়েই যেন কাগজটা তাদের কিন্‌তে হচ্ছে, বাজারে গিয়ে রোজ মাছ কেনার মতো। উৎসাহীরা সাহেবদের চলাফেরায় একটু অস্বাভাবিক চাঞ্চল্য আবিষ্কার করতে পারে—কিন্তু তা-ও হয়ত চোখের ভুল—কিম্বা সাহেবদের চলাফেরা আজ লক্ষ্যের বিষয় হয়ে উঠেছে বলেই তাদের স্বাভাবিক ক্ষিপ্রতাকে অস্বাভাবিক মনে হচ্ছে।

এস্‌প্ল্যানেড ট্রাম-টার্মিনাসের ফাঁকা জায়গাগুলোতে ঘুরে ফিরে প্রবীর বল্‌লে: “জার্মান বা ইটালিয়ান সায়েব দেখতে পাবিনে একটাও দাসু—ওরা পাড়ি দিয়েছে, না হয় ঘরে বসে ধুঁকছে। ইংরেজ যুদ্ধ ডিক্লেয়ার করল বলে—”

“ওদের চেহারা তুই আলাদা করে চিন্‌তে পারিস্—ইংরেজ আর জার্মান?” নিজের মনেই যেন হাসল সুদাস।

“ক্রুপ-সিমেন ওসব কোম্পানীর সায়েবদের কথা বল্‌ছি—জার্মান কোম্পানীগুলো।”

প্রবীরকে আর জেরা করতে ইচ্ছা করছিলনা সুদাসের—ভালো লাগ্‌ছিলনা। যুদ্ধ বেধেছে সত্যি—হয়ত খুবই বড় যুদ্ধ। কিন্তু তার হাওয়া এখানে নেই। সুদাস আশা করেছিল চৌরঙ্গির চেহারাটা হয়ত আজ অন্যরকম দেখ্‌বে। প্রবীর হয়ত অন্যরকমই দেখ্‌ছে চৌরঙ্গিকে। কিন্তু সুদাসের চোখ চৌরঙ্গি যে-কে-সে। ভাওয়ালকুমারের মামলার সময়ও হকারদের এটুকু উত্তেজনা দেখা গেছে। কালিঘাটের ট্রামে উঠে বসবার জন্যে মনে-মনে অস্থির হয়ে উঠ্‌ছিল সুদাস। কেন খাম্‌কা এই ঘোরাফেরা? কি দেখতে, কি জান্‌তে? কলকাতার আকাশে একটাও প্লেনের শব্দ নেই যা শুনে পোল্যাণ্ডকে স্মরণ করা যায়। চৌরঙ্গিতে একটা অ্যাক্‌সিডেন্টও হলনা—কেউ লরী চাপা পড়লনা—যা দেখে অনুভব করা যায় রক্তাক্ত-মৃত্যুর দৃশ্য। পোটেটো চীপ্‌স্‌ আর সল্টেড্‌ বাদামের চীৎকার শুনতেই কি প্রবীরের সঙ্গে বেরিয়ে এসেছিল সুদাস?

"পার্কে একটু ঘুরে আসি—চল্‌ দাস্‌—" প্রবীরও যেন নিস্তেজ হয়ে পড়ছিল।

"বেড়াতে হবে শেষটায় কার্জ্জন পার্কে?" ম্লান মতো হাসল একটু সুদাস।

"কার্জ্জন পার্ক বলে কি গাছ আর ফুল এখানে গজায় না?" লাফিয়ে ট্রাম লাইন পার হয়ে পার্কের গেটে ঢুকে পড়ল প্রবীর। পেছনে আস্‌তে হল সুদাসকে।

রাস্তা ছেড়ে ঘাসে নেমে পড়ল প্রবীর। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থেকে সুদাস তাকে পেছু ডাক্‌লে: "কোথা যাচ্ছিস্‌?"

"একটু বস্‌ব—" থেমে পেছন ফিরে বল্‌লে প্রবীর: "পাঁচ মিনিট—ওদিকটা বেশ নিরিবিলি।"

"পার্কে এসে নিরিবিলি জায়গা খোঁজার অভ্যাসটা ভালো নয় কম্যুনিষ্ট—" কথাটা যেন কানের ভেতরেই আওয়াজ করে উঠেছে, অবাক হয়ে ঘাড় ফেরাতেই প্রবীর দেখলে মহীতোষ এসে পাশে

দাঁড়িয়েছে। প্রবীরকে কথা বলবার অবসর না দিয়ে আবারও বলে উঠ্‌ল মহীতোষ : "রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে স্থদাস বুঝি ? যাক্‌ বাঁচা গেল !"

মহীতোষকে দেখে এগিয়ে আসছিল স্থদাস। মহীতোষও তাদের বন্ধু কিন্তু অন্তরঙ্গতার বাইরে গিয়ে পড়েছে ইদানিং। তর্ক করে যারা আনন্দ পায় মহীতোষ তাদের সংসর্গে থাকেনা—মেয়েদের নিয়ে সিনেমা দেখার ইতর আনন্দে যে মশ্‌গুল তার সঙ্গে বেশি মেলামেশা করলে, স্থদাস ভাবে, পরিশীলিত মনের হানি হয়। স্থদাস হয়ত ভয়ে-ভয়েই এগিয়ে এলো—পাছে মহীতোষ এমন মন্তব্য করে বসে যা শুনতে তার ভালো লাগ্‌বেনা।

তাতে অবশ্যি মুখ বন্ধ থাকলনা মহীতোষের—স্থদাসকেই তাক করলে সে : "কম্যুনিষ্টের সঙ্গে আবার তুমি ! পার্কে মীটিং ডেকেছে না কি ? ঘর ছেড়ে এবার বাইরে ?"

কথাগুলো কঠোর। স্থদাস রাগ করতে পারত। অন্য কোন দিন হলে রাগ করতও সে। কিন্তু আজ মুখে একটা অসহায় হাসি নিয়েই কথাগুলোকে যেন অভ্যর্থনা জানাল স্থদাস। মনে হচ্ছিল কঠোরতাই যেন তার প্রাপ্য। আত্মপীড়নে উন্মুখ হয়ে থাকাই তার উচিত। খারাপ ত লাগেনা ব্যথার হাতে নিজেকে সমর্পণ করে দিতে—ভালো লাগে ভালো লাগারই মতো।

"তুই এখানে গজিয়ে উঠলি কোত্থেকে হঠাৎ ?" প্রবীর মহীতোষের সঙ্গে সহজ হয়ে উঠ্‌ল।

"এ ত আমাদেরই সঞ্চরণস্থল—তোরা বরং এখানে প্রক্ষিপ্ত !" মহীতোষ স্থদাসের পিঠে হাত চালিয়ে দিলে : "ঠিক বলিনি কি, স্থদাস ? বাইরের আলো-বাতাস আর জীবন তোদের কাছে ইতর নয় ? তোদের কাছে মানে ইন্‌টেলেক্‌চ্যুয়েলদের কাছে !"

"এখন তা-ই মনে হচ্ছে।" দূরে সরে না দাঁড়ালেও কথার ভঙ্গীতে স্থদাস মহীতোষের ছোঁওয়া বাঁচাতে চাইল। আবহাওয়াটা

গম্ভীর আর তাই ঝগড়াটে হয়ে উঠ্‌তে পারে। প্রবীর সে আশঙ্কায় অনেকবারই মুখ খুল্‌তে চেয়েছে কিন্তু তেমন সুযোগ পায়নি। এবার আর সে সুযোগের অপেক্ষায় রইলনা—তুহাতে ওদের ঠেলে দিয়ে বল্‌লে: "দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কথা কি? হাঁটতে হাঁটতে কথা হোক।"

"হাঁটতে আর পারবনা—জানিস্‌ মহী, হিটলার করেছে যুদ্ধ-ঘোষণা আর প্রবীর আমাকে মার্চ্চ করিয়ে মারছে তুঘণ্টা ধরে।" সুদাস হাল্কা হয়ে এলো।

"বেশিদূর হাঁটতে হবেনা—ওই ছাতিমগাছটা পর্য্যন্ত।"

প্রবীর আর সুদাস তুপাশ থেকে মহীতোষের দিকে অবাক হয়ে তাকাল—অবাক হয়ে মুখ-চাওয়াচাওয়িই করল বলা যায়। বেশিক্ষণ ওদের অন্ধকারে না রেখে মহীতোষ বলল: "পার্কে হঠাৎ আমি গজিয়ে উঠিনি—ছাতিমতলায় বসে অনেকক্ষণ ধরেই গাঁজিয়ে উঠ্‌ছিলাম—একটি মেয়ে দেখতে পাচ্ছ ছাতিমতলায়, আমারই সঙ্গিনী—সঙ্গিনী বল্‌তে জীবন-সঙ্গিনী না ভাবতে পেরে বাজে মেয়ে ভেবে বসোনা।"

"এত ঘোরপ্যাঁচ কেন—মেয়েটি কে স্ট্রেইট্‌ বলে দিলেই হয়।" প্রবীর উৎসুক না হয়ে পারলনা।

"স্ট্রেইট্‌ সম্বন্ধ নয় যে—কি করে বলব?"

সুদাস আরেক পোঁচ গম্ভীর হল। প্রবীরেরও হঠাৎ আর কোনো কথা বলার ছিলনা।

"তবে এতটা ঘাবড়াবারও কিছু নেই তোদের—" মহীতোষ তুজনের মুখেই চোখ বুলিয়ে নিয়ে বল্‌লে: "শ্যামলী আমার বোন—খুব দূর সম্পর্কের—তবু বোন।"

পরিচয়ের পর আলাপের আয়োজন করছিল শ্যামলী। সুদাস অত্যন্ত তুরবস্থায় পড়ল—মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতে পারাও একটা আর্ট—সে-আর্ট সুদাসের আয়ত্তে নেই। একটু প্রগল্‌ভ

হতে গেলে মেয়েরা ভাবে গায়ে পড়ে পরিচয় করতে এসেছে—চুপ করে থাক্‌লে ভাবে দাম্ভিক। কাজেই কত ওজনের পাষাণ চাপিয়ে ভারসাম্য রাখতে হয় তা জেনে নেওয়া দস্তুরমত অভিজ্ঞতার ব্যাপার। এই অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করবার সুযোগ ছিল কোথায় সুদাসের? সুযোগ থাকলেও দরকার বোধ করেনি সে কখনো। মেয়েদের ছোট এবং হীন ভেবে আত্মসমাহিত থাকবার প্রেরণায়ই দরকার বোধ করেনি।

শ্যামলী সুদাসের পরোয়া না করে প্রবীরের সঙ্গেই আলাপে জমে উঠ্‌ছিল। সুদাসকে নিয়ে একটু বিপন্নই বোধ করল মহীতোষ। তাই চেষ্টা করল তাকে একটু চাঙ্গা করে তুল্‌তে: "ম্যাটিনিতে মেট্রোকৃত্য সেরে শান্তিনিকেতনী পদ্ধতিতে ছাতিমতলায় বসে একটু কথাবার্ত্তা বল্‌ছিলাম। দেখলাম কমল-বনে তোরা দুই সোণার জহুরী এসে ঢুকেছিস্—মলিকে বল্‌লাম তোদের পরিচয়। ওরই অনুরোধে ধরে নিয়ে এসেছি তোদের।"

"আমাদের একটা বিভীষিকাময় পরিচয় দিয়েছিস ত?"

সুদাসের কথায় ঘাড় ফেরাল শ্যামলী: "যতটা বিভীষিকা পোজ করছেন—মহীদা ততটার পরিচয় দেন নি।"

বিব্রত হয়ে উঠ্‌ল মহীতোষ: "ওটা পোজ নয়, ভুল করলে মলি। সুদাস নামটাই ওর ভুল—উদাসই ওর আসল নাম—আর আমি ডাকিও তা-ই।"

"আপনি ভুল করছেন—" প্রবীর অত্যন্ত দুঃসাহসে একপলক শ্যামলীর মুখের দিকে চেয়ে বল্‌ল: "আমাদের কাছে মেয়েরা ট্যাবু নয়।" তারপরই মুখ ফিরিয়ে সে রাস্তায় ট্রামের চলাচল দেখতে সুরু করে দিলে। "বিবেকানন্দের দেশে মেয়েরা ট্যাবু নয়, একথা এত শীগ্‌গীর কি বলা যায়?" শ্যামলীর মুখের আবয়বিক রেখাগুলো ধারাল হয়ে উঠ্‌ল।

সুদাস ভাবছিল বাইরে আজ না এলেই হত। আজ তার খুব

বেশি করেই মনে হচ্ছে সে যে একটা স্বতন্ত্র জগতের প্রাণী। বাইরের জগতের প্রাণীদের সুখদুঃখ, কথাবার্ত্তার সঙ্গে যেন তার কোনো যোগাযোগ নেই। যে-সামান্য যোগাযোগ একদিন ছিল আজ তা একেবারে নিশ্চিহ্ন, বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। তার স্নায়ুর ধর্ম্মই যেন অন্যরকম, তার চিন্তাভাবনা, আশা-আকাঙ্ক্ষা কথাবার্ত্তা এদের সঙ্গে এসে কোনো জায়গাতেই মিল্‌বেনা।

প্রবীর একটা প্রচণ্ড হাই তুলে বল্‌লে: "একটা অতীতবস্তুর উপর আক্রোশে বর্ত্তমানকে দংশন করে লাভ কি?"

প্রবীর না থাম্‌তেই মহীতোষ শ্যামলীকে সাবধান করে দিতে চাইল: "বিবেকানন্দের উপর আক্রোশটা কিন্তু মেয়েদের পক্ষে শোভন নয়, মলি—"

"তার মানে? মেয়েরা কি মানুষ থেকে ভিন্ন জাতের জীব? মেয়েদের শোভন-অশোভনটা পুরুষের থেকে আলাদা হবে কোন হিসেবে?"

"প্রকৃতির হিসেবে।"। মহীতোষ ঠোঁটে একটু হাসি চেপে নিলে: "প্রকৃতি মানে সাংখ্যের প্রকৃতি নয়—বৈজ্ঞানিকের নেচ্যার।"

"এ তোর ভুল বিচার মহীতোষ—" কম্যুনিজমের শিক্ষাটাকে শ্যামলীর খোসামোদে ব্যবহার করতে চাইল প্রবীর: "মেয়েদের উপর শাসন বা অনুশাসন যা তৈরী হয়েছে তাতে প্রকৃতির ইঙ্গিত নেই।"

সম্পূর্ণ খুসী হয়েই শ্যামলী প্রবীরের দিকে তাকাতে চাইল—কিন্তু চোখে তার খুসীই ছিলনা কেবল, সন্দেহও যেন ছিল খানিকটা। প্রবীর লজ্জিত হল কিন্তু উত্তেজিত হল তারচেয়ে বেশি।

"বোস্ না দাদু—বোস্ মহী—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জম্‌ছেনা তেমন।" বসে পড়ে প্রবীর উদাহরণ দেখালে।

"তার চাইতে মনিকো-তে গেলে মন্দ হ'ত কি?" বস্‌তে বস্‌তেই বল্‌লে মহী।

সুদাস অন্যমনস্ক ছিল। হয়ত ভাবছিল স্বাভাবিক ভাবে মানুষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলা তাকে মানায়না। যদি স্বাভাবিক ভাবে চল্‌তে চায় সে অন্য কারো চোখে হয়ত তা বেমানান ঠেক্‌বেনা—নিজের কাছেই নিজেকে অপরাধী মনে হবে। মনের কাছে সে নিরপরাধ থাকৃতে চায়, তারজন্যে বাইরে অপরের কাছে অপরাধী সাজতেও তার দ্বিধা নেই।

"আপনি বস্‌বেন না?" অনুরোধের মতই শোনাল শ্যামলীর কথা।

"আমি উদাস ডাকি বলেই যে তোকে উদাস হয়ে থাকতে হবে তার কোনো মানে নেই।" মহীতোষ শ্যামলীর অনুরোধের মসৃণ ধ্বনিটাকে কর্কশ করে তুল্‌ল। কিন্তু তার আগেই চকিত হয়ে প্রায় বসে পড়েছিল সুদাস—মহীতোষের কথায় বিদ্রোহের সুযোগ থাকলেও সে-সুযোগ সে গ্রহণ করলনা। সুদাসের সঙ্গে সঙ্গেই ধুপ করে শ্যামলী বসে পড়ল। আর এই আকস্মিক বসে পড়ার দরুণই অনেকক্ষণ ধরে শাড়িটা টেনে-টুনে গায়ে জড়িয়ে নিতে হল তাকে।

নিজের গাম্ভীর্য্য সম্বন্ধে লজ্জিত না হলেও সচেতন হয়ে উঠ্‌ছিল সুদাস। তাই এবার সোজা মুখের দিকে চেয়ে সহজ গলায় জিজ্ঞেস করল :

"আপনি কলকাতায় পড়তে এসেছেন, না বেড়াতে?"

"তাছাড়া আর কিছু হতে পারে না?" কথার ধরণটা খারাপ হলেও ঠোঁটে হাসি ছিল শ্যামলীর।

"ও:।" সুদাস চুপ করে গেল।

"পড়ার ইচ্ছা ছিল তা-ই এসেছিলাম কিন্তু পড়া হবে না—এমন কি হ'তে পারে না?"

"হতে পারে, মহীতোষের জিভ নড়ে উঠল, "কিন্তু এমন নিখুঁত সত্য ত অপরের জানবার কথা নয়।"

"কি পড়ার ইচ্ছা আপনার?" অনেকক্ষণ চুপ থাকৃতে বাধ্য

হয়ে এমন আগ্রহ নিয়ে প্রশ্ন করল প্রবীর, যেন একটু ইঙ্গিত পেলে তক্ষুণি সে শ্যামলীকে পড়াতে সুরু করবে।

"অসাধারণ কিছু নয়—বি-এ পাশের পর আমরা স্বাভাবিক ভাবে যা পড়তে পারি।—বি-টি।"

"পড়া হবে না কেন, সীট্ পেলেন না?"

"সীট্ পেলেই কি পড়া হয় গরীব ঘরের মেয়ের?"

"গরীব ঘর থেকে ত বি-এ পর্য্যন্ত পড়েছেন—সে কি কম কথা?"

"বেশি কথাও নয়। মফঃস্বলেও মেয়েদের পড়ার সুযোগ আছে বলেই আজকাল—পড়তে পেরেছি।" বিষণ্ণতায় শ্যামলীকে স্নিগ্ধ দেখাচ্ছিল—যা সব মেয়েকেই দেখায়। কথায় ব্যস্ত বলে প্রবীর হয়ত তা লক্ষ্য করেনি—লক্ষ্য করলে শ্যামলীর চেহারাটা মনে-মনে তারিফ করে সজোরে তা ঘোষণা না করে পারত না। লক্ষ্য করল সুদাস—এমন কি শ্যামলীর চোখেও চোখ পড়ল তার। ব্যথার মতো হৃদয়ের কোথায় যেন কি অনুভব করল সুদাস—তারপরই মার জন্য ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ল তার মন। একটানা তিন বছর এম্নি বিকেল বেলায় সে কখনো বাইরে থাকেনি—দেখেনি বিকেল বেলাকার কলকাতার জীবন—তার জীবনে ছিল হাজরা রোডের বাড়ি আর মার মুখ।

"মলি কিন্তু দস্তুরমতো আধুনিক—জানিস্ সুদাস?" কথার ধাক্কায় সুদাস বিষণ্ণতা থেকে বাস্তবে ফিরে এলো। মহীতোষ বলে যাচ্ছিল: "কারো কাছ থেকে ও সাহায্য নেবে না—আমাকে দাদা বল্‌বে কিন্তু পড়ার খরচ দিতে চাইলে বল্‌বে—না।"

শ্যামলী সঙ্কুচিত হল—মুখ আর তেমন স্নিগ্ধ নয়—সঙ্কোচের ছোট ছোট রেখা পড়েছে হয়ত। তবু কথা বল্‌লে সে: "থাম্‌লে কেন—তারপর বল, আমার পড়বারই ইচ্ছা নেই।"

"ও কথা বল্‌লে মিথ্যা বলা হবে।"

"মিথ্যা কথা বলা এতো কি অন্যায় ?"

"অন্যায় নয়, তবে বলে লাভ নেই।"

"আমি যে আধুনিক এ-কথা প্রচার করেও কি কিছু লাভ হয়েছে তোমার ?"

"ওটা সত্য কথা বলার জন্যেই সত্য কথা বলা।" মহীতোষের গলা নিস্তেজ হয়ে আস্‌ছিল। ভয় হচ্ছিল পাছে শ্যামলী তাকে কোণঠাসা করে তোলে। আধুনিক মেয়ে সম্বন্ধে তার এখানেই ভয়। ভয় সত্ত্বেও তাদের পছন্দ করতে ইচ্ছা করে মহীতোষের। কোনো আধুনিক মেয়েকে হাতে পাবার সুযোগ সে নষ্ট করে না।—হয়ত বন্ধুদের কাছে হাতে দুর্লভ মেয়েটিকে দেখিয়ে গৌরব অর্জ্জন করবার লোভেই।

শ্যামলী কথা বল্‌লেনা—সুদাসের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে আন্‌লে একবার। সুদাসের মনে হল তার যেন কিছু বলা দরকার। কি যে বলা দরকার না ভেবেই বল্‌তে সুরু করে দিলে সে: "আধুনিক হওয়াটা লজ্জার কিছু নয়—বরং আধুনিক কালে বাস করে আধুনিক না হওয়াটাই লজ্জার। তবে আধুনিক হতে হলে যে কি হতে হয় তা নিয়ে তর্ক আছে। প্রথমত ধরুন, আধুনিকতার সমর্থকদের মধ্যে অনেকে বলেন, আধুনিকতা থাকা চাই মনের, বাইরের নয়—শাড়ি-কাপড় পরার ধরণ বা চালচলতির উপর তাঁরা ক্ষেপে আছেন, গার্গী মৈত্রেয়ীর মতো মেয়েরা বড় কথা বল্‌তে পারলেই তাঁরা খুসী। দ্বিতীয়ত ধরুন একদল আধুনিকা আছেন যাঁরা শাড়ি-ব্লাউজ জুতোতেই আধুনিক। তৃতীয়ত ধরুন, সাজপোষাক কথাবার্ত্তায় দুরন্ত ধারাল, দুঃসাহসিক কিন্তু কাজ যা করে কথার উল্টো। এম্নি আরো বহু গোলমেলে ধরণ দেখতে পাওয়া যায়—কা'কে আপনি আধুনিক বল্‌বেন ?"

সুদাস থেমে গেল। শ্যামলী চুপ করেই রইলো—মনে-মনে হয়ত মিলিয়ে দেখ্‌ছিল নিজে সে কোন্ দলে পড়ে। শ্যামলীকে

চুপ করে থাক্‌তে দেখে সুদাস দমে গেল। হয়ত অনুতাপই করতে লাগ্‌ল সে মনে-মনে, খামকা কতগুলো কথা বলার জন্যে। এই উত্তেজনার কি দরকার ছিল তার? চুপ করে থাক্‌লেও ত পারত, আগে যেমন চুপ করে ছিল। কেন সে চুপ করে থাক্‌তে পারল না? শ্যামলীকে ভালো লাগ্‌তে সুরু করেছিল কি? নিশ্চয়ই না—সত্য কথা বলার প্রেরণায়ই কথাগুলো বলেছে সুদাস—হ্যাঁ, সত্য কথা বলার অভ্যাসের দরুণই বলেছে কথাগুলো।

আরেকজন সত্যবাদীও সত্যের প্রেরণায় বল্‌তে সুরু করল: "তুই ভুল করলি দাসু—এমন আধুনিকা আছেন যাঁরা কথায় কাজে এক। ঝক্‌ঝকে মেয়ে, দেখ্‌লে সত্যি আশা হয়।"

মহীতোষ তাল কেটে দিলে, "কোনো মেয়ে দেখে কোনোদিন নিরাশ হয়েছিস্ বল্‌তে পারবি?" প্রবীরের উৎসাহটা ভালো লাগছিল না মহীতোষের কাছে।

প্রবীরের অপমানিত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু মনে হল কথার শব্দগুলো তার ত্রিসীমানায়ও এসে পৌঁছয়নি। এবার সে সপ্রশংস চোখে শ্যামলীর দিকেই তাকিয়ে কথা বলবার উদ্যোগ করলে।

সেদিকে মনোযোগ দেবার দরকারই ছিলনা শ্যামলীর, সে হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে গেল তারপর একটুও ইতস্তত না করে বল্‌লে: "আপনার ঠিকানাটা দেবেন সুদাসবাবু—একদিন আপনার ওখানে যাব।" কথার ধরণটা পুরুষ হলেও শ্যামলীর গলায় একটা স্নিগ্ধ অনুনয় শোনা যাচ্ছিল।

"আমার ঠিকানা?" ম্লান একটু হাসিতে বিমর্ষ হয়ে উঠ্‌ল সুদাস।

"হ্যাঁ—রাস্তার নাম, বাড়ির নম্বর।" শ্যামলী খিলখিল করে হেসে উঠ্‌ল।

বাড়ির নম্বরটা বলে গম্ভীর হয়ে গেল সুদাস: "কিন্তু বাড়িতে প্রায় আমি থাকিই না।"

"আমি যেদিন যাব নিশ্চয়ই সেদিন থাক্‌বেন।"

কথাটায় সম্মানে কোথায় যেন ঘা লাগল সুদাসের—ঘা-টা ফিরিয়ে দিতে চাইল সেঃ "কিন্তু আমার ওখানে যাবেনই বা কেন ?"

"পরিচিত মানুষের বাড়ি মানুষ যায় না ?"

"ওঃ।" বিদ্রূপের ভঙ্গীতে চুপ করে গেল সুদাস।

"অবিশ্যি সেদিন যদি পরিচিত বলে চিন্‌তে না চান তাহলে মুস্কিলে পড়ব !"

"চিন্‌তে পারব। যাবেন।" মনে হল প্রসঙ্গটা শেষ করে সুদাস ছুটি চায়।

"সত্যি যাব কিন্তু।"

"যাবেন।"

"চলো মহীদা—" মুখে বাড়ি ফিরে যাবার অন্যমনস্কতা নিয়ে শ্যামলী মহীতোষকে বল্‌লে।

মহীতোষ দাঁড়িয়ে পড়ল কিন্তু খুবই গম্ভীর হয়ে। পার্কের গেটের দিকে হাঁটতে সুরু করে দিলে শ্যামলী। পেছনে তাকালেও না একবার। হাঁটতে লাগ্‌ল মহীতোষও। তারও যেন পেছনে তাকাবার দরকার ছিল না।

প্রবীরের পক্ষেই আবহাওয়াটা সবচেয়ে দুর্ব্বহ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পাঞ্জাবী ঝাড়তে ঝাড়তে উঠে দাঁড়াল প্রবীর আর খুবই অস্বাভাবিক পরিষ্কার গলায় বল্‌লঃ "বেশ মেয়েটি। খুবই স্মার্ট।"

হাজরার মোড় থেকে একটা সিগারেট ধরিয়ে একা একা বাড়ি ফিরছিল প্রবীর। বাড়ি ফিরবার সময় বাইরের জগতটাকে সে বাইরেই রেখে যায়। বাড়িতে তার আরেক রকম চেহারা। হয়ত বাড়ির চেহারাটাই আরেক রকম, সেখানে বসবাস করতে গেলে

যেরকম হতে হয় প্রবীর তা-ই। হাঁটতে-হাঁটতে সুদাসকে ভুলতে সুরু করল সে, ভুলে গেল মহীতোষকে, এমন কি শ্যামলীকেও।

সন্ধ্যা হয়ে গেছে অনেকক্ষণ—গলির বাতিগুলোও জ্বলে উঠেছে সব। আন্দুলরাজ রোড দিয়ে মনোহরপুকুরে গিয়ে উঠ্‌বে প্রবীর। একটা বাড়ির সামনে সেই মেয়েরা—চোখের নীচে কালি, মুখে রং মাখা। লাইটপোষ্টের আলোর সামনে দুজন—গাছের ছায়াতে ছায়ার মতো দাঁড়িয়ে আছে আরো কয়েকজন। প্রবীর তাকালো তাদের দিকে কিন্তু সেই সঙ্গে পায়ের গতি বাড়িয়ে দিলে। ওদের সম্বন্ধে যা শুনেছে—সত্যি যদি তেমনি ওদের কেউ এসে প্রবীরের হাত ধরে? কি যে তখন হবে প্রবীর ভাবতে পারে না। দৌড়ুবার মতো করেই পথটুকু সে পার হয়ে যায়।

একটা একতলা বাড়ির জানালা দিয়ে হারমোনিয়মের আওয়াজ আস্‌ছে, আর একটা বাচ্চা মেয়ের বেসুরো চেঁচানি—কান পাতলে দূরে দূরে এমন আরো কয়েকটা গান শেখার উৎসাহ শোনা যায়। কোনো আলোকিত ঘরে দেখা যায় দু'তিনটি নাবালক নিয়ে প্রাইভেট টিউটর অবিরাম কণ্ঠস্বরের ব্যায়াম করে চলেছেন। একটা নূতন লণ্ড্রি খোলা হয়েছে, অ্যাম্‌প্লিফায়ারে রেকর্ডের গানগুলোকে হুঙ্কারে পরিণত করে লোক আকর্ষণের চেষ্টা চলেছে।

সবই পুরোণো দৃশ্য—পুরোণো শব্দ। একই রকম সব। যুদ্ধের খবরটাও ফিকে হয়ে এল প্রবীরের স্মৃতিতে।

আভিজাত্য-স্তব্ধ পাশের বাড়ির রেডিয়োর গান সুললিত গাম্ভীর্য্য ছড়িয়ে দিচ্ছে--'আমারে ভালোবেসে, আমারি লাগিয়া—'। প্রবীর থেমে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। পঙ্কজ মল্লিকের গলা ভালো। গুণগুণ করে গলাটা অনুকরণ করতে ইচ্ছা হল প্রবীরের। 'আমারি লাগিয়া—সয়েছ কত ব্যথা বেদনা অপমান—'। 'অপমানে' এসে নিজের কানেই বিশ্রী বেসুরো শোনাল প্রবীরের নিজের গলা। লজ্জিত হয়ে ভাবলে, গান গাইতে হলে দম দরকার।

বাড়ি ঢুকে প্রবীর একটা ছোটখাট জটলায় এসে জড়িয়ে পড়ল। বাবা উপরে উঠে গেছেন, মা-ও সেখানেই নিশ্চয়—হয়ত অন্নুর বিয়ের সুপারিশ করছেন। আর সেই অবসরে সুবীর আর অন্নু বসে গেছে শমীনের সঙ্গে তর্কে মত্ত হয়ে।

"বাঃ রে বড়দা—" অসময়ে প্রবীরকে দেখে অন্নু ঝিলকিয়ে উঠল: "কি ভাগ্যি আমাদের—"

বিরক্ত হতে চেয়েও প্রবীর বিরক্ত হতে পারলেনা—শমীন আছে। অসহায়ের মতো একটু হেসে শমীনের পাশে টুল টেনে নিয়ে বসে গেল।

অপ্রতিভ হল শমীন—অসহায়ের মতো সে-ও আগাগোড়া চোখ দিয়ে অনুসরণ করে চল্‌ছিল প্রবীরকে—যখন সে পাশে এসে বস্‌ল, একটু আশ্বস্ত হয়েই যেন শমীন বল্‌লে: "ঘোরতর পলিটিক্স করছিলুম—"

"সুদাসের ওখানে আমিও তা-ই করে এলুম এতক্ষণ।"

"সুদাসের ওখানে গিয়েছিলি? কেমন আছে ও?" চোখে-মুখে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠ্‌ল শমীন।

"O. K." গা থেকে পাঞ্জাবীটা খুলে কোলের উপর রাখ্‌ল প্রবীর। একটু নড়ে চড়ে বস্‌লে। মনে হল, শমীনকে সে গ্রাস করে ফেল্‌ছে। আরো দু'টি প্রাণী যে এখানে বসে আছে তাদের উপস্থিতি সে স্বীকার করতে চায়না, শমীনকেও ছেড়ে দিতে চায়না তাদের মাঝখানে।

"মাকে ভীষণ ভালোবাসত সুদাস—তোরা জানিসনা আমি জানি।"

"বেশ কথা শমীনদা—আপনি বুঝি মাকে ভালোবাসেন না?" মুখ বুঁজে আর থাকতে পারল না অন্নু।

"বাসতুম আর তা বলিও। মা যেন ওর বোঝা হয়ে আছে এম্নি বল্‌তো সুদাস। এ একরকম পারভার্শান—" অস্বাভাবিক

আগ্রহ নিয়ে অনুকে নিজের প্রতিপাদ্যটা বোঝাতে চাইল শমীন।

"ভেবেছিলুম তোকে দেখতে পাব সুদাসের ওখানে—" শমীনকে অনুর সঙ্গে নিবিড় হতে দিলে না প্রবীর।

"আজ আর যাইনি। কাল শ্মশান থেকে এসে ভালোও লাগছিলনা শরীরটা।"

এবার সুবীর ক্ষেপে উঠ্‌ল রীতিমত: "দাদা, তুমি ভাগো ত বাপু তোমার গেরস্থালীর খবর নিয়ে। আমাদের মাথায় এখন যুদ্ধ, কংগ্রেস, সুভাষ বোস—এইসব।"

"এসব হ্যাঙ্গামা বড়দার নেই—কম্যুনিষ্ট কিনা!" কথার ভঙ্গীটা খারাপ হলেও নেহাৎ দাদা বলেই হয়ত অনু গলার স্বরে বিদ্রূপ আনতে পারলেনা।

"কেন কম্যুনিষ্টরাই ত আসল পোলিটিক্যাল জীব!" শমীন খানিকটা খোসামুদে শোনাল।

"আপনি গান্ধীবাদী কিনা তাই আপনার এত জীবে দয়া—" আগের ধারায় তর্কটা টান্‌তে চেষ্টা করল সুবীর।

"গান্ধীবাদীরা সত্যবাদীও বটে—তাছাড়া দয়া দেখিয়ে লোকসান না হলে ওটা নিন্দার নয়।"

এধরণের কথা বলবার সময় শমীনের রোগা, ফর্সা স্তিমিত চেহারাটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে, চোখমুখ খানিকটা রক্তিমাভ হয়ে যায়। মনের দৃঢ়মূল বিশ্বাসকে ভাষা দিতে গেলে যেমন হয়।

শমীনের এমন কতগুলো মুহূর্তই সবচেয়ে ভালো লাগে অনুর কাছে। হয়ত এসব মুহূর্ত্তের স্মৃতিরক্ষা করবার জন্যেই দেয়ালে একটা গান্ধীজির ছবি ঝুলিয়েছে সে। গান্ধীজির ছবিতে তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে এনে অনু বল্‌লে: "ওসব কথায় ছোড়দাকে মানাতে পারবেন না শমীনদা—গান্ধীবাদের সত্যবাদিতায় ওর বিশ্বাস নেই।"

কাউকে আর সুযোগ না দিয়ে সুবীর বললে: "ত্রিপুরী কংগ্রেসের

পরও গান্ধীবাদের পবিত্রতা আছে মনে করেন শমীনদা ?—তারপরও আমাদের চোখের উপর ওয়েলিংটন স্কোয়ারে নাইডু আর রাজেন্দ্র প্রসাদ সুভাষ বোসের উপর যে জুলুম করে গেলেন তার সবটুকুই কি সত্যাশ্রয়ীর কাজ ?"

"ভারতবর্ষ ডিক্টেটরশিপ চায়না।"

"গান্ধীজি ডিক্টেটর নন—সুভাষ বোসই ডিক্টেটর, এ কথা কি আজ আর কেউ শুন্‌বে শমীনদা ?"

"মোটের উপর কথা কি জানিস্ শমীন—" প্রবীর সুচিন্তিত রায় দিতে চেষ্টা করল : "গান্ধীজি ক্ষয়ে গেছেন।"

"হতে পারে।" শমীন চুপ করে গেল।

"কিন্তু গান্ধীজি যতটুকু করেছেন তারজন্যে ত তাঁকে আমাদের শ্রদ্ধা জানান উচিত—" অন্নু উৎসাহ নিয়ে শমীনের দিকে তাকাল। সেই উৎসাহেরই একটু প্রতিবিম্ব শমীনের মুখের উপর দিয়ে ভেসে চলে গেল—কথা বল্‌লেনা সে। সুবীর কথা বলার জন্যে উত্তেজিত হয়ে উঠেছিল কিন্তু প্রবীরের মুখে এতটা বিরক্তি যে সুবীর মনে করল তার উত্তেজনার খুব উত্তেজক ফল এখন পাওয়া যাবেনা। সবাই চুপচাপ। একটু লজ্জিতই হল অন্নু। কিন্তু ভেবে পেলনা কি এমন মূর্খতা সে করে ফেলেছে যার ফলে এই পণ্ডিত-মহল এতো গম্ভীর। খানিকটা আক্রোশ নিয়েই অন্নু বসে রইল। তা নইলে হয়ত তাকে এখান থেকে চলে যেতে হ'ত আর আড়ালে গিয়ে অপমানে চোখ মুছতে হত।

মুখে বিরক্তি এনেও অন্নুর গান্ধীভক্তিটা যথোচিত শাসন করতে পারলেনা যেন প্রবীর। মনে হল তার, স্থান ত্যাগ করাই যথোচিত হবে।

"গান্ধীজির ইডিয়োলজিতে দেশের কিছু হবেনা—বুঝ্‌লি শমীন্ ? ওতে স্বদেশী বুড়োদের সান্ত্বনা মিলতে পারে, তোর-আমার সান্ত্বনা নেই।" প্রবীর নাটকীয় ভঙ্গীতেই অন্দরে ঢুকে গেল।

শমীন ভেবে পাচ্ছিলনা হঠাৎ প্রবীর আজ গান্ধীজির উপর তেরিয়া হয়ে উঠ্‌ছে কেন! সুদাসের ওখানেও গান্ধী-প্রসঙ্গ নিয়ে বিস্তর আলোচনা হয়েছে—প্রবীর হুঁ-হাঁ ছাড়া বড় একটা শব্দ করেনি। আজ কি সুদাসের অনুপস্থিতির সুযোগেই মুখ খুলে গেল তার? না কি অন্য কিছু? হয়ত আক্রমণটা গান্ধীজির উপর নয়—সবটুকুই তার উপর। সেখানে গান্ধীজি কোনো বিষয়ই নন—বিষয় অন্য।

"জানেন শমীনদা কম্যুনিষ্টদের এ-থিসিসের সঙ্গে আমাদের সায় আছে। পুরোণোকে আঁকড়ে থাকবার কোনো মানে হয়না—বিশেষ করে পোলিটিক্যাল ভিয়ুজ ত রোজই চেঞ্জ করবে!" সুবীরও উঠি-উঠি করছিল।

"তোমার সঙ্গে তর্ক করতে রাজী আছি—" অনেকক্ষণ পর শমীনের মুখটা হাসিতে পরিষ্কার হয়ে উঠ্‌ল: "কিন্তু কম্যুনিষ্টদের সঙ্গে নয়।"

"কংগ্রেসীরা ওদের একদম বিদেশী ভেবে নিয়েছেন!"

"বোসো—কংগ্রেসীদের ত অনেক দোষই দিচ্ছ—শোনো দয়া করে তাদের যা বলবার আছে!"

"শুন্‌ব, আপনারাও যেদিন গান্ধীজি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে ভাবতে পারবেন। আপনাদের কাছে কংগ্রেস মানেইত গান্ধীজি!"

"হতে পারে। কিন্তু কংগ্রেস মানে সারা ভারতবর্ষ ত তোমাদের কাছেও নয়। গান্ধীজির নাম কেটে সুভাষ বোসের নামটা তোমরা বসিয়ে দিতে চাও মাত্র।"

"সুভাষ বোস সেখানে কোনো ব্যক্তি নয়—ওয়ার্কিং কমিটির স্বৈরতার প্রতিবাদেরই প্রতীক।"

"গান্ধীজিও ব্যক্তিবিশেষ নন—ভারতবর্ষের মুক্তিপ্রয়াসেরই প্রতীক।"

শমীনকে আবারও একটু উদ্ভাসিত দেখালো। উজ্জ্বল হয়ে

উঠ্‌ল অনু, যা লক্ষ্য করলে শমীনের সন্দেহ হত সে কি তাকেই ভালোবাসে না গান্ধীজিকে! কিন্তু অনুর দিকে খেয়াল করবার মনই ছিলনা শমীনের—গান্ধীজির কথায়ই জমে উঠ্‌ছিল সে ক্রমে ক্রমে। নাইটরা মেয়ের জন্যেই হয়ত লড়াই করত কিন্তু লড়াই-এর সময় তাদের নজর থাকত তলোয়ারের কসরতের দিকেই, মেয়ের দিকে নয়।

"থাক্‌ মুক্তিপ্রয়াস কথাটা নিয়ে কথা হবে আরেক সময়—আমার একটা মীটিং আছে শমীনদা, আজ—"

"মীটিং? তাহলে তুমি একদম প্র্যাক্‌টিক্যাল পলিটিক্সের জীব?"

"হ্যাঁ, আধ্যাত্মিক সাপোর্টে গান্ধীজির কাজ চলতে পারে, সুভাষ বোসের তাতে চলেনা।" সুবীর হাস্‌ল। হাসিটা কঠিন দেখালেও তা হাসিই আর তাই কথায় যা কঠোরতা ছিল তা ক্ষয়ে গিয়ে আবহাওয়াটা মসৃণ হয়েই উঠল:

"আচ্ছা, চলি আজ—" সুবীর টপ করে ঘর থেকে রাস্তায় গিয়ে পড়ল।

সুবীর বেরিয়ে যাওয়াতে যে আবহাওয়া তৈরী হল শমীন যেন তার জন্যে ঠিক তৈরী ছিলনা। অত্যন্ত স্পষ্ট, সহজ সরলভাবেই অনুর সাহচর্য্যের লোভকে সে মনে-মনে স্বীকার করে নেয় কিন্তু অনুর সঙ্গে এম্নি একা পড়ে যাওয়াতে তার সঙ্কোচ আছে। ছোট হয়ে পড়ার ভয় তার ভয়ানক—সবার কাছে বড় হয়ে, মহার্ঘ হয়ে উঠ্‌বার চেষ্টাই সে আপ্রাণ করতে চায়। মেয়েসম্বন্ধে সন্দেহ করেও প্রবীরের মা যেন সন্দেহের কোনো সুযোগ না পান শমীন সেদিকেও লক্ষ্য রাখে—সন্দেহভাজন হওয়া ছোট হয়ে যাওয়া ছাড়া কি? গান্ধীজি-তে একটি জনপ্রিয় নির্দোষ আদর্শ পাওয়া যায় বলেই রাষ্ট্রনৈতিক মতামতে গান্ধীবাদের উপর তার আসক্তি। তাছাড়া গান্ধীজির অহিংস নীতি বাংলাদেশের মেয়েদের হৃদয়ে খুব সহজেই

স্বর বাজিয়ে তোলে বলে শমীনের বিশ্বাস। এবং আজকাল গান্ধী-বাদের আবেদন কোনো মেয়ের মনে পুরাকালের রবিঠাকুরী কবিতার মতোই কার্য্যকরী বলে তার ধারণা। কাজেই মেয়েদের কাছে বলবার মতো, সমর্থন পাবার মতো, আলোচনা করবার মতো যদি কিছু মহৎ বস্তু থেকে থাকে তাহলে তা একমাত্র গান্ধীবাদ। এ নিয়ে নিজেকে প্রায় ঐশ্বরিক উচ্চতায় রেখে মেয়েদের দিকে এগুনো যায় আর তাতে ফল লাভেরও সম্ভাবনা থাকে প্রচুর।

"আমিও চলে যাই শমীনদা—" অনুর গলাটা ফিসফিসের মতো শোনাল।

চলে যাওয়াই অনুর উচিত, শমীন ভাবছিল। কিন্তু একটু বস্‌লে কি খুব ক্ষতি হবে? মা কি এসে উপস্থিত হবেন? শমীনের চোখে ইচ্ছা-অনিচ্ছা ছিলনা।

"কেমন?" উঠে দাঁড়িয়েও পা চল্‌ছিলনা অনুর: "দাদাও উপরে চলে গেছেন। মা মনে করবেন তোমার সঙ্গে বসে বসে আমি গল্প করছি।"

"যাও।" খুবই হতাশ শোনাল শমীনের গলা।

অনু গেলনা—ভেতরের দরজার দিকে একপলক তাকিয়ে নিল শুধু: "একটু থাকি। একমিনিট।"

"প্রবীর কিছু মনে করবেনা?"

"ভাববে ছোড়দা আছে।"

"প্রবীর মনে করে কিছু?"

অনু কথা বল্‌লেনা। ঠোঁট চেপে রইল। কি উত্তর শুন্‌লে যে সে খুসী হয় শমীন তা ভেবে পাচ্ছিলনা—তাই মুখ ফিরিয়ে সে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ—তারপর অনুর মুখের উপর চোখ তুলে আন্‌তেই দেখতে পেল চোখে তার জল—অনু কাঁদ্‌ছে।

"কি?" গলার স্বর প্রায় বুঁজে এলো শমীনের।

"কিছুনা" হাতের মুঠোয় আঁচলটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে চলে গেল অনু।

কি? নিজেকেই আবার প্রশ্ন করল শমীন। অপমানিত হয়ে উঠ্‌ল তার মন। ছোট হয়ে পড়েছে যেন সে। অনুর চোখের জলে? চোখের জলে নয় কিন্তু চোখের জলের জন্যেই। প্রবীরের শুক্‌নো রুক্ষ মুখটা মনে পড়্‌ল শমীনের। সেই রুক্ষতার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে রুক্ষতার চেয়েও ঢের কুৎসিত একটা মন। যে-মন অনুর আর তার স্বাভাবিক সম্বন্ধটা স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করতে পারেনা। এতদিন সে-মনের কথা কল্পনা করে শমীন একেকসময় মনে মনে দুঃখিত হয়েছে—আজ তা আবিষ্কার করে নিজেকে অপমানিত বোধ করলে। অনেকসময় প্রবীরের কাছে নিজেকে শমীন করুণ, অসহায় করে রেখেছে কৃতজ্ঞতা-বোধ থেকে। তারও কোনো দাম নেই, মানে নেই ওর কাছে! বন্ধুত্বের মর্য্যাদা না দিক, বন্ধুর কৃতজ্ঞতা-বোধের দামও যে দিতে পারেনা সে যত বড় ব্রহ্মচারীই হোক, মানুষ নয়।

ঘর থেকে বেরিয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল শমীন। ঘরে আলো জ্বলে রইল, দরজা রইল খোলা—কাউকে ডেকে সে-কথাটাও সে জানিয়ে এলনা। ছট্‌ফট্‌ করছিল তার সমস্ত শরীর—কতগুলো প্রশ্নের আর উত্তরের আঁকিবুকি কেটে যাচ্ছিল তার মগজ। সুদাসের ওখানে না গিয়ে তার উপায় নেই—ওখানে গিয়ে মগজটাকে হাল্কা না করে এলে রাত্রিতে হয়ত ঘুম হবেনা।

মনোহরপুকুর থেকে রসা রোডে পা বাড়িয়েই শমীন নির্জ্জনতার হাত থেকে আলোর আওয়াজের মধ্যে এসে উপস্থিত হল। রীতিমতো কলকাতার রাস্তা। যেখানে মনের নির্জ্জনতাকে কিছুতেই বাঁচান যায় না। মোড়ের পান-ওয়ালার দোকানের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে শমীনের মন কথা বল্‌তে সুরু করল। সুদাসের কাছে বল্‌বেই সে আজ অনুর কথা—প্রবীরের কথা। প্রবীরের মুখোসটা

টেনে খুলে ফেলে দেওয়া দরকার। ওর মনটাকে বাইরে এনে দেখাবে শমীন যে মন ওর মার মতোই পারিবারিক সঙ্কীর্ণতায় ডুবে আছে। সব, প্রত্যেকটি খুঁটিনাটি বল্‌বে সে সুদাসের কাছে। প্রবীরের সব সন্দেহ, সব বিরক্তি যার গুরুত্ব এতদিন সে দিতে চায়নি, আজ অর্থপূর্ণ ব্যাখ্যায় ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুল্‌বে। শমীন বুঝতে পারত অনুকে অপমান করে প্রবীর, তবু এতদিন সে তা বুঝ্‌তে চায়নি। আজ আর তা না বুঝ্‌লে চল্‌বে না।

দোকানের কাছে এগিয়ে গিয়েও অন্যমনস্ক ছিল শমীন—অন্যমনস্ক থেকেই হয়ত সে সিগারেটের জন্যে একটা সিকি দোকানদারের হাতে এগিয়ে দিত আর ধ্যান ভাঙত তার যখন উড়ে দোকানদার একগাল পান মুখে নিয়ে জলীয় আওয়াজ করতঃ "কি চাই?" কিন্তু ঘটনা ততদূর পৌঁছুলনা। চমকে সে উঠ্‌ল কিন্তু উড়ের গলায় নয়, মহীতোষের উৎসাহী গলায়।

"এই যে Gentlemanly শমীন, Let me introduce you to my friend প্রণব। প্রণব বসু—হ্যাঁ the renowned আধুনিক সাহিত্যিক। আর প্রণব, শমীনকে budding মুন্সিফ বলতে পারো—আলীপুরে উকিলদের সঙ্গে বস্‌বার মেয়াদ ফুরোলেই ব্যস।" মহীতোষ ঠোঁট বাঁকিয়ে একটা সিগারেট মুখে নিলে আর হাসিতে ঠোঁটগুলো আরো বাঁকিয়ে দিলে!

"ভালোইত—একজন ভালো সঙ্গী পাওয়া গেল।" প্রণব অন্তরঙ্গতা অভিনয় করল, সচরাচর যা করে সে অভ্যস্ত।

"শমীন—"নাটকীয় ভঙ্গীতে চুপ করে রইল মহীতোষ খানিকক্ষণ। তারপর সিগারেটে দেশলাই-এর শিখা বুলিয়ে নিয়ে আর আঙুলের কসরতে নিভন্ত কাঠিটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বললেঃ "যাবি শমীন?"

নিজের অবস্থিতিটা ঠিক বুঝে উঠ্‌তে পারছিলনা শমীন। এদের এত কথা বলার পরও তার নিজের যেন বলবার কিছু ছিলনা।

"চল্‌না এগোই—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কি কথা—ওপারে চল্‌ বাস্‌ষ্টপে।" শমীনের কোমরে হাতটা জড়িয়ে আন্‌লে মহীতোষ।

চলতে সুরু করেই শমীন বললে: "কোথায় যাব?"

"কোথাও নিশ্চয়ই—চলুন না।" নেহাৎ এ দ্বিতীয় কথা বলেই যেন প্রণব শমীনের কাঁধে হাতটা তুলে দিতে পারলে না—তৃতীয়বার কথা বলবার সময় হয়ত শমীনের পিঠে চাপড় দিয়েই প্রণব কথা বলবে মনে হল।

মাঝ রাস্তায় এসে শমীন অনিচ্ছায় একটু বেঁকে দাঁড়াল: "আমার জরুরী কাজ আছে মহীতোষ—"

"আমাদের বুঝি কাজ নেই? ভাবিস্‌ সবই আমাদের অকাজ? প্রণবের সাহিত্য অকাজ হতে পারে কিন্তু I am a business-man! And honourable too!" অস্বাভাবিক শব্দ করে হেসে উঠল মহীতোষ।

"কিন্তু কোথায় যাব?"

"আমরা যেখানে যাচ্ছি।"

"সেখানে আমাকে যেতে হবে কেন?"

"দুজনে জম্‌বে না—দুজনে Pair হয়—অথচ Trio না হলে জমেনা।"

"কিন্তু আমি অভাব পুরণ করতে গেলাম কেন?"

"কাউকে ত করতেই হ'ত—পথে তোকেই কুড়িয়ে পাওয়া গেল।"

"আমাদের সঙ্গে যেতে এতো সঙ্কোচ কেন আপনার।" বাস্‌ষ্টপে এসে দাঁড়িয়ে বল্‌লে প্রণব।

"সঙ্কোচ নয়। সত্যি আমার একটা কাজ ছিল।"

"রাস্তায় হাওয়া খাওয়া ছাড়া কলকাতায় রাত্তিরে কারো কাজ থাকে?" মহীতোষ সিগারেটের প্যাকেটটা শমীনের হাতের কাছে এগিয়ে ধরল।

"কিন্তু কোথায় চলেছিস্‌ তোরা—সিনেমায়?"

"বদ্ধ ঘরে বসে হাওয়া খাওয়া যায়? তাও না হয় যায়, সঙ্গে মেয়ে থাক্‌লে।"

"ধরে নিন হাওয়া বদল করতেই যাচ্ছি আমরা!" মেয়েদের ভঙ্গীতে মুখ টিপে একটু হাস্‌তে চাইল প্রণব—কিন্তু ওর মুখের রুক্ষ চামড়ায় হাসির সৌন্দর্য্যটাও গর্হিত দেখালে।

যতটা বিরক্ত হওয়া উচিত ছিল শমীনের ততটা বিরক্ত যেন সে হ'তে পারল না। দুজন সঙ্গীর উৎসাহিত কথাবার্ত্তায় একটু কৌতূহলীই যেন হয়ে উঠ্‌ছিল তার মন। মহীতোষকে শমীন চেনে। হৈ-হুল্লোড় ছাড়া জীবনের আর কোনো মানে নেই তার কাছে। হয়ত চৌরঙ্গির কোনো রেস্তোরাঁয় বা বারে গিয়ে খানিকটা উত্তেজিত সময় কাটাতে চায় সে। কিন্তু প্রণববাবু? তিনিও কি মহীতোষেরই মতো? আধুনিক সাহিত্যিক! বামপন্থী সাম্প্রতিক সাহিত্যকে সে চেনে, প্রবীরের কাছে তার বর্ণনা পাওয়া গেছে। কিন্তু আধুনিক সাহিত্য কি? মহীতোষ-মার্কা সাহিত্যই কি? মহীতোষের বন্ধু যখন প্রণববাবু—তাঁর তৈরী সাহিত্য মহীতোষের মতোই হাল্কা, দায়িত্বহীন হয়তবা। তা হোক—শমীন তার মনের কোন্ একটা জায়গায় যেন দায়িত্বহীনতারই সাড়া পেল। কিন্তু খুবই ম্লান তা—খুবই অস্পষ্ট। সুদাসের কাছে যাবার দায়িত্বকে তা মুছে দিতে পারলনা।

কিন্তু সে-দায়িত্ব সম্বন্ধে সচেতন থেকেও শমীন সত্যিকারের সচেতন হয়ে উঠ্‌ল হাতে একটা ঝাঁকুনি খেয়ে।

"নে ওঠ্—" মহীতোষ হাত ধরে টানছে তাকে। একটা টু-এ বাস তাদের সামনে দাঁড়িয়ে ফুঁস্‌ছে—হাতল ধরে ফুটবোর্ডে দাঁড়িয়ে আছে প্রণব। দৃশ্যটাকে অনুভব করে শমীন ফুটবোর্ডে পা বাড়িয়ে দিলে। অনিচ্ছা দেখিয়ে আর দৃশ্য তৈরী করবার ইচ্ছা তার ছিলনা।

"উপরে—" প্রণব সিঁড়িতে পা তুলে দিলে।

পেছনের লম্বা সীট্‌টা খালি।

"তিন জনের সীট্‌ রিজার্ভ করে রেখেছি, আর তুই কিনা আস্‌তে চাস নে।—" রসিকতায় বাসের লোকগুলোকে হাসাবার চেষ্টা করে মহীতোষ কোণ ঘেঁসে বসে পড়ল। পেছন ফিরে তাকাল কেউ কেউ কিন্তু তা মহীতোষের কথায় নয়, প্রণবের হাসির তোড়ে। শমীন হাসবার অবস্থায় এসে পৌঁছুতে পারলেনা, কিন্তু মন তার হাল্কা হয়ে পরেকার সুযোগেই হাসবার জন্যে তৈরী রইল। বাস যখন চল্‌তে সুরু করেছে, তখন থেকেই সুদাসের কাছে যাবার দায়িত্বের উপর যবনিকা ফেলে দিয়েছে সে। অন্তত চৌরঙ্গিতে না গিয়ে বাস যখন এদের জন্যে থামছেনা—তখন আর দায়িত্বের বোঝাটা সঙ্গে নিয়ে লাভ কি?

"প্রণবের সঙ্গে দেখা না হলে আজ হয়ত স্যুইসাইডই করতুম—মেজাজটা যা ছিল!" সিগারেটের খোঁজে পকেটে হাত ঢুকিয়ে মহীতোষ বল্‌লে: "আর তোর সঙ্গে দেখা না হলে, জানিস্‌ শমীন, থ্রিল্‌ই হতনা—যা এখন হচ্ছে।"

"মহীতোষকে খানিকটা অ্যাব্‌নর্ম্মাল শোনাচ্ছে না কি শমীনবাবু?" প্রণব চোখ মটকালো।

"কি?" খুব শিথিল গলায় ছোট্ট এইটুকুই শব্দ করল শমীন—হয়ত ভাবলে তার চেয়ে বেশি কিছু বল্‌তে গেলে বিরক্তি ধরা পড়ে যাবে।

"অ্যাব্‌নর্ম্মাল!" হাঁ করে ঠোঁটে জড়ানো সিগারেটটাকে ছাড়িয়ে নিয়ে মহীতোষ স্পষ্ট উচ্চারণে বল্‌লে: "যে দৃষ্টি নিয়ে তোরা তাকাস্‌ আর সাহিত্য তৈরী করিস্‌! অ্যাব্‌নর্ম্মাল ছাড়া তোদের আর কোনো কথা আছে?"

"তোদের কি খুব দেরি হবে, মহী—?" একটা করুণ জিজ্ঞাসায় শমীন হঠাৎ ছন্দপতন ঘটিয়ে দিলে।

"আমাদের যতটা হবে তোরও ত তাই।"

"হ্যাঁ—তা-ইত জিজ্ঞেস করছি, খুব দেরি হবে কি ?"

"তা এখন কি করে বলা যায় ?"

"তাহলে চৌরঙ্গি গিয়েই বলিস।"

"চৌরঙ্গি ? চৌরঙ্গি যাচ্ছে কে ?"

"তবে ?"

"তবে ?" মহীতোষ প্রশ্ন নিয়ে প্রণবের দিকে তাকালে।

সারা গায়ে আলস্যের একটা নিবিড়তা এনে চুপচাপ বসে ছিল প্রণব। একটু আগেকার অপমানসূচক কথাটাকে অপমান নয় বলে ভাবা যায় কিনা হয়ত তারই বিচার করছিল সে মনে-মনে। কিন্তু তাতে গভীর মনোযোগ ছিলনা তার। শমীনের সঙ্গে মহীতোষের পরেকার কথাগুলোও তার মনোযোগ এড়ায়নি। 'তবে ?'-র উত্তরে তৎপর হয়ে সে বললে: "মাণিকতলা।"

"মাণিকতলা ? কোথায় ?"

"ফুটপাথে নিশ্চয়ই নয়, কোনো বাড়িতে।" মনে হল সিগারেটের নেশাতেই ঘাড় এলিয়ে বুঁদ হয়ে আছে মহীতোষ।

"তার মানে ?" শমীনের কণ্ঠ সচকিত! শঙ্কিতও তাকে বলা যায়। যেন নূতন একটা বীভৎস জগত আলোকিত হয়ে উঠেছে তার চোখের উপর। হঠাৎ যেন জান্‌তে পেরেছে শমীন যে সে বন্দী—যে দুজন বসে আছে তার দুপাশে তারা তার প্রহরী।

আলস্য ছেড়ে সচকিত হতে হল প্রণবকেও: "ভয় পেয়ে গেলেন না কি শমীনবাবু ?"

ছোট ছোট হাসির সঙ্গে মহীতোষ বল্‌লে: "তাই না কি ? ভয় পেয়েছিস্ না কি রে শমীন ? ত্রিশ বছর বয়েসের কোনো নর্ম্যাল মানুষের ত এ ভয় থাকা উচিত নয়।"

"আমায় মাপ কর মহী—" আর কোনো কথা বলবার উপায় ছিলনা শমীনের—সীট্ থেকে উঠে সোজা সে দাঁড়িয়ে গেল।

"ছিঃ শমীনবাবু বসুন—" শমীনের হাত ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে

বললে প্রণব: "আমার একটা কথা শুনুন—তারপর না-হয় ছেলেমানুষি করবেন। আমাকে নিশ্চয় আপনি বিশ্বাস করতে পারেন—আর যাই হোক রুচি আমার খারাপ নয়। আপনার রুচিতে বাধে এমন কোনো জায়গায় আপনাকে নিয়ে আমি অন্তত যাবনা।"

"কিন্তু আমার তত রুচির বালাই নেই শমীন—যে কোনো Hell-এ আজ আমি যেতে পারি।"

মহীতোষের দিকে না তাকিয়ে প্রণবের কথারই উত্তর দিলে শমীন: "কিন্তু of all আমাকে কেন আপনারা যেতে বলছেন?"

"মনে-মনে যা আপনি অন্যায় বলে ভাব্‌ছেন—হয়ত গর্হিতও মনে করছেন—দেখবেন তা মোটেও গর্হিত নয়। একটা ভুল ভেঙে যাওয়া কি কম কথা?" বল্‌বার ভঙ্গীতে প্রায় দার্শনিকের মতো হয়ে উঠ্‌ল প্রণব।

"নিজের মনের কাছে নিজে আমি অপরাধী হয়ে উঠ্‌ব। সে-অপরাধের চেয়ে ভুল ভাঙা আমার বড় নয়।"

"মনের কাছে অপরাধযুক্ত আমরা কিছুতেই হতে পারিনে শমীনবাবু—মন এমনই জিনিস যে তাকে আপনি কোনো রকমেই খুসী রাখতে পারেন না। কাজেই অপরাধ করে অপরাধ স্বীকার করবার সাহস থাকাই আসল কথা, তাতে বরং মনের মানদণ্ড খানিকটা স্থির থাকে।"

শমীন কিছু বল্‌লেনা। তাকে চুপ থাক্‌তে দেখে প্রণব চুপ করে গেল। মহীতোষ যেন নেশায় বুঁদ। ভালো ছেলের ভালোত্ব ঘুচিয়ে দেবার একটা নেশা আছে। শমীন না হয়ে সুদাস হলেই সবচেয়ে ভালো হ'ত—মহীতোষ ভাবছিল। সুদাস-কে নিয়ে কোনো বার-এও যদি ফেলা যেত আজ, তার জন্যে একশ' টাকাও খরচ করতে রাজী ছিল সে। ভুল্‌তে পারছিলনা সে শ্যামলীর ব্যবহার। বাড়ি ফিরবার পথে শ্যামলী মহীতোষের সঙ্গে একটি

কথাও বলেনি। কেন বলেনি তা কি সে বুঝতে পারেনি? মেয়েদের মনের ফর্‌মূলা তার প্রায় মুখস্ত। সুদাসকে পাওয়া যেত আজ কোনো রকমে!

বাস্ চল্‌ছে। ঘন্টার আওয়াজে স্পীড কমে, কখনো থামে— ডবল ঘণ্টায় বেড়ে যায় স্পীড, আরোহীদের শরীর দুলে ওঠে। কলেজষ্ট্রীট আর শ্যামবাজারের আরোহীদের অখণ্ড সহিষ্ণুতায় ডেকে যাচ্ছে কণ্ডাক্টার। এসব শব্দের আর গতির কোনো মানে নেই শমীনের কাছে। কতগুলো শব্দের রেখার সঙ্গে আঁকাবাঁকা পথে ছুটোছুটি করছে তার মন। অন্যায়, জঘন্য অন্যায় সে করতে যাচ্ছে। কিন্তু উপায় নেই। সঙ্গীদের সঙ্গে জবরদস্তি চলেনা। তাতেও শালীনতায় আঘাত আসে। কিন্তু যেখানে সে যাচ্ছে কোনো শালীন মন কি যেতে পারে সেখানে? তাছাড়া নিজেকে একলা পৃথকভাবে ত সে ভাবতে পারে না। তার জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে যাচ্ছে অনু। তার শালীনতার উপর দাবী আছে অনুর। এই শালীনতার আশ্রয়েই হয়ত নিজেও সে অনুর উপর দাবী জানায়। আজকের ঘটনার পর আহত শালীনতা নিয়ে অনুর কাছে উপস্থিত হতে নিশ্চয়ই সঙ্কোচ হবে শমীনের। কিন্তু সঙ্কোচ কি হবে শুধু এ ঘটনার জন্যেই। যদি আজ মহীতোষের সঙ্গে তার দেখা না হত— এ ঘটনা তার জীবনে উপস্থিত হবার সুযোগ যদি না থাকৃত তবেই কি সে নিঃসঙ্কোচ ছিল অনুর কাছে? প্রবীরকে আজ যা সে জেনে নিয়েছে তারপর কি অনুর সঙ্গে তার সম্বন্ধটা সঙ্কোচের হয়ে দাঁড়াবে না? পারিবারিক জীবনে অভ্যস্ত মেয়ে অনুও প্রবীরের বিরোধিতাকে শেষ পর্য্যন্ত উড়িয়ে দিতে পারবে কি না কে জানে? এখনো অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন আর তাই অনেক ব্যবধান আছে তার আর অনুর মধ্যে। নিজেকে এখনি সম্পূর্ণভাবে অনুর হাতে তুলে দেওয়া কি বোকামি নয়? এমনও হতে পারে যে শেষ পর্য্যন্ত হয়ত এই কঠোর আত্মবিক্রয়ের কোনো মানেই থাক্‌বেনা। চিন্তার

নিঃশব্দ আঁকাবাঁকা পথে এখানে এসেও মন তার নিশ্চিত মুক্তি অনুভব করতে পারলনা। সবশেষে আবারও এ কথাই উঁকি দিতে চাইল, সে অপরাধ করছে। অপরাধ করছে এই বাসে বসে থেকে—মাণিকতলা পৌঁছুতে যার কয়েক মিনিট মাত্র বাকি।

রাত এগারোটায় মাণিকতলা থেকে হেঁটেই চৌরঙ্গী এসে পৌঁছুবে ভাবছিল শমীন। বাস চল্‌ছে—কিন্তু কখন একবার মনে হয়েছিল তার যে হাঁটাই উচিত—তখন থেকে হাঁট্‌তে সুরু করেছে সে। শরীরে রক্ত-মাংসের ওজন যেন আর নেই, তাই হাল্কা শরীরটাকে লম্বা পায়ে উড়িয়ে নেবার চেষ্টা করছিল। মনে পড়ে, খানিকটা রাস্তা যেন মহীতোষ তার সঙ্গেই ছিল—তারপর হঠাৎ কখন কোন্ গলিতে যে ঢুকে পড়ল মহী তা আর শমীনের মনে পড়ে না। প্রণব? প্রণবকে ঠিক মনে আছে। মেয়েটার সঙ্গেই থেকে গেল—সারারাত থাক্‌বে। মেয়েটা—মেয়েটা কি যেন নাম বলেছিল—পদ্মা! হ্যাঁ পদ্মা। তোফা মেয়ে! শমীন মুখ থেকে অনেকখানি হাওয়া বার করে বল্‌লেঃ তোফা! মহীতোষ কি বলেছিল পদ্মাকে? খেলোয়াড়! আচ্ছা খেলোয়াড়! কিন্তু একটা আঙুল দিয়েও ত মহীতোষ ছুঁলেনা পদ্মাকে—এক ফোঁটা মদ ছোঁয়ালেনা ঠোঁটে। শমীনও অবশ্যি প্রথমটায় ছুঁতে চায় নি মদ—কিন্তু পদ্মা হাতে তুলে দিলে যে! মহীতোষের মতো ঠাণ্ডা রক্ত ত তার নয়। পদ্মা হাতে তুলে দিচ্ছে! পদ্মা বল্‌ছেঃ "বউ বক্‌বে তা-ই খাবে না?"

"বউ? বউ কোথায়?" হাত বাড়িয়ে দিয়েছে শমীন।

"তাহলে ভালোবাসার মেয়ে বক্‌বে। এ বয়েস অবধি ভালো না বেসে ত থাকো নি!" মিষ্টি গিট্‌কিরির মতো হেসে উঠেছিল পদ্মা।

অনুকে মনে পড়েছিল কি শমীনের? অনুর মুখ ভেসে উঠ্‌তে

পেরেছিল ঘরের ওই আবহাওয়ায় ? সায়া, ব্লাউজ, শাড়ী ঝুলানো আলনা, নক্সী রেলিং তোলা খাট, ড্রেসিং টেবিলের উপর কাচের গ্লাস আর চীনামাটির ডিশ্‌—খাটের নীচে পেতলের ক'টা বাসন—মেঝেতে পুরু গদির উপর তাকিয়া—দেয়ালে বস্ত্র হরণের আর নিটোল জাপানী তরুণীর ছবি—এ ঘরে অনুকে মনে করতে চাইলেও কি মনে পড়ত ?

এক চুমুকে গ্লাসটা শেষ করে নিয়ে বলেছে শমীন : "ভালো না বেসে থাকা যায় না। তাই ত এলুম তোমার কাছে !"

"কৃতার্থ হলুম !" একটু অন্যমনস্ক থেকে একটু হাই তুলে যেন বলেছিল পদ্মা : "দেখ দেখ, মাছের মতো গিলেই যাচ্ছে ও।"

গ্লাস থেকে ঠোঁট তুলে নিয়ে ধমক দিয়ে উঠেছিল প্রণব : "নাঃ, আমাদের কৃতার্থ করছ ! ঢং-এর কথা শোন—কৃতার্থ হলুম !"

কালি-পড়া অথচ টানা চোখ তুলে মহীতোষের দিকে তাকিয়েছে পদ্মা—হয় মদে নয় প্রণবের কথায় অসহায় দেখাচ্ছিল ওর চোখগুলো : "তোমরা দয়া করে এলে আমি ত কৃতার্থ হব—না কি বল ভাই ?"

"কোথায় কৃতার্থ—" গদির ধার থেকে উঠে শমীন একটা তাকিয়া টেনে নিয়ে মাঝখানে বসেছে : "তাহলে কি ওখানে ছোঁওয়া বাঁচিয়ে বসে আছ ?"

শমীনের কথার উপর মহীতোষ হো-হো করে যেন হেসে উঠেছিল। পদ্মা উঠে গিয়ে শমীনের গা ঘেঁসে বসেছে। তারপর শমীনের বাহুর আগ্রহে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বলেছে মহীতোষকে : "তুমি বুঝি ভাই তুল্‌সীপাতা ?"

"তুল্‌সীপাতা নই জলবিছুটি।"

"পরখ ত হল না।"

"ওতে হবেনা ? আমাকেও আস্‌তে হবে ?"

"এক যাত্রায় আলাদা ফল নিয়ে যাবে কেন ?"

"যাত্রা না হয়ে অযাত্রা যখন হয়েছে, কাজেই।"

কি যেন বল্‌তে যাচ্ছিল পদ্মা—ওর মুখে হাত দিয়ে বলেছে শমীন: "চুপ করো—ছিঃ—।" শমীনের গলা দিয়ে আদর গলে পড়ছিল।

তারপর আরো কি কি যেন হ'ল—মহীতোষ এক পাশে সরে থেকে কথা বলেছিল অনেক—প্রণবের মুখ থেকে মদের গন্ধের মতোই অশ্লীলতা ভুরভুর করে উঠছিল—আর পদ্মা—পদ্মাও যেন ক্ষেপে উঠেছিল, ঝড়লাগা পদ্মা নদীর মতো। পদ্মার শরীরটা নিয়ে বাস্কেট বল খেলেছে শমীন আর প্রণব—কাড়াকাড়ি, হুটোপুটি। বেভুল নেশা ছাপিয়ে তখন একেকবারে মনে হয়েছে শমীনের অনুকেই বুঝি সে নিষ্পেষিত করছে সমস্ত শরীর দিয়ে। জীবনের এতো আবেগ এতো উত্তাপ তখন যে ফুরিয়ে ফতুর হয়ে হয়ত তা মৃত্যুর কাছাকাছি এসে দাঁড়ায়। আশ্চর্য্য সে মুহূর্ত্ত—নারী আর পুরুষের দেহ যখন স্পর্শের বিচিত্রতা নিয়েই শুধু বাঁচ্‌তে থাকে—জীবকোষের নির্ব্বোধ প্রসারণের কারুশিল্পে খচিত যেন সে-সময়—পরে তাকে মনে রাখা যায় না। হয়ত মন তখন নিঃশেষে মুছে বিলুপ্ত হয়ে যায়—শুধু প্রাণ, শুধু জীবন্ততা কাজ করে চলে। সে-মুহূর্ত্তগুলোকে পুরোপুরি মনে করতে পারে না শমীন। তবু তাদের স্মরণে তার ঠোঁটের উপর লোলুপ হাসির ছোট ছোট ঢেউ খেলে যায়—ঠোঁট থেকে খসে সিগারেটটা রাস্তায় পড়ে।—শমীন দাঁড়ায় না, সিগারেটটা মাড়িয়ে লম্বা পা চালাতে থাকে।

তারপর একসময় লম্বা পা যখন শমীনকে চৌরঙ্গির মোড়ে এনে উপস্থিত করে তখন চৌরঙ্গিও প্রায় নির্মানব—বাতিগুলোও যেন মাতালের চোখের মতো ঢুলছে। রিক্সার ঠুং-ঠাং এদিক-ওদিকে বাজে দু'একটা—আর ফিটনের ঘোড়ার খুরে মন্থর স্পষ্ট দু'একটা আওয়াজ। ঝিমিয়ে পড়েছে চৌরঙ্গি। শমীনের হঠাৎ খেয়াল হ'ল সে-ও যেন ঝিমিয়ে পড়ছে। পকেট থেকে রুমাল খুলে নিয়ে

কপালের আর ঘাড়ের ঘাম মুছে সে যখন সোজা হয়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করল—তখন আর তার নেশা নেই, মনে হল সত্যি সে অবসন্ন। বাড়ি এখনো অনেকটা রাস্তা—ভবানীপুর। ট্রাম বন্ধ,, বাস কি আর আসবে? পকেটে হাত বুলিয়ে দেখে নিলে মনিব্যাগটা আছে কি না—আশ্চর্য্য, ওটা হারিয়ে যায় নি। হারিয়ে গেলে কি করত শমীন? রিক্সাতে গিয়ে হাত পাততে হ'ত সুদাসের কাছে। সুদাসের কাছেই ত সন্ধ্যায় সে যাবে ভেবেছিল, কিন্তু কি অবাক কাণ্ড, যাওয়া হলনা! অনুর সঙ্গে সম্বন্ধটা পরিষ্কার করে ফেলার কথাই জিজ্ঞেস করত সে সুদাসকে। আশঙ্কা হচ্ছে অনুকে সে পাবে না—তবু যদি—। শমীন হাঁ করে মুখ থেকে খানিকটা হাওয়া ছেড়ে হাত দিয়ে তা নাকের উপর চেপে ধরে শুঁকে দেখ্‌ল। ফিকে হলেও গন্ধ এখনো আছে। ছি-ছি এই গন্ধ নিয়ে সুদাসের কাছে যাওয়া যেত না কি? হঠাৎ যদি এখন অনুর সঙ্গে তার দেখা হয়ে যায়—কি সাংঘাতিকই না হবে! অবশ্যি রাত বারোটায় অনু চৌরঙ্গিতে কিছুতেই আসতে পারে না। ন'টায় শো-তে মেট্রোতে যদি আসে? তা হলেও বা কি? শমীন রিক্সা নিচ্ছে। বাস পেলেও বাসে সে উঠবেনা। মাণিকতলার মোড়ে যে সে বাস ধরে নি তার জন্যে নিজেকে শমীনের এখন বুদ্ধিমানই মনে হল।

কিন্তু বুদ্ধিমান বলেই কি নেশা তাকে এত শীগ্‌গীর ছেড়ে যাবে! রিক্সার উপর হাত-পা ছড়িয়ে বসে আকাশের দিকে মুখ তুলে হাওয়া গিল্‌তে সুরু করল শমীন। চোখ বুঁজিয়ে রইল জোর করে। সেই বোঁজা চোখের ভেতর পদ্মার মুখটা অনুর মত আর অনুর মুখটা পদ্মার মত হয়ে যাচ্ছিল বারবার। চোখ মেলে মুক্তি পেতে চাইল শমীন। গাছের উপর একটা তারা জ্বল্‌জ্বল্ করছে। জ্বল্‌জ্বলই করছেনা, নড়ছেও। ওটা তারাই কি না কে জানে! হয়ত এরোপ্লেনের আলো। য়ুরোপে যুদ্ধ বেধে গেছে। নাৎসী প্লেনই কিনা কে বলবে! কেমন একটু ভয়-ভয় করতে

লাগ্‌ল শমীনের। কল্‌কাতায়ও যুদ্ধ এসে পড়ল? আস্‌তে পারে এখানেও শত্রুর বমার? মেরুদণ্ড সোজা করে তুল্‌ল শমীন। শাণিত, সভয় দৃষ্টিতে সীমান্তরক্ষীর মতো তাকাতে লাগল তারাটার দিকে। যেন ঘুমন্ত কলকাতার একমাত্র বিনিদ্র প্রহরী সে।

দুই

গলিতে ঢুকে পড়ে মহীতোষ বাড়িতেই এল—আর কোথাও নয়। শমীনকে একটা বিশ্রী অবস্থায় রাস্তায় ফেলে চলে আসাতে মনে এতটুকুও খোঁচা লাগ্‌লনা তার। শমীন ভালো ছেলে—সৎ—রাস্তায় কয়েকজন লোক অন্তত জানুক সে সৎ নয়। কিন্তু মহীতোষ হঠাৎ আজ এতটা সৎ হয়ে দাঁড়াল কেন? এত খারাপ লাগ্‌ছিল কেন তার মেয়েটাকে—মনে হচ্ছিল কেন ঘরটাতে তার দম বন্ধ হয়ে আসছে। মনে পড়ে ওখানে বসে-বসে কি একটা শপথও যেন করছিল সে। এ সব মেয়েকে কি বাঁচানো যায় না-গোছের একটা চিন্তার উপর কঠিন কিছু শপথ। এখন ভাবতেও হাসি পাচ্ছিল তার। বেশ খানিকক্ষণ হেসে নিল মহীতোষ—আর সে হাসি এসে জুড়ে গেল আরেকটা হাস্যকর ব্যাপারে—সে কি না সৎ সেজে বসেছিল ওই হুল্লোড়ের ভেতর! ও রকম পিউরিটান আচরণের কি মানে আছে? মানে নেই—মহীতোষ কিছুতেই মানে খুঁজে পায় না। তবু পিউরিটানের মতোই যে সে বসেছিল সে কথাও ত মিথ্যা নয়। তাছাড়া তখন সে কিছু জবরদস্তি করেও পিউরিটান সেজে বসেনি। পিউরিটান সাজ্‌তে হ'ল তার, ব্যাপারটা যত হাস্যকরই এখন মনে হোক, তখন তাতে যেন তার হাত ছিল না।

একটা কথার উপর মনটাকে অনেকক্ষণ বসিয়ে রেখেছে মহীতোষ—যা তার অভ্যাস নয়। বাড়ি এসে ঢুক্‌ল সে নাচুনে

তালের শীস্ ঠোঁটে নিয়ে। বারান্দার একপাশের ঘরে বাবা তখনও কাগজপত্র টেবিলে জড়ো করে বসে আছেন—যুদ্ধের খবরে উৎসাহ এসেছে বুড়োর, চোখে টাকার স্বপ্ন না থাক্‌লে এ বয়েসে কেউ রাত এগারোটা পর্য্যন্ত জেগে থাকে না। বারান্দার ওপাশের ঘরটা বন্ধ—মহীতোষের খাস কামরা। বাড়িতে ঢুক্‌তে হলে দেখা গেল একটিমাত্র পথই খোলা আছে—মহিমবাবুর ঘর। ঘরে ঢুকে অন্দরের দিকের দরজাটা প্রায় ধরে ফেলেছিল মহীতোষ, মহিমবাবু আরেকটু দেরী করলেই সে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত কিন্তু ঠিক সে-সময়েই তিনি মুখ তুল্‌লেন : "ও তুমি ? তোমার কথাই ভাব্‌ছিলুম—বসো।"

রাত এগারোটায় বসে বসে ইষ্টচিন্তা না করে পুত্রচিন্তা করছিলেন মহিম মুখার্জ্জি, মহীতোষ অবাক হল। অবাক হয়ে পাশের একটা চেয়ারে বস্‌তে হল তাকে।

"কতো তোমায় বল্‌লুম—" মহিমবাবু কাতরোক্তি করলেন : "কয়েকটা 'লুম্' কেনবার ব্যবস্থা কর—কারখানাটা বসিয়ে রেখোনা! ভাব্‌তে পারো এখন একটা ইকুইপ্‌ড্ কটন মিলের কত দাম—কি পরিমাণ রোজগার!"

"রোজগার!" মহীতোষ অবাক হল : "বোম্বে-আমেদাবাদের মিলগুলো শিফ্‌ট্ কেটে দিয়েছে—"

"তুমি ত কেবল ডিপ্রেশনের সুরই ভেঁজে চলেছ—" একরকম খেঁকিয়েই উঠ্‌লেন মহিমবাবু : "জানো য়ুরোপে যুদ্ধ সুরু হয়ে গেছে—ভেবে দেখছ এর ফল ?"

"তাতে আর সুফল কি দেখা যাচ্ছে! ল্যাঙ্কাশায়ারের স্পিণ্ড্‌ল্ ত '১৪ সন থেকে এই '৩৯ সনে প্রায় ছ'কোটি থেকে সাড়ে তিন কোটিতে এসে দাঁড়িয়েছে! ক'বাণ্ডিল সূতো আর ক'গজ কাপড়ই বা বিলেত থেকে আসে! বাজার জাঁকিয়ে আছে জাপান!" টেবিলের একটা পায়া জুতো দিয়ে ঠুকে ঠুকে বিজ্ঞের মতো বলে গেল মহীতোষ।

মহিমবাবু খুসী হলেন। হয়ত অসাধারণ একটা বুদ্ধির ছাপও তিনি দেখ্‌তে পেলেন ছেলের চোখে। কিন্তু তা হলেও মহীতোষের নিশ্চেষ্টতাকে এখন তিনি প্রশ্রয় দিতে পারেন না। এ যুদ্ধ হারালে আর চলবে না। গত যুদ্ধের শেষে বোম্বে আর আমেদাবাদে কতগুলো মিল দাঁড়িয়ে গেল! তাঁরই চোখের উপর। বাংলাদেশে কি কাপড়ের কল হয়না, অস্থির হয়ে উঠেছিলেন মহিমবাবু। পেছনে বন্ধুবান্ধবদেরও উৎসাহ ছিল খানিকটা। 'সোনার বাংলা কটন মিল্‌স্‌ লিঃ'-এর আর্টিকেল্‌স্‌ এবং মেমোরেণ্ডাম অব্‌ এসোসিয়েশন তৈরী হয়ে গেল রাতারাতি। কোম্পানী রেজেষ্ট্রি হল—উৎসাহের জোয়ারে শেয়ারও বিক্রী হল কয়েক হাজার টাকা। সেই জোয়ারেই পানিহাটিতে নিরানব্বুই বছরের লীজে খানিকটা জমিও নেওয়া হল। তারপর ভাটা। বন্ধুবান্ধবদের উৎসাহে ভাটার টান লাগ্‌ল, তাঁরা পেছিয়ে পড়লেন। জমির উপর ছোটমতো একটা তাঁতঘর করে নিয়ে, পনেরো বিশ হাজার যা বাকি রইল তা দিয়ে ব্যাঙ্কে একটা চল্‌তি হিসেব খুল্‌লেন মহিমবাবু। তারপর নিজেই উঠে-পড়ে লাগলেন শেয়ার বিক্রি করতে। শেয়ার বিক্রি হ'ত যে পরিমাণ টাকা বছরে তার দ্বিগুণ তাঁকে টান্‌তে হয়েছে মানেজিং-ডিরেক্টরের রেমুনারেশন বাবদ। এ করেই বছরের পর বছর কলকাতায় বসে খাওয়া আর বাড়ি ভাড়া জোটাতে হয়েছে তাঁকে—একটি মেয়েকে বিয়ে দিতে হয়েছে আর ছেলেটিকে ঠেল্‌তে হয়েছে বি-এ ক্লাশ অবধি। মহীতোষকে তিন তিনবার সুযোগ দিয়েছেন তিনি বি-এ পাশ করবার। মহীতোষের মগজ বেঁকে বস্‌ল। অগত্যা তাকে ডানহাত করে নিতে হল তাঁর কটনমিলের কাজে। কাজ মানে শেয়ার বিক্রি করা। বয়েস হয়ে গেছে মহিমবাবুর, ছুটোছুটি আর করতে পারেন না। এ কাজটাতে বেশ কৃতিত্ব দেখিয়েছে মহীতোষ। কিন্তু কটনমিলের চল্‌তি হিসাবে তাতে টাকার অঙ্ক বেড়ে উঠ্‌ছেনা। তা না উঠুক, ওয়ার্কিং ডিরেক্টর

মহীতোষ মাসান্তে একটা ভদ্র রকমের মাইনে পেয়ে আস্‌ছে। তবে এভাবে আর কতদিন চল্‌বে—সেকথাও ভাবেন মহিমবাবু। শেয়ারহোল্ডারদের ভয়ে তটস্থ আছেন, বাড়ি থেকে প্রায় বেরোনই না। তাঁতঘরে কিছু লোহালক্কড় জড়ো করা আছে—আর মনে মনে তাঁর প্রতিজ্ঞাও আছে মিল একটা খাড়া করবেনই। এই যুদ্ধটাকে ফস্‌কে যেতে দিলে চল্‌বেনা। মহীতোষ এখনও ঠিক বুঝ্‌তে পারছেনা—কটনমিলগুলোর কি সুদিন এগিয়ে আসছে!

"জাপান!" মহিমবাবু হাস্‌লেন: "জাপানকে যুদ্ধ করতে হচ্ছেনা চীনের সঙ্গে?"

"সেই যুদ্ধের খরচা তুলে নিচ্ছে আমাদের এখান থেকে! ভারতবর্ষের প্রোটেক্‌টেড্‌ কটন ইণ্ডাষ্ট্রীকেও ডুবো-ডুবো করে দিল ওরা!"

"যুদ্ধটাকে তুমি বুঝতে পারছনা। দেখ্‌বে কি রকম ফেঁপে ওঠে বোম্বে আর আমেদাবাদ! ইংল্যাণ্ড যুদ্ধে ভিড়ে গেলেই কেমন শিফ্‌ট্‌ বেড়ে যায় ওখানে দেখবে!"

"এবার এখানে গতবছর থেকে প্রায় ছাব্বিশ কোটি গজ কাপড় কম তৈরী হয়েছে!"

"ওসব ষ্ট্যাটিস্‌টিক্‌স্‌ এখন ভুলে যেতে পারো। যুদ্ধ একটা রাক্ষস, তার চাহিদার শতাংশও তোমার ভারতবর্ষের কখানা মিল মেটাতে পারবেনা—করুকনা চব্বিশ ঘণ্টা কাজ।"

বিজ্ঞের মতো মহীতোষ অন্যমনস্ক হয়ে উঠ্‌ল, যেন মহিমবাবু ছেলে-মানুষের মতো কথা বল্‌ছেন।

"কিছু টাকা দরকার আমাদের—"প্রার্থীর দৃষ্টি নিয়ে মহিমবাবু ছেলের দিকে তাকালেন: "এখনো খুঁজলে হয়ত মেসিনারিজ্‌ কিছু পাওয়া যাবে—কিছু শেয়ার-মানি যদি তোলা যেত—"

"শেয়ার বিক্রি আর হবেনা—"মহীতোষ ঠোঁট কুঁচকে দুবার মাথা নেড়ে কথাটাকে দৃঢ় করে তুল্‌লে।

"টাকার খুবই দরকার এখন, একটা বছর কারখানা চললে কোম্পানীর হিসেবে একটা মোটা টাকা দাঁড়িয়ে যেতো।" ছেলের অসম্মতির উপর একটা মোলায়েম আপীল চড়ালেন মহিমবাবু।

"এই মন্দার বাজারে কটনমিলের শেয়ার কে কিনবে—তা-ও যদি চালু মিল হ'ত তাহলে বরং একটা কথা ছিল।"

মহীতোষ চুপ করে গেল কিন্তু মহিমবাবু চুপ করলেন না। চারদিক থেকে শক্ত-পোক্ত করে একটা প্ল্যান তিনি ফেঁদে বসে আছেন—কি কি উপায়ে টাকা জোগাড় করা যায় তা-ও তিনি মনে মনে একের পর এক সাজিয়ে রেখেছেন। শেয়ার বিক্রির কথাটা ফেঁসে গেল বলে চোখে তিনি অকূল পাথার দেখ্‌লেন না, চট করে আরেকটা প্রস্তাব উপস্থিত করলেন :

"কোনো ব্যাঙ্ক থেকে যদি ক্যাশ ক্রেডিট কিছু পাওয়া যেত—"

"আমাদের ব্যাঙ্কত নিশ্চয়ই দেবেনা, আমাদের অ্যাসেট্ তাদের জানা আছে—" হাসির মতো হয়ে খানিকটা লজ্জা ফুটে উঠ্‌ল মহীতোষের ঠোঁটে।

"আমাদের ব্যাঙ্কে নয়—" মহিমবাবুর ঘোলাটে চোখগুলো করুণ হয়ে আরেকটু ঘোলাটে দেখাল : "অন্য কোথাও। শুনেছিলুম তোমার কোন্ বন্ধুর একটা ব্যাঙ্ক আছে!"

"ও দাসুর ব্যাঙ্ক?" মহীতোষ একটা ক্লান্তি নিয়ে উঠে দাঁড়াল : "দেখব কাল কথা বলে।"

অন্দরে ঢুকে পড়ল মহীতোষ, অনেকক্ষণ কথা বলা গেছে, আর নয়। মহিমবাবু তার পেছুপেছু যাবার মতলব করেছিলেন, আবার কি ভেবে চেয়ার নিয়ে টেবিলের কাগজপত্র হাতড়াতে সুরু করলেন। প্রাথমিক খরচার একটা খসড়া তৈরী করেছেন তিনি, ওটাকে নির্ভুল হিসেবে দাঁড় করাতে হবে কাল। আজ আর কিছু না করলেও চলে—আজকের মতো পরিষ্কার তিনি।

কপালের উঁচু উঁচু রগগুলোতে আঙ্গুল বুলোতে লাগ্‌লেন মহিমবাবু। আইডিয়াটা মহীর মনে ধরেছে!

ঘুমোবার আগে মহিমবাবু স্বপ্নের মতোই চোখের উপর একটা ছবি ফুটিয়ে তুল্‌লেন—তাঁর কটনমিলস্‌ বেইলে-বেইলে কাপড় তৈরী করছে। সে-ছবি সত্যিকারের স্বপ্নে হয়ত আরো উজ্জ্বল রং-এ ফুটে উঠল। ঘুমোতে লাগলেন তিনি তুবড়ানো ঠোঁটগুলোতে হাসির মসৃণতা নিয়ে, গত কুড়ি বছরে একদিনও হয়ত এমন ঘুমোতে পারেন নি।

কিন্তু মহীতোষ শুয়ে শুয়ে ভাবছিল অন্য রকম কথা আর ছবি। কটনমিলস্‌ বাষ্প হয়ে কখন উড়ে গেছে তার মন থেকে! ভাবছিল সে আজকের দিনটাকে। শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর যে-যে ঘটনাগুলো হয়ে গেল তার ভেতর থেকে নিজেকে সে খুঁজে আন্‌তে চাইল। বি-টি পড়তেই এসেছে শ্যামলী কল্‌কাতায় সম্পর্কিত এক মামার বাসায় অতিথি হয়ে আছে। কিন্তু প্রায় কুড়ি পঁচিশ তিথি পার হ'তে চল্‌ল, মামা-মামী স্বাভাবিক বিরক্তি দেখাতে সুরু করেছেন—সব খবরই জানে মহীতোষ। শ্যামলীকে আশ্বাস দিয়েছে সে তার পড়ার খরচ দেবে—ঠিক শ্যামলীকে নয়, শ্যামলীর মাকেই এই আশ্বাসের চিঠি পাঠিয়েছিল সে মফঃস্বলে। মাসীমা হিসেবে পরিচিত ছিলেন মহিলা মহীতোষের কাছে, মেয়ের পড়ার আবেদন জানিয়েছিলেন তাকে, সে-আবেদনে মহীতোষ একটু উদার না হয়ে থাক্‌তে পারেনি। সত্যি, মহীতোষ উদার হ'তে পারে একেক সময়। কিন্তু শ্যামলীর সঙ্গে প্রথম পরিচয়ের পর মহীতোষ আর নিজেকে উদারতার উঁচু আসনে বসিয়ে রাখতে পারলেনা। মনে হল তার পড়ার খরচের ক'টা টাকা শ্যামলী তার কাছ থেকে নিজের জোরেই আদায় করতে পারে—ও টাকাটা পরিচয়ের মূল্য ছাড়া আর কিছু নয়। মহীতোষ আরো কিছু দিতে

রাজী আর তাই অকাতরে ট্যাক্সি-সিনেমা-রেস্তোরাঁয় টাকা ঢেলে চলেছে সে।

প্রণবকে দেখে এতদিন পরে হঠাৎ আজ এতটা মেতে উঠেছিল কেন মহীতোষ? শ্যামলীর কোনো অপরাধে? শ্যামলীকে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছে সে অনেকদিনের মতোই—অনেকদিনের মতোই শ্যামলী চুপচাপ গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছে তার পাশে। কিন্তু আজ কি একটু বেশিরকম গম্ভীর ছিলনা শ্যামলী, একটু অন্যমনস্কও? নিশ্চয়! মহীতোষ ভুল বুঝ্‌তে পারেনা। মেয়েদের সে ভুল বোঝেনা। ছেলেদের সঙ্গে মেশবার কোনো সুযোগই যারা নষ্ট করতে চায়না সে-জাতেরই মেয়ে শ্যামলী। প্রথম দিনের পরিচয়েই তার সঙ্গে ও অন্তরঙ্গ হয়ে উঠেছিল, আজ যেমি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠ্‌তে চেয়েছে সুদাসের সঙ্গে।

ওকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে এসে তাই আজ মহীতোষ কিছুতেই নিজেকে হাল্কা মনে করতে পারছিলনা। তারপর প্রণবের সঙ্গে দেখা। প্রণব বলে, শালীন হয়ে থাকাটা নাকি আমাদের একটা পোষাক, নেহাৎই বাইরেকার পোষাক। এবং এ পোষাকটা নির্ব্বিবাদে ছেড়ে দিয়ে নিজেকে খুঁজে পাওয়া যায় ওসব মেয়েদের ওখানে গেলে। তাছাড়া মদ খেয়েও নাকি সভ্যতা বা ভদ্রতার পাঁক থেকে নিজেকে উদ্ধার করে নেওয়া যায়। বেশ সংস্কারমুক্ত কথাগুলো প্রণবের—মন্দ লাগেনা মহীতোষের শুন্‌তে। মন্দ লাগেনি আজও। বেশ একটা উত্তেজনাই অনুভব করেছে। উত্তেজিত হয়েই ভেবেছে, প্রেম মানে শালীনতার মোড়কে নির্জ্জলা দেহলিপ্সা? শ্যামলী—শালীনতা = ওসব মেয়ের যে-কেউ।

কিন্তু শালীনতার পোষাকটা ত ছাড়তে পারলনা মহীতোষ! ভদ্র মেয়েদের সঙ্গে চলাফেরা করেই এ দোষ হয়েছে তার। রক্তে মিশে গেছে দোষটা। যাদের সে ভীরু ভেবে জোর গলায় গালাগালি দেয় তাদের চেয়েও ভীরু সে—শমীন-সুদাসের চেয়ে ভীরু।

এই ভীরুতাকে শরীরে বয়ে বাইরে সে কতো লাফঝাঁপই দেখাচ্ছে! মহীতোষ হাসতে লাগ্‌ল—মহিমবাবুর মতো প্রশান্তির হাসি নয়, বিদ্রূপের হাসি আর তা-ই তা কঠোর।

পরদিন সাড়ে দশটায় যখন মহীতোষ গলা উঁচু করে টাই-এর গেড়োটা এঁটে নিচ্ছিল তখনও মুখে তার তেম্‌নি কঠোর, কঠিন হাসি। সুদাসের ব্যাঙ্কে তাকে যেতে হচ্ছে। সব দিনের চেয়ে বেশি দুরস্ত হয়ে, সবচেয়ে দামী সুট-টা গায়ে চড়িয়ে। সুদাসের সঙ্গে হৈ-হুল্লোড় করতে হবে বেদম, দেখাতে হবে জীবনটা ফুঁয়ের উপর চালিয়ে নেওয়া মোটেই শক্ত নয়। তারপর একসময় খুবই হাল্কা কথার উপর চাইতে হবে টাকা। কিন্তু তারপর? তারপর কি খুব হাল্কা মন নিয়ে সুদাসের জবাবের প্রতীক্ষা করতে পারবে মহীতোষ? যাচকের মতো একটু করুণ, অসহায় দেখাবে না কি তার মুখ? সুদাসের কাছে এমনি অপদস্থ হয়ে বসে থাকতে হবে তাকে! প্রতিমুহূর্ত্ত যে-সুদাসকে হুল্‌ ফোটাতে ইচ্ছা করবে তার, শ্যামলীর ব্যবহারটা সুদে-আসলে যখন সুদাসকে ফিরিয়ে দিতে হাঁসফাঁস করতে থাক্‌বে তার মন তখন কি না প্রার্থীর কাতরতা তার মুখে! তাই হাসছিল মহীতোষ, শালীনতার শাসানিতে কান্নাকে দাবিয়ে যে হাসি হাসতে হয় তা-ই ছিল তার ঠোঁটে।

সুদাসের কামরার বাইরে দাঁড়িয়ে পুশ্‌-ডোরটা ঠেল্‌বার আগেও সে হাসি মুখ থেকে তার মিলিয়ে যায়নি। কিন্তু কামরায় ঢোকবার সঙ্গে সঙ্গে উচ্ছল হাসিতে সেই চিরদিনকার মহীতোষ সুদাসের সামনে গিয়ে দাঁড়াল।

"বোস—" টেবিলের উপর অনেকটা ঝুঁকে পড়ে বললে সুদাস—মুখে সপ্রতিভ, সুন্দর হাসি। সমস্ত শরীরটা তার অন্তরঙ্গতায় মুচড়ে উঠেছে যেন, কেবল টেবিলটার বাধায় আর ব্যবধানে সে মহীতোষকে জড়িয়ে ধরতে পারছেনা।

"বেশ জাঁকিয়ে আছিস্!" চোখে মুখে উজ্জ্বল হয়ে সশব্দে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে মহীতোষ বসে পড়ল।

"জাঁকের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠতা নেই, ওটা ব্যবসার পোষাক!" মেয়েলি মিষ্টি হাসি হেসে চলেছে সুদাস—কালকের কার্জ্জন পার্কের সুদাসের সঙ্গে এর যেন ঢের তফাৎ! এ চেয়ারে, এ চেহারায় সুদাসকে আর কোনদিন দেখেনি মহীতোষ। কেমন যেন একটু আমোদই লাগছিল তার।

"এই আমি প্রথম এলুম তোর এখানে, না?" মহীতোষের কথা যেন ফুরিয়ে আসছিল।

"তোরা কি আসিস্ এ 'দীনজনকুটীরে'? বড়ো বড়ো ব্যাঙ্কের সঙ্গে তোদের কারবার! এসব ব্যাঙ্কত তোদের চোখে ব্যাঙের ছাতার সামিল!" সুদাস পেতলের এন্‌ভেলাপ-ওপেনারটা দিয়ে কাচের পেপার-ওয়েটের ভেতরকার বুদ্বুদগুলোকে তাক করতে সুরু করল।

উত্তরে মহীতোষের কিছু বলবার ছিলনা তাই চুপ করে থাকাটাকে একটা বিরাট হাসি দিয়ে ভরে তুলতে হল।

"আমি কি মিছে কথা বলছি? সত্যি বলত মহী, তোরা ভাবিস কি না এরকম?" মোটা একটা নীল পেন্সিল হাতে তুলে নিল সুদাস: "অবশ্যি তোদের দোষ আমি দিচ্ছিনে। এত আর মিথ্যে নয় যে আমার ব্যাঙ্ক খুবই ছোট! বাপের ত আর টাকা ছিলনা, দুয়ারে-দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে শেয়ার-ক্যাপিটেল জমাতে হয়েছে, ডিপোজিট্ সিকিওর করতে হয়েছে। হাতে আমার একটি কপর্দ্দকও অর্পণ না করে অনেকে চোর-জোচ্চোর উপাধিও আমায় দিয়েছেন!" প্রেমের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবার মতো করেই উৎফুল্ল হয়ে সুদাস বলে যেতে সুরু করেছিল—আরো হয়ত অনেক কিছুই তার বলার ছিল—কিন্তু মহীতোষ তাতে নিজেকে খুবই বিপন্ন বোধ করলে। এ সব কথা শুনবার কি তার দরকার আছে? দরদ দেখাতে

আসেনি সে সুদাসকে, প্রার্থী হয়ে না এসে মিছিমিছিও যদি দেখা করতে আস্‌ত তাহলেও এসব ইতিহাস শুন্‌তে সে প্রস্তুত ছিলনা।

স্বাভাবিক চরিত্রে ফুটে উঠ্‌তে চেষ্টা করল মহীতোষ: "ঈস্, কী ভীষণ আওয়াজ করছে রে তোর টাইপিষ্ট! ব্যাটাছেলের চোয়াড়ে আঙ্গুল কান ঝালাপালাও করে, মেসিনও জখম করে। একটা মেয়ে টাইপিষ্ট রাখ্‌তে পারিসনা?"

"পারি। কিন্তু বানান শুদ্ধ করতে ডিক্‌শেনারির খরচা দিয়ে ব্যাঙ্ক দেউলে হবে"—মোলায়েম একটি হাসি দিয়ে কথাগুলোকে ছিমছাম করে তুল্‌লে সুদাস।

আবার কথা ফুরিয়ে যাচ্ছে মহীতোষের, মুখে একটা সিগারেট গুঁজে দিয়ে খানিকটা সরগরম হতে চাইল সে।

"তারপর, আর সব খবর কি বল, তোর সেই বোন ভর্ত্তি হয়েছে বিটি-তে?" সুদাসও প্রসঙ্গান্তরে বিশ্রাম খুঁজল।

"বোন?" ঠোঁটের সিগারেটের দরুণ অদ্ভুত একটা আওয়াজ বেরুল মহীতোষের মুখ থেকে।

"কালকের সেই মেয়েটি?"

"কালকের মেয়েটি! ও ত কালকের মেয়েই ছিল। আমার বোন আবার কি?"

"তা বুঝ্‌তে পেরেছিলুম। মেয়েটি বেশ স্মার্ট।"

"টাইপিষ্ট করে নিতে চাস? খবর দোব?"

"মনে হল চাকরী পেলে করবে।"

"চাকরি পেলে কে চাকরি করেনা, বিশেষ করে তোদের মতো লোভনীয় ব্যাচেলারদের কাছে।"

"অফিস-বস্ হিসেবে আমি হয়ত খুব লোভনীয় নই—যাক বাজে কথা, তোর ব্যবসার খবর কি বল্!" শ্যামলী সম্বন্ধে খুব একটা ধারাল বিদ্রূপ করবার সুযোগ পেয়েও মহীতোষ সুদাসের কথার

গোড়ার দিকটা লুফে নিলনা—শেষের দিকটাতেই উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌ল : "সো-সো। ভারি ডাল্‌ মার্কেট !"

"তাই। যুদ্ধটাতে যদি বেঁচে যাওয়া যায়—সবারই যা ডুবো-ডুবো অবস্থা !"

"কটনের মার্কেট ত যাচ্ছেতাই !"

"তোদের মিল কেমন চলেছে ?"

"কোনোরকম !" সিগারেটের ধোঁয়ার আড়াল থেকে বললে মহীতোষ।

"কটনের প্রোস্পেক্ট ভালো।"

"বাবা বলছিলেন বটে এক্সটেনশনের কথা—আমার ওসব হ্যাঙ্গামা ভালো লাগেনা। খাইদাই—বেশত আছি !" ধোঁয়ার বিচিত্র কুণ্ডলী তৈরী করে বেশ থাকার আনন্দটা প্রকাশ করলে মহীতোষ।

"মাথার উপর বাবা বেঁচে থাক্‌লে বেশ থাক্‌তে আর অসুবিধে কি ?"

"বটে ! কোম্পানীর জন্যে কাজ করিনে আমি ? ক'টাকা আর কোম্পানী দিচ্ছে তার জন্যে ?"

"এর উত্তরেও বাবার বেঁচে থাকার কথাটাই আসে —" একটু থেমে নিয়ে বললে সুদাস : "বাবা বেঁচে আছেন বলেই কোম্পানী থেকে কম মাইনে নিয়েও বেশ থাকা যায়।"

প্রসঙ্গটা লক্ষ্যস্থলে পৌঁছে গিয়েছিল, কিন্তু কেমন যেন বেঁকে যাচ্ছে এখন। কটনমিলের এক্সটেন্‌শনের কথায় ইচ্ছা করেই মনোযোগ দেয়নি তখন মহীতোষ, হাত থেকে পিছলে যেতে দিয়েছে কারণ গরজটাকে ধরা দিতে চায়না সে। কিন্তু এখন উপায় ? উপায় খুঁজতে চেয়ারে নড়ে চড়ে সোজা হয়ে বস্‌ল মহীতোষ, আর গা এলিয়ে রাখলে চল্‌বেনা। কিন্তু এই মানসিক সতর্কতায় মুখটা যেন কেমন শুক্‌নো হয়ে উঠ্‌ল—মুখটা দেখতে না পেয়েও মনে

হচ্ছিল তার মুখের চেহারা যেন স্বাভাবিকতা হারিয়ে ফেলেছে। নিজেকে বাঁচাতে চেষ্টা করেই যেন মহীতোষ হঠাৎ একটা কোলাহল ফুটিয়ে তুল্‌ল গলায়ঃ "ধেৎ ভালো লাগ্‌ছেনা। ওঠ দিকিনি সুদাস, চল্‌ ক্যাসানোভায়।"

"ক্যাসানোভায়?" ঠোঁটের দুপাশ নীচে নামিয়ে সুদাস তাকিয়ে রইল মহীতোষের দিকে।

"অপরাধ হবে? না হয় একদিন হলই অপরাধ। তাতে ত আর ব্যাঙ্কের ত'বিল উড়ে যাচ্ছেনা।"

"কিন্তু আমিও বা হঠাৎ উড়তে যাই কেন?"

"ওটাও চরিত্রবলের একটা পরীক্ষা—উড়তে অভ্যাস না করে ওড়া যায় কি না!"

"তার চেয়ে এখানে বসে বসে গল্প করছি, একি ভালো লাগ্‌ছেনা তোর? চা খাবি? ভালো নয়, তবে চা।" কলিং বেলের বোতামটা টিপে দিলে সুদাস।

"গল্প মানে ত শেয়ার, ক্যাপিটেল, ইনভেষ্টমেণ্ট এই সব?" এবার যেন সত্যি-সত্যি নিজের উদ্দেশ্যটার উপরই বিরক্ত হয়ে উঠেছিল মহীতোষ। ক্যাসানোভার নামে একটা অস্থিরতা বোধ করছিল সে স্নায়ুতে। সুদাসকে ক্যাসানোভার পরিবেশে টেনে নিয়ে কাজ হাঁসিলের সুবিধে অনেক। সে-সুবিধের কথা একটু আগে মহীতোষের মনে উঁকি দিয়ে গেছে কিনা মহীতোষ ঠিক যেন বুঝতে পারছিল না। ক্যাসানোভার প্রতি বিশুদ্ধ আসক্তিতেই এখন সে চঞ্চল।

"ব্যবসায়ীর গল্প মানেই তাই।" সুদাস মহীতোষের মাথার উপর দিয়ে দ্বারস্থ বেয়ারার দিকে চেয়ে বল্‌লেঃ "দু কাপ চা।"

"ইনভেষ্টমেণ্ট করিস ত বস্‌তে পারি—গল্প শুন্‌তে চাইনে—" বেয়াড়া শব্দ করে হেসে উঠ্‌ল মহীতোষ।

"তার মানে?" তার মানে যে মহীতোষ এক্ষুণি কোনো মেয়ের কথা বল্‌বে তা অনুমান করেই সুদাস হাসতে লাগ্‌ল।

হাসির ধমক থামিয়ে এনে মহীতোষ টেবিলের উপর একটা সিগারেট প্রচণ্ড ভাবে ঠুক্‌তে সুরু করলে: "মানে—টাকা দিতে পারিস আমাদের কোম্পানীকে?"

"টাকা লেনদেনই যখন ব্যবসা, পারিনে?"

"তা হলে দে—" ব্যাপারটাকে সহজ করবার জন্যে মহীতোষ টেবিলের উপর হাত বাড়িয়ে দিলে।

"কোম্পানীর কাগজপত্র নিয়ে আয়, নিশ্চয় দোব।"

"তার মানে কোম্পানীকে বন্ধক রেখে?"

"তার মানে কোম্পানী সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হয়ে।"

আভিজাত্য খোয়া যাবে এ ঘটনা মহীতোষের অসহ্য—কোম্পানীর কাগজপত্র বাইরে এলে তার আশঙ্কা ষোল আনা। মহীতোষ সবই বুঝ্‌তে পারে আর হয়ত তাই একটু মেজাজী হয়ে ওঠে: "পার্সোন্যাল সিকিউরিটিতে টাকা না পেলে তোর কাছে টাকা চাইব কেন?"

মহীতোষের মেজাজের ঝাঁঝটা চোখেমুখে এসে লাগে সুদাসের অথচ আশ্চর্য্য, তার মুখের হাসি একটুও ম্লান হয়ে ওঠেনা তাতে। অথচ রাস্তায় ঘাটে এ ধরণের কথা শুন্‌লে, বলুক ত সুদাস, হাসির রেখাগুলোকে সে কদর্য্য ঘৃণার রেখায় পাল্টে ফেলত কি না! মহীতোষকে নিয়ে ত কথাই চলেনা—প্রবীর বা শমীনের সামান্য একটু মেজাজের গন্ধেই নিজেকে সাম্‌লে রাখা সুদাসের পক্ষে কঠিন। হয়ত এই চেয়ারে এসে বস্‌লে নিজেকেই ভুলে যায় সুদাস। ঠিক এম্নি সে নিজেকে ভুলে যেত মার কাছে গিয়ে দাঁড়ালে, মাটির ঢেলার মতো সেই জড় অসহায় মানুষটির কাছে তার যেন আর অন্য কোনো পরিচয় ছিলনা—সাধারণ একটা মাটির ঢেলা ছাড়া।

"জানিস্ত মহী, ব্যাঙ্ক আমার একার নয়—আরো ডিরেক্টররা আছেন, তাঁদের মতামত নিতে হয়।" অদ্ভুত করুণ শোনাল সুদাসের কথাগুলো।

"ও সার্টেনলি—" কোম্পানীর আইন-কানুন মহীতোষ কি কম জানে? তাছাড়া পাকা দালালের চোখ তার শিকারের কথাগুলোর ঢেউ ডেসিমিটারে মেপে নিতে পারে। যতোই তির্য্যক গতি নিক সুদাস, তার নিস্তার নেই, চৌম্বক-ক্ষেত্রে সে এসে পড়েছে। কিন্তু এখনি মহীতোষের অভিনয়ের সময়। খুসী হয়ে উঠ্‌লে কি হবে, খুসী-খুসী দেখানো তার চল্‌বে না—গম্ভীর হয়ে যেতে হবে অস্বাভাবিক রকম। কপালে ভুরু তুলে ঘাড়ের একটা ছোট্ট দুলুনির সঙ্গে তাই আবারও বল্‌লে মহীতোষ: "সার্টেনলি, ডিরেক্টরদের জিজ্ঞেস করা উচিত।"

"সবাইকে নয়—একজনকে—" সুদাস যেন খোসামুদে হয়ে উঠ্‌ল: "আর তাঁকে তুই-ও নিশ্চয় চিনিস। শরৎ দত্ত—এম্‌-এল্‌-এ। আমাদের শমীনের বাবা।"

"ও"—না চিন্‌লেও এটুকু শব্দ প্রয়োজনের খাতিরে মহীতোষকে উচ্চারণ করতে হল।

"চমৎকার লোক!" সেই নেপথ্যের ভদ্রলোক সম্বন্ধেও সুদাস উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌ল, এ-প্রশংসাবাণী তিনি শুন্‌তে পাবেননা জেনেও। আসলে উৎসাহিত হয়ে উঠেছে সুদাস মহীতোষের প্রস্তাব শুনে—শরৎ দত্তকে প্রশংসা করা সে-উৎসাহেরই খানিকটা উত্তাপ। মহীতোষের চরিত্রকে পছন্দ না করলেও সুদাস ব্যাঙ্কার হিসেবে মহীতোষের কাল্পনিক সচ্ছলতাকে সম্ভ্রম করে। বন্ধুবান্ধব বা পরিচিতদের কাছে এতদিন যে ঐশ্বর্য্যের মুখোস পরে উপস্থিত হয়েছে মহীতোষ তা আজ প্রায় সার্থক হয়েই উঠ্‌ল।

"শমীনও ভালো ছেলে—" মহীতোষ চেয়ার ছেড়ে উঠ্‌ল: "তার বাবা নিশ্চয় চমৎকার হবেন!" প্রথম পরিচয়ে মেয়েদের

দিকে যে-হাসি নিয়ে তাকায় মহীতোষ সে রকম একটা হাসিই ফুটিয়ে তুল্‌ল চোখে।

"এ-কি—চা খেলিনে ?" সুদাস ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

"খেতে হবে ?"

"চা আন্‌তে গেছে যে !"

"তাহলে খেয়েই যাই—" জামার আস্তিন তুলে ঘড়িটার দিকে এক পলক চেয়ে আবার বসল মহীতোষ : "দেরী হবেনা নিশ্চয়ই। বারোটায় আমাদের ডিরেক্টর বোর্ডের আবার একটা মীটিং আছে !"

আবার একটা সিগারেট ঠোঁটে তুলে নিয়ে, সুদাসের টিনটাই সুদাসের হাতের কাছে এগিয়ে দিল মহীতোষ। সিগারেটে সুদাসের মন ছিলনা, উদ্বেগ ছিল চা-বাহী বেয়ারাটার জন্যে।

"তাহলে ডিরেক্টরবোর্ডে তোর ব্যাঙ্কের কথা বল্‌তে পারি ?" মহীতোষ সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কথাটা জড়িয়ে নিলে।

চায়ের অপেক্ষায় থেকেই সুদাস বল্‌লে : "ডিসিশন ত সম্পূর্ণ আমার উপর নয়—" কথাটার শেষ দিকে উজ্জ্বল হয়ে উঠল সুদাসের মুখ, যথাসম্ভব পরিষ্কার কাপে চা নিয়ে এসেছে বেয়ারা।

সুদাসের ব্যাঙ্ক থেকে খুব নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এলোনা মহীতোষ। মনে হল টাকা সে দেবে তবু মহাজনী মনকে ত সম্পূর্ণ বোঝা যায়না—বিশ্বাস করা যায় না। হাসিখুসী হয়ে কথা বল্‌তে হঠাৎ যে সূক্ষ্ম প্রতিকূল হাওয়ায় মেয়েরা বিষণ্ণ হয়ে ওঠে তার চেয়েও সূক্ষ্মতর হাওয়া মহাজনী নৌকোর পাল ফিরিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট। সুদাসের উপর নির্ভর করতে পারছেনা মহীতোষ।

কিন্তু সুদাসকে ছেড়ে দিলে কার উপর আর নির্ভর করা চলে ? কারো উপরই নয়। তখন সামনে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে ক্ষুধার্ত্ত দুটো চোখ শুধু চক্‌চক্‌ করবে—তার বাবার, মহিমবাবুর দুটো চোখ।

ভাদ্রের বিশ্রী রৌদ্রে চৌরঙ্গীতে এসে নাম্‌ল মহীতোষ—যখন কয়েক গ্লাস ঠাণ্ডা বিয়ারের কথা ছাড়া আর কিছুই মনে হতে পারে না ভদ্রসন্তানদের। সুদাসকে ছেড়ে দিলে কার উপর নির্ভর করা চলে? বিয়ারের উপর।

ব্রিষ্টলে ঢুকবার মুখে ভাবছিল মহীতোষ ডিরেক্টর বোর্ডের মীটিং-এর কথাটা বলেও সুদাসের মুখ থেকে একটা কবুল জবাব পাওয়া গেলনা! কি আর করা যায়! তারপর যে কি করা যাবে সে-প্ল্যান এরকম খালি মাথায় এসে ধরা দেবেনা। সুদাসকে ছেড়ে দেওয়া যায়না হাতে এসে পড়েছে সে, এখন ফস্কালে তা মহীতোষেরই দোষ। বেশি টাকা নেই পকেটে। এক বোতল বিয়ারেই না কি নেশা করা যায়—অনেকক্ষণ ধরে সিপ্‌ করে করে খেতে হয়—কে যেন বলেছিল—কে?—বোধ হয় প্রণব। নেশা করার অলিগলি সবই তার জানা। সদর্পেই ঘোষণা করে প্রণব, অলিগলি নিয়েই আধুনিক সাহিত্যিকের কারবার—সদর রাস্তায় রবিঠাকুর চলেছেন, তারা ভুল করেও সে পথে যাবে না।

প্রণবকে পাওয়া গেলে বেশ হত এখন। তার সাহিত্যিক প্রতিভা ফ্রয়েডের জুড়ি হয়ে মেয়েদের পেছনেই শুধু ধাওয়া করে না—বৈষয়িক বুদ্ধিতেও তার গতিবিধি তুখোর। কোন্‌ প্যাঁচে সুদাস কাৎ হয়ে এখন সটান শুয়ে পড়বে প্রণব তা নির্ভুলভাবে বাৎলে দিতে পারত। বাংলাদেশের পলিটিক্সের সৌভাগ্য যে প্রণব কলম ছেড়ে প্ল্যাটফর্ম নেয়নি—পলিটিক্সের নেশায় পেলে প্রণব এতদিনে গান্ধী-জিন্নাকে বগলদাবা করে ভারতবর্ষের আকাশ অন্ধকার করে তুল্‌ত।

বিয়ারের গ্লাসটার দিকে তাকিয়ে অনেকক্ষণ ধরে প্রণবকে স্মরণ করে নিল মহীতোষ। বিয়ারের গন্ধে প্রণবকে ভুলে থাকা যায় না। বরং সুদাসকে ভুলে থাকা যায় কিন্তু এসব মুহূর্ত্তে প্রণব অপরিহার্য্য।

সিপ্ করেও গ্লাসটা ফুরিয়ে এলো একসময়। বোতল থেকে বাকিটুকু গ্লাসে ঢেলে নিয়ে একটা সিগারেট ধরালে মহীতোষ। কেমন যেন বিষণ্ণ হয়ে যাচ্ছে স্নায়ুগুলো—একটু নরমই যেন হয়ে উঠ্ছে মন। শ্যামলীকে মনে পড়ছে? মনে মনে শ্যামলীর সঙ্গে অত্যন্ত রূঢ় ব্যবহার করেছে বলেই কি? কেন এতটা রূঢ় হয়ে উঠেছে মহীতোষ শ্যামলীর উপর। কোনো কোনো মুহূর্ত্তে শ্যামলীকে সত্যি সে ভালবেসেছে তবে—এ রূঢ় ব্যবহার হয়ত সে ভালোবাসারই মার। পরিষ্কারভাবে ভেবে দেখ্তে গেলে বল্তে হয় কাল বিকেল থেকে যৌন-ঈর্ষায় ভুগ্ছে মহীতোষ। সুদাসের চোখের উপর শ্যামলীর একটা কদর্য্য ছবি তুলে ধরতে চেয়েছে তাই যাতে শ্যামলীর উপর থেকে সুদাসের মনের মুঠো আল্গা হয়ে আসে।

এ গ্লাসটাও শেষ হয়ে আস্ছিল আর তার সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীর উপর একনিষ্ঠতাও। ততটুকু মাতাল মহীতোষ হতে পেরেছে যখন চরিত্রের ছোটখাট সূক্ষ্ম কোণগুলো ভোঁতা হয়ে যায় কিন্তু ততটুকু মাতাল সে হয়নি যখন চরিত্রের মূল মোটা চেহারাটাই আর বোঝা যায় না। একটা অস্থির প্রজাপতির মতো তার মন থেকে উড়তে সুরু করেছে শ্যামলী। ওকে ধরে রাখবার চেষ্টা করে কে? দরকারও বা কি? এখানে বসে বসে বিয়ার খাওয়া ছাড়া আর কিছু দরকার আছে কি মহীতোষের? বয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে একটা তুড়ি বাজিয়ে মহীতোষের মনে হল কিছুরই আর দরকার নেই। নেই? সত্যিই কিছুরই আর দরকার নেই? পকেট চাপ্ড়ে দেশলাইটা খুঁজতে সুরু করল মহীতোষ। পকেটে নেই দেশলাই—কোথায় গেল! এদিকওদিক খুঁজে মেঝের উপর আবিষ্কার করে কুড়িয়ে নিলে সে দেশলাই। দরকার নেই আবার! এক্ষুণি কি ভীষণ দরকার পড়েছিল দেশলাইটার। প্রণব বলে, সিগারেটের আগুন নিভতে দিলে বিয়ারের আগুনও নাকি জল হয়ে যায়। নেহাৎ মিথ্যা নয় কথাটা। নূতন একটা

সিগারেট ধরিয়ে তৃতীয়-চতুর্থ গ্লাসের জন্যে তৈরী হল মহীতোষ। তারপর অত্যন্ত সন্তর্পনে পকেটে হাত ঢুকিয়ে দেশলাইটার নিরাপত্তা বিধান করলে। কিন্তু হাতে ঠেক্‌ল তার ক্ষীণ কলেবরের ব্যাগটা।

বোকার মতো একটু আগে ভাব্‌ছিল কি না মহীতোষ কিছুরই তার দরকার নেই। ক'টা টাকা আর আছে ব্যাগে! টাকার যে কি ভীষণ দরকার তার তা আর বলা যায়! একান্ত বাধ্য ছাত্রের পড়া দেবার মতো করে যে বয়টা গ্লাসে বিয়ার ঢেলে দিচ্ছে বিল ফেরৎ খুচরো পয়সাগুলো পাবার উৎসাহেই ত! বয়ের পাওনার কথাটা কোনদিন মনে হয়নি মহীতোষের, আজই মনে হচ্ছে। ব্যাগে আর তেমন মোটা টাকা নেই আজ। ব্যাগের ভবিষ্যৎটাও কি খুব সুস্থ? কোত্থেকে আস্‌বে টাকা? টাকা সে রোজগার করেনা যোগাড় করে। যোগাড়ের জায়গা আর নেই—শেয়ার বিক্রী অসম্ভব। কিন্তু টাকা তার চাই, যোগাড় করতেই হবে টাকা। টাকা যোগাড় করাই মহীতোষের চরিত্র—চরিত্রের আসল চেহারা। গত ছ'বছর ধরে এ-ছাঁচেই তার চরিত্র ঢালাই হয়ে চলেছে। টাকা খরচ করতেও সে জানে কিন্তু সে-বিদ্যা তার টাকা যোগাড় করবারই মায়াজাল। আশ্চর্য্য, টাকার কথাই সে ভুলে যেতে বসেছিল। কিছুরই না কি তার দরকার নেই! বটে? মনটাকে মহীতোষ সুদাসের ব্যাঙ্কের ষ্ট্রংরুমের আশেপাশে ঘোরাতে সুরু করলে। একবার এনে সুদাসকে এই বিষচক্রে ফেলতে পারলে অনেকদিনের জন্যে মহীতোষ নিশ্চিন্ত। কিন্তু একবার এনে ফেলা চাই। বিয়ারের কুহক দুহাতে সরিয়ে দিয়ে স্নায়ুগুলো তার সতেজ, সতর্ক হয়ে উঠ্‌ল। মনোযোগী হয়ে উঠ্‌ল সুদাসকে ধরে আনবার জন্যে। প্রজাপতির মতোই চিন্তার উপর উড়ে এলো শ্যামলী। সুদাসের জন্যেই শ্যামলীকে চাই তার। শ্যামলীকে ভালোবাসার চেয়ে শ্যামলীর দরকার তার বেশি।

ব্রিষ্টলের অধ্যায় শেষ করেও দেখা গেল আকাশে অনেক রোদ। সহুরে শরতের ঝাঁঝাল আকাশ। কিন্তু তারচেয়েও ঝাঁঝাল মহীতোষের মুখের গন্ধ। অসম্ভব, শ্যামলীর খোঁজে এখন যাওয়া যায়না। আর যা-ই তাকে ভাবুক শ্যামলী এখনো হয়ত মাতাল ভাবতে পারেনি। শ্যামলীকে এই নূতন জ্ঞান দিয়ে কাজ নেই বরং সমূহ ক্ষতি। মফঃস্বলের মেয়ে এতটা সইতে পারবেনা।

এখনকার পক্ষে সবচেয়ে ভালো কাজ হবে মহীতোষের কোনো সিনেমা-ঘরে চুপ করে বসে থাকা। দ্বিতীয় একটা প্রস্তাব হতে পারে, নিউমার্কেটের ঝিকিমিকিতে খানিকক্ষণ ঘুরে বেড়ানো। ছুটোর একটাকে বেছে নিলেই চলবে। মহীতোষ পা চালাল। পা চালাতে কেমন যেন ভালোই লাগছিল তার—মনে হচ্ছিল এভাবে পা চালিয়ে অনায়াসে সে শ্যামলীর মামাবাড়িতে পৌঁছে যেতে পারে। কিন্তু তা শুধু মনে হওয়াই—মন তার গোড়ার সঙ্কল্প ভোলেনি—পা-কে নির্ভুলভাবে লাইট্হাউসের গলির বাঁক ধরিয়ে দিলে।

নাৎসী স্পাই-এর কীর্ত্তিকলাপ দেখানো হচ্ছে লাইট্হাউসে। যুদ্ধের মুখে এ ব্যাপার মন্দ লাগবেনা দেখতে। ধারণাটা মহীতোষের একার আবিষ্কার নয়—উৎসাহিত ভীড়ের দিকে তাকিয়ে বোঝা যায়। ভাঙা পৃথিবীকে আরো বেশি করে ভেঙে দিতে চাচ্ছে যে নাৎসীরা তারা দেখতে কেমন? নিরাপদে সে-কৌতূহল মেটাতে এসেছে বাংলাদেশের ছেলেরা। সমস্ত স্নায়ুতে নেশার রিম্‌ঝিমানি না থাক্‌লে মহীতোষ হয়ত ভীড়ের কৌতূহলের সঙ্গে নিজের কৌতূহল মিশিয়ে দিতে চাইতনা। কিন্তু এখন মহীতোষ মোটের উপর মানুষটাই অন্যরকম। তবু যতটা স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করা যায়—ব্যস্ত পায়ে ব্যাকুল চোখে 'কিউ'-তে গিয়ে দাঁড়ালনা মহীতোষ। ব্যাগটা চুপ্‌সে গেছে—তবু একটা উঁচু ধাপের টিকিট কেনা যায়।

ছবি সুরু হয়ে গেছে—মুখে একটা সিগারেটের জোনাকি নিয়ে অন্ধকারে চুপচাপ বসে থাকবার জন্যে টিকিট কিন্‌ল মহীতোষ।

অন্ধকার থেকে ভীড়ের চোখগুলো পর্দ্দার এক টুকরো আলোর দিকে উদগ্রীব হয়ে আছে—আধ্যাত্মিক জ্ঞানের দিব্য আলো দেখবার চেষ্টায় উনিশ শতকের বাঙ্গালীরা যেমন করত। মহীতোষের আশেপাশেও ঠাসাঠাসি দর্শক—এতোগুলো মানুষ কিন্তু ভীষণ চুপচাপ! বিরাট-বিরাট গীর্জ্জা, মঠ, মস্‌জিদ, মন্দিরে ঢুকে যাঁরা উপাসনা করে গেছেন তাঁদেরই উত্তরাধিকারী এরা। হাসিকে যদি ওড়ানো যায় সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে মহীতোষ তাহলে প্রচুর পরিমাণে হাসিই উড়িয়ে চলছিল।

অ্যাট্‌লান্টিক পাড়ি দিয়ে নাৎসীরা ইয়াঙ্কীদেশেও ঘোঁট পাকিয়ে তুলেছে। ডক্টর গোয়েব্‌ল্‌সের মাকড়শার হাত-পা হাজার হাজার যোজন জাল তৈরী করে চল্‌ছিল পৃথিবীতে এত চালাক মানুষ থাক্‌তে! ছবিটাতে কার বাহাদুরী দেখান হচ্ছে—নাৎসীদের না জি-ম্যানদের, ঠিক যেন বুঝতে পারছিলনা মহীতোষ। রুজ্‌ভেণ্টের নিউ-ডিলে মন্ত্রমুগ্ধ আমেরিকাতে প্রবেশের পথ পায় কি করে নাৎসীরা? নিউ-ডিল মন্ত্রের তাহলে তেমন কিছু শক্তি নেই! সংক্ষেপে একটু পলিটিক্স আওড়ে নিল মহীতোষ মনে মনে। কিন্তু তাতেও খুব বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠলনা তার মন। খুবই ক্লান্ত বোধ করছিল মহীতোষ—শরীরটা যেন ঘুমিয়ে পড়তে চায়।

ঘুমিয়ে হয়ত পড়েওছিল মহীতোষ—ইণ্টারভেলের আলোতে আবার মানুষের নড়াচড়ায় সচকিত হয়ে জেগে উঠ্‌ল। অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান ছুঁড়ি-বুড়ি ছাড়া ম্যাটিনিতে ছবি দেখতে এল কারা এতগুলো! বেকার বাঙালী? তার মতো সৌখীন মানুষ বেকারদের মধ্যেও আছে তাহলে। চারদিকে চোখ বুলিয়ে আন্‌তে লাগল মহীতোষ। কলেজ-পালানো ছেলেরা আছে—আর পূজোর বাজারের সওদা জোগাড় করতে এসেছে মফঃস্বলের যে কারবারীরা তারা, কালিঘাটে মাথা ঠুকিয়েই হয়ত লাইটহাউস। আর কেউ—মহীতোষের পরিচিত কেউ আছ না কি? শ্যামলী—হতে পারে

শ্যামলী এসেছে কারু সঙ্গে ; তার সঙ্গেই যে সবসময় আসবে তার কি মানে আছে ! শ্যামলীর মতো দেখা যাচ্ছেনা কাউকে— । শ্যামলী ছাড়াও অন্যকোনো মেয়ে ত থাক্‌তে পারে—মহীতোষের পূর্ব্বপরিচিতাদের কেউ। পাখীর ঠোঁটের মতো চোখ দিয়ে খুঁটতে সুরু করল মহীতোষ দর্শকের মুখগুলো। পরিচিতার কেউ নেই—শুধু পাওয়া গেল প্রবীরকে—কম্যুনিষ্ট প্রবীর পাশের একটি মেয়ের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে চলেছে। ফাণি ! মহীতোষ সীট্ থেকে লাফিয়ে উঠ্‌ল। মা নিষাদ করে দেওয়া যাক্—কাল কার্জ্জন-উদ্যানে তার শ্যামলীর বিশ্রম্ভালাপে যেমন বিঘ্ন ঘটিয়েছিল প্রবীর আর সুদাস।

"হ্যালো কম্যুনিষ্ট—"

প্রবীর ভয়ে বোকার মতো পেছন ফিরে তাকাল। কিন্তু তার দরকার ছিলনা—দেখা গেল মহীতোষ তার পাশেই এসে দাঁড়িয়েছে।

"কেমন লাগছে ?" মেয়েটিকে না প্রবীরকে কথাটা বল্‌ল মহীতোষ ঠিক বোঝা গেলনা। কিন্তু উত্তর দিল প্রবীরই : "ভালো না—"

"ভালোনা মানে ? নাৎসীদের কীর্ত্তিকলাপে তোদেরইত উৎসাহ থাকা স্বাভাবিক !" মুখের গন্ধটা মিইয়ে এসেছে মহীতোষের তাই নিজেকে গুছিয়ে তুলবার চেষ্টায় তার ত্রুটী ছিলনা, চোখে-মুখে কথা বলার ধরণে সুযোগ তৈরী করে রাখা তার অভ্যাস, এমনকি অপরিচিত মেয়েদের কাছেও।

"সে-উৎসাহ আছে—কিন্তু ছবির কাহিনীতে উৎসাহ নেই !" পাহারার মতো করেই প্রবীর স্থির চোখে মহীতোষের দিকে তাকিয়ে রইল।

"তাহলে আর হুটো সীট্ দখল করে বসে আছিস কেন—টিকিট না পেয়ে অনেকে ত ফিরেও গেল !"

কথা শুনে প্রবীরের হাস্‌বার ইচ্ছা ছিলনা, কিন্তু কানে তার

হাসির একটা সরু মোলায়েম শব্দ এলো বলেই হাস্‌তে হল তাকে—সুপ্রভা হেসে উঠেছে। এতক্ষণ যে সুপ্রভা কি করে চুপ ছিল নিজেই সে বলতে পারবেনা। সুযোগ না থাক্‌লেও ছেলেদের সঙ্গে কথা বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে সুপ্রভা। মহীতোষকে সাম্‌নে পেয়েও তার সঙ্গে কথা বলতে পারছেনা এর চেয়ে বিপন্ন অবস্থা সুপ্রভার জীবনে উপস্থিত হয়নি।

"আমি কিন্তু বলেছিলুম প্রবীরদা-কে," সুপ্রভার গলায় কলোচ্ছ্বাস শোনা গেলঃ "ভালো না হলে দরকার নেই ছবি দেখে!"

"বেশ!" প্রবীর অসহায় দেখালেঃ "নাৎসী স্পাইং সিষ্টেম দেখবার উৎসাহ বুঝি আমার ছিল!"

"নাৎসীদের বিরুদ্ধে এত কথা বল তুমি—আমার উৎসাহের দোষ কি!"

দরকারেরও বেশি শব্দ করে হেসে উঠ্‌ল মহীতোষ, পেছনের একটা বুড়ি মেমের বিরক্ত মুখ তাতে যেন অসম্ভব তিক্ত হয়ে উঠল। "ঠিক বলেছেন—" মহীতোষ উৎসাহিত গলায় বল্‌লে। মহীতোষ জানে মেয়েদের কাছে এগোতে হলে 'ঠিক বলেন নি' বল্‌তে নেই।

"আপনি যখন প্রবীরদার বন্ধু তাহলে ত নিশ্চয় জানেন কি ভীষণ কম্যুনিষ্ট ও—ওর সঙ্গে কথা বল্‌লে কম্যুনিষ্ট না হয়ে উপায় আছে?" সংস্কৃত-কাব্যের প্রণয়-কুপিতাদের দৃষ্টি প্রবীরেরই গায়ে বুলিয়ে আন্‌ল সুপ্রভা কিন্তু মহীতোষ বুঝতে পারছিল সে-ও এ দৃষ্টির নেহাৎ বাইরে পড়ে নেই। ভালোই লাগছিল মহীতোষের দাঁড়িয়ে থাকতে, এখন ছবি-সুরুর ঘণ্টা বাজ্‌লে যে খারাপ লাগবে তা-ও ভাবছিল সে মনে-মনে।

"পড়ার মাশুল দিচ্ছ বুঝি?" বহু-পরিশ্রমে শেখা সর্ব্বংসহা হাসি হাস্‌তে সুরু করলে প্রবীর।

"পড়ার মাশুল মানে?" প্রবীরের সঙ্গে সুপ্রভার সম্বন্ধটা

মনেমনে স্থির করে নিতে চাইল মহীতোষ: "প্রবীর আপনার প্রাইভেট টিউটর বুঝি?"

"টিউটর কিন্তু প্রাইভেট নয়। আমাদের সবাইকে পড়ান প্রবীরদা!"

"সবাইকে?" উৎসুক হয়ে উঠল মহীতোষ।

"আমাদের ইউনিয়নের সবাইকে!"

"সোভিয়েট ইউনিয়ন গড়ে ফেলেছেন আপনারা?"

"সোভিয়েট ইউনিয়ন?"—সুপ্রভা খিল্ খিল্ করে হেসে উঠল।

"ওদের নার্সেস্ ইউনিয়ন—" গম্ভীর গলায় বলল প্রবীর।

"ও—" সমস্ত উৎসাহ নিভে যাওয়া উচিত ছিল মহীতোষের—কিন্তু নিরুৎসাহ দেখালনা। সুপ্রভা তাকে নিরুৎসাহ করেনি। খুব অল্পদিন হল হয়ত এসেছে এ কাজে—শুনেছে প্রবীণা কারু মুখে, এ কাজে এলে মেয়েদের চট্‌পটে হওয়া দরকার—শুধু চলাফেরায় চট্‌পটে নয়, আলাপপরিচয়েও। শুধু মনটা মহীতোষের কেমন একটু খারাপ হয়ে গেল। ব্যবসায়ী বুদ্ধি থেকেই যদি মেয়েটি এতটা স্মার্ট হয়ে থাকে তাহলে ত মন খারাপ হবারই কথা। মহীতোষ এতক্ষণ ভেবে নিচ্ছিল সুপ্রভার স্বভাবই ওধরণের আর তাই মনে মনে প্রবীরকে বানর সাজিয়ে তার গলায় মুক্তোহারের কল্পনা করে দুঃখিতও হয়ে উঠছিল মাঝে-মাঝে। আবার শ্যামলীর কথা মনে পড়ল মহীতোষের। মনে পড়ল শ্যামলীর স্মার্টনেস্—রক্তে কোথায় যেন একটু আলোড়ন আনে সে-স্মার্টনেস্—সুপ্রভাও তেম্নি আলোড়ন তৈরী করে তুলছিল আর ঠিক তেম্নি সময় খবর পাওয়া গেল ও নার্স—পেশাদারী স্মার্টনেস্ ঝিমুনি এনে দিল রক্তে।

মরিয়া হয়ে মনের সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিল মহীতোষ। এমন কি অপাপবিদ্ধ শ্যামলীর স্মার্টনেস? মহীতোষের সঙ্গে স্বার্থের সম্বন্ধ আছে বলেই ত শ্যামলী গায়ে পড়ে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠ্‌তে চেয়েছে!

যেখানে শ্যামলীর স্বার্থ নেই—স্বার্থ বলতে অবিশ্যি বিত্তের আর চিত্তের প্রয়োজনের যে কোনো একটাই হতে পারে—সেখানে নিশ্চয়ই সে ফ্রিজিড্, বাঙ্গালীর অনূঢ়া সৎ মেয়েদের মতো লজ্জাবতী লতা! তবে ততটুকু সৎসাহস শ্যামলীর আছে প্রয়োজনের তাগিদকে সে অস্বীকার করেনা, লজ্জাবতী লতারা যা অস্বীকার করে' হিষ্টিরিয়া, হার্টডিজিজ, না হয় দারিদ্র্য-বিলাসে ভোগে। সেদিক থেকে দেখতে ত সুপ্রভা আরো সৎসাহসী। ককেট্রিতে তুমুল হয়ে উঠতে একটুও সঙ্কোচ নেই এর।

অন্যমনস্ক হয়ে একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে হঠাৎ থেমে গেল মহীতোষ। সবিনয় দৃষ্টিতে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল সুপ্রভাকে: "খেতে পারি?"

"ও নিশ্চয়—" প্রায় লাফিয়েই উঠল সুপ্রভা। তারপর নাক দিয়ে ফোঁস করে একটু হেসে খুসী-খুসী চোখে তাকিয়ে রইল মহীতোষের দিকে।

হঠাৎ প্রবীরের খেয়াল হল অনেকক্ষণ ধরে বেমানানভাবে চুপ করে আছে সে। "তোর কেমন লাগ্ছে ছবিটা বল্লিনে—" সুপ্রভার দৃষ্টি আগলে মাথা উঁচু করে তাকাল প্রবীর।

"ছবির মতোই। দেখে সময় কাটান যায়।"

"রাস্তায় দাঁড়িয়েও সময় কাটান যায়—তাতে বরং লাভ আছে, পয়সা লাগেনা।"

"পয়সা না লাগলে কি লাভটা টের পাওয়া যায়? কি বলেন—?" সুমিত, সুন্দর হাসিতে রহস্যময় হয়ে উঠতে চাইল মহীতোষ। কিন্তু আলো নিভতে সুরু করেছে—ছবি সুরু হবে। নিজের জায়গায় ফিরে যাবার উদ্যোগ করে মহীতোষ বললে: "আপনার নামটা ও জানা হলনা—"

"সুপ্রভা।"

অন্ধকারে দেখতে পাওয়া গেলনা—নাম বলবার সময় কেমন

দেখাচ্ছিল সুপ্রভার মুখ! মুখের সম্ভাব্য রেখাগুলোর ছবি আঁকতে আঁকতে মহীতোষ নিজের সীটে ফিরে এল।

তারপর যে ছবিতে কি ছিল মহীতোষ বলতে পারবেনা। সুপ্রভাও ছবিটা আর বুঝল কিনা কে বলবে। ছবির শেষে ছবিটা বোঝাবার অজুহাতে প্রবীর সুপ্রভার কানে নাৎসী-অভ্যুদয়ের ইতিহাস উজোর করে ঢেলে দিয়ে অত্যন্ত ক্ষিপ্রতায় পা চালিয়ে দিলে! অন্যমনস্ক থাকবার বা থেমে থেমে চলবার উপায় ছিলনা সুপ্রভার। এমনকি ভাববারও ফুরসৎ পেলেনা সে, কেন প্রবীর তাকে তুফানের বেগে উড়িয়ে নিয়ে চলেছে।

যথেষ্ট তাড়াতাড়ি করে হল থেকে বেরিয়ে এসেও মহীতোষ ওদের খুঁজে পেলনা। সামনের আর পেছনের ভিড়ের উপর চোখ চালিয়ে সুপ্রভাকে আবিষ্কার করবার চেষ্টা করলে সে খানিকক্ষণ। হাওয়ায় মিশে গেল না কি ওরা? নামটা বলেও কি ভাবতে পারলনা সুপ্রভা যে শো-র শেষে মহীতোষ ওর সঙ্গে দেখা করবে? মেয়েটা বোকা, না কি বিশুদ্ধ স্মার্ট? লীণ্ডসে ষ্ট্রীট্ ধরে চৌরঙ্গীর দিকে হাঁটতে সুরু করলে মহীতোষ। হতে পারে ব্যাপারটা প্রবীরেরই কারসাজি—সে ত মহীতোষকে চেনে!

কোথায় যেতে পারে শ্যামলী—মামীমার নড়বড়ে তক্তপোষের উপর বসে সে কথাই ভাব্‌ছিল মহীতোষ। মামীমা অনর্গল বকে চলেছেন, নিজের দুরবস্থার বিস্তৃত ফিরিস্তি, মাঝে মাঝে শ্যামলীর প্রশংসা,—মুখ ভঙ্গীতে যা নিন্দার চেয়েও গর্হিত মনে হয়। হাসি-অশ্রুর একটা কুশলী কসরৎ দেখিয়ে চলেছিলেন মামীমা। তার উপর প্রত্যেকটি দম নেবার সঙ্গে একবার করে বিগলিত হয়ে মহীতোষের স্তুতি। মনোযোগ দিয়ে মামীমার কথা শুন্‌লে কারো ধৈর্য্য থাকবার কথা নয়—মহীতোষও তাহলে এতক্ষণ রাস্তাকেই নিরাপদ আশ্রয় মনে করে ধৈর্য্যহীনতার পরিচয় দিয়ে বস্‌ত।

শ্যামলীর গতিবিধি নিয়েই ব্যস্ত ছিল মহীতোষ তবু কানের দুয়োর একেবারে বন্ধ রাখা যায়না আর তাই মামীমার দুএকটা কথার অন্যমনস্ক জবাব তাকে দিতে হচ্ছিল। তা-ই অবশ্যি মামীমার কথা বলবার পক্ষে যথেষ্ট।

মামীমার অনেকগুলো ছেলেপিলের মধ্যে যেটা হাঁটতে পারেনা ওটাই তার বুকে ঝুলে আছে—আর কেউ বাড়ি নেই—টলে টলে হাঁটতে শিখেছে যে. সে-ও বাড়ির বাইরে বাইরেই থাকে, যতক্ষণ থাকা যায়। সেখানেই ভালো থাকে তারা। বাচ্চাটা মামীমার স্তনের বোঁটায় ঝুলে আছে, ব্যবহৃত পুরোণো অলঙ্কারের মতোই তার গুরুত্ব গায়ে লাগেনা, এমন কি ব্যাপারটাতে সম্ভ্রমেরও যেন প্রশ্ন নেই। অবলীলায় মামীমা এই দৃশ্য রচনা করে মহীতোষের সঙ্গে কথা বলে চলেছেন।

"আমিও বলি বাবা, পড়াশুনোয় মেয়েটার মাথা আছে—গরীবের ঘরে কম ভাগ্যির কথা নয়। তা মাথা আছে বলেই কি বই নিয়ে বস্‌তে নেই—? আজ হোক, কাল হোক তুমি ত, বাবা, ওকে কলেজে ভর্ত্তি করে দিচ্ছই—যদ্দিন তা না হচ্ছে বাড়িতেই দু-একঘণ্টা বই নিয়ে বস্‌তে কি! না হয় গ্যাদা ভাইবোনগুলোর পড়াটাই একটু দেখিয়ে দে—এক মিনিট যদি বই নিয়ে বসে ওরা, কেউ দেখাবার নেই, বলবার নেই, তাই আছে শুধু হৈ-হুল্লোড় মাথা কামড়াকাম্‌ড়ি নিয়ে—" শ্বাস নেবার দরকার ছিল বলে মামীমার কথার স্রোত একটু থম্‌কে দাঁড়াল।

"বিটিতে সীট্‌ আছে—খোঁজ নিয়েছিল কি ও?" বিশুদ্ধ অভিভাবকের গলায় জিজ্ঞেস করল মহীতোষ।

"কে বল্‌বে বাবা! মুখ্যু মানুষ আমি—আমায় কি বলে কোন কথা? আমি আছি দুবেলা শুধু ভাত দেবার জন্যে। মামার সঙ্গেও টুঁ শব্দটি নেই, হাঁড়িমুখ করে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। তবু বেহায়ার মতো এটা-ওটা জিজ্ঞেস করেন উনি—দশ কথা জিজ্ঞেস করলে হয়ত

একটার উত্তর মেলে! বুঝ্‌লে বাবা, অভিমান—মামার উপর অভিমান করে আছে, কেন উনি পড়ার খরচ দেবেন না। সামর্থ্য থাক্‌লে কি উনি না বল্‌তেন, বাবা? বলে নিজের কাচ্চাবাচ্চাগুলোর মুখেই দুবেলা দুমুঠো ভাত ছাড়া একটা ভালোমন্দ কিছু দিতে পারেন না, সে-লোক ভাগ্নীর কলেজের মাইনে জোটাবেন কোত্থেকে, বল! নইলে, ছেলেদের মতো তুই পাশ দিতে পেরেছিস্‌, তোকে পড়াতে পারা ত আমাদের কতো আহ্লাদ!" এবার মামীমা থামলেন কোলের বাচ্চাটাকে একটা ভেংচি দেবার জন্যে। স্তনের শুষ্কতায় অনেকক্ষণ ধরেই উস্‌খুস্‌ করে ও প্রতিবাদ জানাচ্ছিল।

"পড়ার খরচ ওকে আমি দোব ত বলেছিলুম—" পরহিতব্রতীর উদার দৃষ্টি নিয়ে মহীতোষ মামীমার দিকে তাকালে।

"তাই না কি? হুঁঃ—ও কি বলে সে-কথা আমাদের? না বল্‌লেও কি আমরা বুঝিনে বাবা, তোমার ভর্সা না পেলে মামা-মামীর ভর্সায় ও কল্‌কাতা আসেনি। আজকালকার দিনে এত বড় ভর্সা কে দেয় বল,—পড়ার চাড়ই নেই—কল্‌কাতা এসে বাবা, ওর ধরণধারণই কেমন হয়ে উঠ্‌ছে! ব্যাটা ছেলে ত নয়, আমি ভয়ে মরি!" ভয়টা যে মহীতোষকে দিয়েই সবচেয়ে বেশি, আরো খানিকক্ষণ কথা বল্‌তে পার্‌লে মামীমা তা সূক্ষ্ম কৌশলে বুঝিয়ে দিতে পারতেন কিন্তু মামীমাকে ততক্ষণ সুযোগ দিতে রাজী হলনা মহীতোষ। বসে থেকে লাভ নেই—মহীতোষ উঠে পড়ল: "আজ চলি। শ্যামলীকে বল্‌বেন আমার সঙ্গে দেখা করতে।"

"এখুনি চল্‌লে! চা-ও খেলেনা আজ!"

"নাঃ –" হাসির একটু ভূমিকামাত্র দেখা গেল মহীতোষের ঠোঁটে। তাতেই রোগা দেহেও মামীমাকে বিজয়িনীর মতোই দেখালে—সূঁচ ফুটাবার চেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হয়নি, নইলে অপরাধীর মতো হাস্‌বে কেন মহীতোষ?

মামীমার কবল থেকে মুক্ত হয়ে এখন যে মহীতোষের বুক ভরে

নিশ্বাস নেওয়া উচিত এই সাধারণ স্বাভাবিক কথাটাও তার মনে ছিল না। অনবরতই সে ভেবে চল্‌ছিল—কোথায় যেতে পারে শ্যামলী? কোথায় যে যেতে পারে তার সূত্র বার করা হয়ত খুব অসম্ভব ছিলনা যদি মন তার সত্যি-সত্যি এ প্রশ্নটাকেই নাড়াচাড়া করতে থাকত। কিন্তু সে হয়ত ভাব্‌ছিল, কেন শ্যামলীর সঙ্গে দেখা হল না তার! এই 'কেন'-র প্রতিক্রিয়ায় অভিমান করবার সাহসও আজ তার ছিলনা, কেমন যেন একটু বিষণ্ণ হয়ে পড়ছিল মনে মনে। ভালোবাসার দাবী না থাক্‌লে অভিমান দাঁড়ায় কি করে? আজ সমস্তদিন শ্যামলীকে যেরকম নির্দ্দয়ভাবে সে ব্যবহার করেছে, তার একমাত্র নাম হতে পারে প্রেমহীনতা। প্রেমহীনতার কাছে অভিমানের প্রশ্রয় নেই।

কিন্তু সত্যি কি শ্যামলীর জন্য একটুও ভালোবাসা নেই মহীতোষের মনে? তাহলে কেন সে এসেছিল শ্যামলীর খোঁজে? না এসে থাক্‌তে পারলনা কেন? সুদাসের জন্যে শ্যামলীকে তার দরকার—কথাটাকে যেন স্মরণ করে নিতে হল মহীতোষের। ভুলেই গিয়েছিল সে সুদাসের জন্যে যে শ্যামলীকে তার দরকার। দরকার ছিল যেন তার নিজেরই মনের তারপর মামীমার কথাগুলোতে মনের উপর আরো নিবিড় হয়ে এসেছে শ্যামলীর ছায়া, শ্যামলী সম্বন্ধে নিজেকে একটু রোমান্টিকই ভেবে নিতে পেরেছে মহীতোষ। এতক্ষণ মামীমার চোখের উপর যে-চেহারা নিয়ে সে বসে ছিল, তা কি অভিভাবকের চেহারা?—প্রেমিকের চেহারা নয়? ফাঁকি দিতে পেরেছে কি সে মামীমার চোখকে? মামীমার মতো যাদের জীবন সেকেলে, আটপৌরে, তাঁরা প্রেমের গন্ধই শুঁকে বেড়ান, আর অদ্ভুত তাঁদের ঘ্রাণশক্তি; কোনো মেয়েকে তুমি ভালো বাসছ কি না তোমার মন জানবার আগে তাঁরা তা টের পান।

ফিরে যেতে ইচ্ছা করল মহীতোষের মামীমার কাছে—শ্যামলীর প্রসঙ্গটা মন্দ লাগেনা—বেশ একটা নেশা ধরায় মনে। কিন্তু সে-

নেশার চেয়েও প্রত্যক্ষ বড় দুর্ঘটনা যে শ্যামলী বাড়ি নেই। থেমে গিয়েছিল মহীতোষ, আবার হাঁটতে সুরু করে। এবার সে সত্যি-সত্যি ভাব্‌তে সুরু করল, কোথায় গেল শ্যামলী!

শ্যামলী তখন হাজরা রোডে, সুদাসের টেবিলের সবগুলো বই এক-এক করে নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে শেষ করে এনেছে। দুমিনিট পর পরই সীধু তাকে আশ্বাস দিচ্ছিল, দাদাবাবু চোখের পলকে এসে পড়লেন বলে। আশ্বাসের দরকার ছিলনা, সুদাসের ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিতই যখন হয়েছে শ্যামলী তখন আর সুদাসের সঙ্গে দেখা না করে সে ফিরে যাবে না। রাত্রি যদি দশটা বেজে যায় তা হলেও অপেক্ষা করবে সে। বাড়ি ফিরে গেলে মামীমা নতুন কিছু ভাষা ত আর বল্‌তে পারবেন না। যতটা ভাষা তিনি জানেন আর তা যত বিশ্রী করে বলা যায় সবই ত একবার না একবার শ্যামলীর উপর পরীক্ষিত হয়ে গেছে, কাজেই শ্যামলীর ভাবনার কিছু নেই! ভাবনা ছিল বরং তার সুদাসকে নিয়ে। কালকের সামান্য একটু আলাপের সূত্র ধরে ভদ্রলোকের ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হয়েছে সে—ভদ্রলোক যদি সত্যিকারের ভদ্রলোক না হ'ন তাহলে বিপদের আর অন্ত নেই। যতটা কঠোর দেখিয়েছে কাল সুদাস, হয়ত সত্যি-সত্যি সে ততটা কঠোর নয়। নইলে সে-কঠোরতা এতটা আকর্ষণ করবে কেন শ্যামলীকে!

বইগুলো থেকে লোকটাকে আন্দাজ করতে চাইল এবার শ্যামলী। কিন্তু সে কাজ আরো দুরূহ। ইণ্টারন্যাশন্যাল পলিটিক্সের বই থেকে সুরু করে ডিটেক্‌টিভ গল্প, এমন কি আধুনিক বাংলা কবিতার বই পর্য্যন্ত আছে। শরৎবাবুর কোনো উপন্যাস নেই—শ্যামলী হতাশ হ'ল, হয়ত সেন্টিমেণ্টাল নন সুদাসবাবু, নিরেট কঠোরতাই তাঁর মনের ভূষণ।

সিঁড়িতে জুতোর আওয়াজ। শ্যামলীর চোখদুটো সচকিত হয়ে

উঠ্‌ল অনিশ্চিত মুহূর্ত্ত আসন্ন হলে চোখ যেমন হয়। বেশবাস তার শ্লথ বা শিথিল নয়, তবু বুকের উপর শাড়ীর পাড়টা টেনে দিল আরেকটু, হাঁটুর কাছে শাড়ীটাতে একটা চিম্‌টির টান পড়্‌ল যাতে ওটা নেমে যায় গোড়ালির উপর!

সুদাস বরাবর তার মার ঘরে গিয়েই ঢুক্‌ত, তার অভ্যস্ত পা ওদিকেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল তাকে, কিন্তু নিজের ঘরে তার আলো জ্বল্‌ছে—কৌতূহলের ধাক্কায় অভ্যাসটা ভেঙে গেল। তবে সে-কৌতূহলও শ্যামলীকে আশা করেনি—প্রবীর বা আর কেউ হবে বলেই সুদাস ভেবে নিয়েছিল।

সোজা দাঁড়িয়ে হাত তুলে নমস্কার করলে শ্যামলী—নমস্কারের অতি স্মার্ট ভঙ্গীতে মনে হচ্ছিল শ্যামলীর স্নায়ুগুলো বুঝি আর স্বাভাবিক অবস্থায় নেই।

"আপনি!" কথাটা যা-ই হোক, সুদাসের হাসিতে প্রচুর অভ্যর্থনা ছিল।

"বলেছিলুম কি না আস্‌বো? সত্যি-সত্যি এসে যে উপস্থিত হ'ব নিশ্চয়ই আপনি তা ভাব্‌তে পারেন নি।"

"আপনি যখন এলেন—নিশ্চয় তা ভাব্‌তে পারছি!" সশব্দে হেসে উঠ্‌ল সুদাস, সশব্দে হেসে উঠ্‌তে হ'ল নিজের কাছে নিজেকে নির্দ্দোষ প্রমাণিত করবার জন্যে। সঙ্গে সঙ্গে শ্যামলীও হাস্‌ল।

"পাঁচ মিনিট—" পাঞ্জা তুলে সুদাস অনুনয়ের সুরে বল্‌লে: "অপিসের এই মুখোসটা বদ্‌লে আসি—ততক্ষণ এক কাপ চা খান—সীধু—"

"আপনি ব্যস্ত হবেন না—সীধু আমাকে চা খাওয়াতে বাকি রাখেনি।"

"ও, তাহলে অনেকক্ষণ হ'ল এসেছেন—আমার আজ দেরী হয়ে গেল—"

"মনে মনে ভাবছিলুম দেরী বোধ হয় আপনি ইচ্ছা করেই করছেন, হয়ত ভেবেছেন আমি আজ আস্‌ব।"

"কিন্তু আপনিই ত বললেন এসে যে উপস্থিত হবেন নিশ্চয়ই আমি তা ভাব্‌তে পারিনি!"

এবার শ্যামলীই হেসে উঠ্‌ল আগে, তারপর সুদাস। তারপর হাসি থামিয়ে হঠাৎ বল্‌লে শ্যামলী: "মুখোসটা ছেড়ে স্বাভাবিক হয়ে আসুন!"

"স্বাভাবিক মনে হচ্ছেনা, না?" মার ঘরের দিকে যেতে যেতে বল্‌লে সুদাস। শ্যামলী উত্তর দিলনা—হাস্‌বার একটু চেষ্টা দেখালে, যার মানে অনেক কিছুই হতে পারে।

দেখা হওয়ার দৃশ্যটা ভালো ভাবেই অভিনীত হয়ে গেল—এখন পরেকার দৃশ্যের জন্যে শ্যামলী তৈরী হচ্ছিল। সুদাসবাবু ভদ্রলোক, শ্যামলী কেন এসেছে এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই জিজ্ঞেস করবেন না। তবু নিজের কাছে ত শ্যামলীর একটা কৈফিয়ৎ আছে! কেন এসেছে সে? আস্‌বার কথা কাল সুদাসকে কেন সে যেচে বল্‌তে গিয়েছিল? এই 'কেন'-র উত্তর নিজেকে সে দিতে পারে কিন্তু বাইরে তা বলে বেড়ান যায় না। কিন্তু কালকের মত মেজাজ নিয়ে সুদাস যদি আসবার কারণটা দৈবাৎ জিজ্ঞাসা করেই বসে, একটা কিছু তাকে আবিষ্কার করে বল্‌তে হবে! নিজের অসহায় অবস্থার কথাটা বলা যায় কি? প্রার্থী হিসেবে দাঁড়াবার সাহস শ্যামলীর ছিল—কিন্তু সে সাহসটাকে আহত করে দিয়েছে মহীতোষ। মহীতোষের কাছে ত অসঙ্কোচেই সে প্রার্থীর মত দাঁড়িয়েছিল, ভিখিরিকে যতটা নিঃস্বার্থভাবে মানুষ পয়সা ছুঁড়ে দেয় ঠিক তেম্নি শ্যামলীকে কয়েকটা টাকা ছুঁড়ে দেবার মতো টাকা মহীতোষের ছিল কিন্তু মহীতোষ অনর্থক টাকাটা হাতছাড়া করতে চায় না, মহীতোষের কাছ থেকে শ্যামলীকে টাকাটা কিনে নিতে হবে, ভিক্ষার মতো তা পাওয়া যাবে না। হয়ত সুদাসবাবু মহীতোষ নন, তবু থাক্।

দুহাতে গেঞ্জি টান্‌তে টান্‌তে সুদাস ঘরে ঢুকে একটা চেয়ারে আশ্রয় নিলে। মুখটা তার কেমন একটু গম্ভীর আর অসহায় দেখাচ্ছিল। কালকের সেই উগ্রতা আর নেই। শ্যামলীর ঠোঁটের হাসি মিলিয়ে গেল—আশঙ্কায় নয়, সহানুভূতিতে।

"আপনাকে অনেকক্ষণ একা-একা বসিয়ে রেখে কষ্ট দিলুম!" অদ্ভুত নরম শোনাল সুদাসের গলা।

"আপনি ত আমাকে বসিয়ে রাখেন নি—ডেকে যখন আনেননি বসিয়ে রাখবার অনুযোগ কোন্ মুখে করব?" অদ্ভুত নরম দেখালো শ্যামলীরও মুখ।

"অবশ্যি কয়েকদিন আগে এলে মার কাছেই বস্‌তে পেতেন।"

"মা?"

"আমার মা। পর্শু মারা গেছেন!"

"এখেনে?"

"হুঁ"—অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছিল সুদাস, তাড়াতাড়ি তাই সে নিজেকে শ্যামলীর মুখোমুখি করে তুল্‌লেঃ "অবশ্যি আপনাকে দেখলে মা অবাক হয়ে অনেক অদ্ভুত কথা ভাবতেন!" হেসে উঠল সুদাস, নির্জ্জন ধ্বংসাবশেষের উপর দাঁড়িয়ে কেউ যেন হেসে উঠ্‌ল।

মনে হচ্ছিল, শ্যামলী এখুনি কেঁদে ফেল্‌বে। কিন্তু ও কাঁদ্‌লনা। কথাগুলোও কান্নার মতো শোনালনাঃ "অদ্ভুত মানুষ ত আপনি।"

"অদ্ভুত? কেন?" ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞেস করল সুদাস—তার মার অনেক কথার উপর যেমন সে করত!

"মনে হচ্ছে। কেন তা বল্‌তে পারব না।" এতক্ষণে যেন ভারি হয়ে উঠল শ্যামলীর গলা।

"ও"—সুদাসের গলায় বিদ্যুতের মতো একটু বিদ্রূপ খেলে গেলঃ "কি জানেন, অশৌচের আইনকানুনগুলো আমার কাছে হাস্যকরই মনে হয়।"

"আমার কাছেও।"

ঠোঁটে একটু বাঁকা হাসি নিয়ে বল্‌লে সুদাস: "তারপরও আমাকে অদ্ভুত মনে হচ্ছে?"

"হাঁ।"

"কেন?"

"জীবনের অনেক ঘটনায় মা হয়ত ছেলের শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলেন, কিন্তু তিনি মরে গেলে ছেলের মনের অশ্রদ্ধারও মৃত্যু হওয়া উচিত।" সুদাসের মুখোমুখি তাকাতে পারছিলনা শ্যামলী।

সুদাস ভাবছিল হাসি ছাড়া শ্যামলীকে আর কি বা উত্তর দেওয়া যায়! শ্যামলী বাইরের দিকেই চেয়ে আছে, সুদাস একটা কিছু কথা না বল্‌লে হয়ত মুখ ফেরাবেনা।

"বাবা মারা যাবার পর গত তিনবছর মা আমার কাছেই ছিলেন, আমার হাতে থেকে ছাড়া আর কারো হাতে খেতেন না।" সাংবাদিকের ভঙ্গীতে বল্‌তে চেষ্টা করলে সুদাস।

"মার সঙ্গে লেনদেন তাতেই কি চুকে গেল?" সুদাসের কথা শুনেও মুখ ফেরাতে ইচ্ছা করলনা শ্যামলীর।

"না।"

"কিন্তু আপনি ত চুকিয়ে ফেলেছেন মনে হচ্ছে!"

"আপনাদের কি মনে হয় না-হয় তা দিয়ে আমার কি হবে বলুন? আমার নিজের মনে না হলেইত হল!" সুদাসকে বিনীত দেখাচ্ছিল আর তাই তার কথাগুলো আরো শক্ত হয়ে বিঁধ্‌ল শ্যামলীকে। তাতে রাগ করতে পারত শ্যামলী কিন্তু সুদাসের অসহায় চেহারাটার উপর রাগ করা যায়না। কান পেতে সে শুনেই নিল সুদাসের কথা। ভাব্‌ছিল কথার পিঠে জবাব দেবার দরকার নেই। কথার পিঠে জবাব না পেয়ে সুদাস যেন ম্লান হয়ে উঠ্‌ল। কথাটা বল্‌বার আগে এক মুহূর্তের জন্যেও সে ভাবেনি শ্যামলীকে আঘাত দেবে—কিন্তু কথাটা কেমন আঘাত নিয়েই বেরিয়ে এল তার মন

থেকে! তাতে আর কিছু নয়, এই শুধু প্রমাণ হচ্ছে যে মেয়েদের সঙ্গে সে কথা বল্‌তে জানেনা। বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে অভ্যাস করলে তা-ই হয়; সবসময়ই নিজেকে ভাবতে হয় আক্রান্ত, তাই আক্রমণাত্মক কথা ছাড়া মুখ থেকে বেরোয় না। বিশ্রী বাঁকা একটা মেজাজ দাঁড়িয়ে গেছে— অনুতপ্ত হয়ে নিজের সমালোচনা সুরু করল সুদাস।

"কাল আপনাকে যেমন দেখেছিলুম দেখছি আসলেও আপনি তা-ই।" শ্যামলী হাসিতে সুন্দর-মত একটা সঙ্কোচ ফুটিয়ে তুল্‌ল।

"কেমন দেখেছিলেন? সুদাস জোরে জোরে হাসতে লাগল।"

"একটু আগে যেমন দেখেছি!"

"সেটা কি রকম?"

"নিজেকে কি নিজে আপনি জানেন না?"

"নিশ্চয় জানি।"

"ঠিক সে-রকমই দেখছি আপনাকে।"

"সে-রকমটা কোন্ রকম?"

"নিজের উপর আপনার অগাধ শ্রদ্ধা!"

"ও—" হঠাৎ যেন সুদাস নিভে গেল। এবার অনুতপ্ত হয়ে উঠ্‌ল শ্যামলী। কথার পিঠে কথা বল্‌তে গিয়েই এই ভুল করে বসল সে। সুদাসকে আঘাত দিতে সে চায়নি—অনেকদূর অবধি কথাগুলো তাই হাল্কা রাখতে চেষ্টা করেছে কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পারলনা। মার সঙ্গে যুদ্ধ করে কলকাতায় আস্‌তে হলে, মামীমার সঙ্গে যুদ্ধ করে তাঁর বাড়িতে থাক্‌তে হলে আর নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে মহীতোষের সঙ্গে চল্‌তে হলে মেজাজটা তার অস্বাভাবিক হয়ে উঠ্‌বেইত! কিছুতেই নরম করে আনতে পারেনা সে নিজেকে। নরম হওয়ায় তার বিপদ ছিল। তাই শক্ত হতে গেলে যেখানে বিপদ সেখানেও শক্ত হবার অভ্যাস এসে উঁকি দেয়।

একটা লম্বা ঝিমুনির পর সুদাস মুখটাকে অস্বাভাবিক উজ্জ্বল

করে নিয়ে বল্‌লে: "শ্রদ্ধার প্রসঙ্গ নিয়ে মারপিট করতেই কি মানুষ পরিচিত মানুষের বাড়ি আসে?"

শ্যামলী ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল।

"ভাত খেতে ত বল্‌তে পারিনে—চা-ই আনতে বলি আবার, কি বলেন?" আবারও বল্‌লে সুদাস।

"পরিচিত মানুষকে কিছু না খাওয়ালেও চলে। পরিচিত বলে যে চিন্‌তে পেরেছেন তার জন্যেই অনেক ধন্যবাদ!"

"চিন্‌তে পেরেছি বলেই চা খেতে বল্‌ছি।"

"চা না খেলেও চিন্‌তে পারবেন।" শ্যামলী উঠে দাঁড়াল। খুবই হঠাৎ। আবহাওয়াটাকে এলোমেলো করে দিয়ে বল্‌লে: "রাত হয়ে গেল—আজ যাই।"

সিঁড়িতে শ্যামলীর জুতোর শব্দগুলো গুণে চল্‌ল সুদাস এক-দুই করে। শ্যামলীর উঠে দাঁড়ান থেকে চলে যাওয়া পর্য্যন্ত দৃশ্যটাকে যেন কিছুতেই সে আয়ত্ত করতে পারছিলনা। শ্যামলীর শেষ কথাগুলোর অর্থও কেমন যেন কুয়াশার মতো অপরিচ্ছন্ন হয়ে তার মগজে ঘুরতে সুরু করল।

তিন

হিতাকাঙ্ক্ষীদের এড়িয়ে চলার মতোই শরৎ গুপ্তকে এড়িয়ে চল্‌ত সুদাস। হিতোপদেশের ভয়ে নয়—নিজের কীর্ত্তিকলাপের ব্যাখ্যানে ভদ্রলোকের কাণ্ডজ্ঞান নেই বলে। নেহাৎই শরৎবাবু বয়সে প্রবীণ, আর তার ব্যাঙ্কের একজন ডিরেক্টর তাই মুখ বুঁজে সুদাস মাঝে-মাঝে ধৈর্য্যের পরীক্ষা দিতে আসে। মহীতোষের জন্যে এ পরীক্ষায় আস্‌তে হল সুদাসকে। কিন্তু ঠিক মহীতোষের জন্যেই কি—শরৎবাবুর বাড়ির বারান্দায় উঠ্‌তে উঠ্‌তে একবার ভেবে নিল

সুদাস—একটা বিরাট লাভের লোভ কি তার মনে বাসা বাঁধেনি? নিশ্চয়ই বেঁধেছে। মন যখন তার ব্যবসার চিন্তা করে মুনফার অলিগলি ছাড়া আর কোনো কথা সেখানে ঠাঁই পায়না—মহীতোষ, বন্ধুতা, ভদ্রতা, শালীনতা সেখানে অপরিচিত। এমন কি, শ্যামলীও হয়ত সেখানে দাঁড়াতে পারবেনা। কাল সমস্ত রাত্রি যতক্ষণ না তার ঘুম এসেছে পরীক্ষায় আর পর্য্যবেক্ষণে সুদাস তোলপাড় করে চলেছে শ্যামলীর কথাগুলো—বৈজ্ঞানিকের নীরস, কঠোর পরীক্ষা নয়, যাতে আবেগ ঘন হয়ে ওঠে তেমনি বিশ্লেষণ। একবারও মার কথা মনে হয়নি তার, যা ছিল স্বাভাবিক। সম্পূর্ণ মনোযোগ দিতে হয়েছে শ্যামলীর উপর। কিন্তু সে-শ্যামলীও ভোরে ঘুম ভাঙ্গার সঙ্গে সঙ্গে সুদাসের মন থেকে মুছে গেছে। তখন একটা দিনের সুরু—সাম্‌নে পড়ে আছে ব্যাঙ্কে যাওয়া, ব্যাঙ্ককে বাঁচানো-ফুলানো-ফাঁপানো, ব্যাঙ্কের শেষে শরৎবাবুর বাড়ি। এই জীবনে শ্যামলী এসে উঁকি দিতে পারেনা, উঁকি দেয়ওনি।

সুদাসকে দেখেই শরৎবাবু দৈনিকপত্রিকার বারকয়েক পড়া এসেমব্লির কাহিনী ছেড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠ্‌লেন: "এসো এসো সুদাস—তোমার যে দেখাই নেই!"

মনে অপরিসীম আতঙ্ক নিয়েও সুদাস হাসি-মুখেই এগিয়ে গেল। সুদাসের এগুনো থেকে চেয়ারে বসা পর্য্যন্ত সমস্ত গতিবিধিটার উপর মোলায়েম চোখ বুলিয়ে নিয়ে শরৎবাবু বল্‌লেন: "তারপর খবর কি বল!"

"একটা জরুরী কাজে—" সুদাস এইটুকুমাত্রই বল্‌তে পারল। শরৎবাবু তাকে কথাটাও শেষ করতে দিলেন না: "যাহোক তবুত এসেছ! তোমার ওখানে যাব-যাব করে কিছুতেই আর যাওয়া হচ্ছেনা। সারাটা দিন কাটে এসেমব্লির হৈ-হাঙ্গামায়। সেশন না থাক্‌লেও বিশ্রাম করব সে উপায় নেই। তবু যাহোক ভাবি, দিনগুলোত আর অপচয়ে যাচ্ছেনা—দেশের কথা চিন্তা করেই দিন

কাট্‌ছে !” একটু থেমে নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন শরৎবাবু— বাল্‌বের আলোতে কানের পাশের রূপোলি চুলগুলো চক্‌চক্‌ করে উঠ্‌ল আর তার সঙ্গেই মানিয়ে মুখের মসৃণতাটাও যেন ফুটে উঠ্‌ল হঠাৎ। এই সুযোগে কেশে গলাটাকে দুরস্ত করে সুদাস কিছু বলবার জন্যে তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নিতে চাইল। কিন্তু দেখা গেল শরৎবাবু তার চেয়েও ক্ষিপ্র। এই পাঁচ সেকেণ্ডের বিরাম একটা দীর্ঘ বক্তৃতার ভূমিকামাত্র।

“বর্ম্মায় যখন স্কুল মাষ্টারি করি সেই ননকোঅপারেশনের যুগে—” সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে সুরু করলেন শরৎবাবুঃ “টোঁ টোঁ করে ঘুরে লোক ক্ষেপিয়ে বেড়িয়েছি—ভাবতুম তা-ই দেশের কাজ! স্কুল ছাড়লুম—দেশে ফিরে এসেও কি অবসর ছিল যদ্দিনে না জেলের হুকুম হল। আর তারপরেও বা কি? দশটা বছর— ইন্সিওরেন্স এজেন্সীতে টাকা আস্‌ত শুধু গায়ে লেগে—আসলে বক্‌বক্‌ করতুম গান্ধীজির প্রোগ্রাম নিয়েই—” দেয়ালে-টাঙানো গান্ধীজির একটি ধূলিধূসর ছবির দিকে এক পলক তাকাবার জন্যেই শরৎবাবু এক মুহূর্ত্ত থাম্‌লেনঃ “তারপর আবার সিভিল-ডিসোবি-ডিয়েন্স—অবসর কোথায়? কি দিয়ে যে কি হবে সেটুকু ভাব্‌বারও অবসর নেই। মনে-মনে সে কি উত্তেজনা—দেশের কাজ করছি। তখন কি আর ভাব্‌তে পেরেছি দেশের শাসন যেখান থেকে চল্‌ছে সেখানে এসে বসতে না পারলে দেশের কাজ করা যায় না!” একটি সশব্দ হাসির পর শরৎবাবু থামলেন। অবিশ্যি সুদাসের মনে হল, তিনি থেমেছেন। কারণ বর্ত্তমান অবস্থাটাই যে তাঁর দেশের কাজ করবার পক্ষে সবচেয়ে অনুকূল এ কথা প্রমাণ করবার পর শরৎ গুপ্তের আর কোনো কথা থাকেনা।

এবার আর সময় নষ্ট করলনা সুদাসঃ “একটা ইন্‌ভেষ্ট্‌মেণ্ট নিয়ে আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এসেছিলুম!” এক নিঃশ্বাসে কথাটা বলে ফেলে সুদাস চুপ করল।

"ইন্‌ভেষ্ট্‌মেন্ট ?" শরৎবাবু বিনয়-মুগ্ধ চোখে তাকালেন : "সে, বাবা, তুমিই করো ! শেয়ারের জন্যে বরং কারো কাছে চিঠি দিতে হলে লিখে দিচ্ছি। ডিভিডেণ্ড যখন আমরা নিতে পারছি শেয়ার কেনবার জন্যে লোককে অনুরোধ করতে ক্ষতি নেই, কি বল ?"

"শেয়ার কিছু বিক্রি করা ত দরকারই—ডিপোজিটের টাকা আমাদের মতো ছোটখাট কনসার্ন ইন্‌ভেষ্ট করে বস্‌তে পারে না।" উমেদারের মতোই নম্র শোনাল সুদাসের গলা।

"এক ভদ্রলোকের সঙ্গে ওদিন আলাপ হয়ে গেল—বাঁশছড়ার জমিদার—এসেমব্লিতে তখন জমিদারীপ্রথা নিয়ে সোরগোল। যথেষ্ট পয়সা আছে ভদ্রলোকের। ওর কাছে একটা শেয়ার বিক্রী করতে পারো—তা না হয় পাঁচদশহাজার ফিক্সড্‌ ডিপোজিট ত পাবে।" সিদ্ধপুরুষের মৃদুহাসিতে শরৎবাবুকে প্রশান্ত দেখালো।

"বেশ, আপনার চিঠি নিয়ে কাগজপত্র পাঠিয়ে দোব !"

"চা খাও !" একটা সাংঘাতি ক্রটী শোধরাতেই যেন শরৎবাবু আবার লাফিয়ে উঠ্‌লেন : "ওরে—" অনিশ্চিত কাউকে উদ্দেশ করে কথাটা পাঠিয়ে দিলেন তিনি।

চেয়ারের উপরে একটু নড়ে-চড়ে নিয়ে সুদাস বল্‌লে : "একটা কটনমিল ফিনান্স করা সম্বন্ধে আপনার মতামত জানতে এসেছিলাম !"

শরৎবাবু সুদাসের কথা শুনলেন কিনা বলা যায়না—ভেতরের দরজার দিকেই গলা বাড়িয়ে ছিলেন তিনি এই আশায় যে অনিশ্চিত যাকেই ডেকে থাকুন পর্দা সরিয়ে একটি নিশ্চিত মুখই উঁকি দেবে। অমিতার নিশ্চিত মুখ উঁকিও দিল। শরৎবাবুর স্ত্রীর গরীব মামার মেয়ে অমিতা, দিদির মৃত্যুর পর জামাইবাবুর দয়ায় এখানে ঠাঁই পেয়েছে।

"দুকাপ চা—হ্যাঁ দু'কাপ—" অসাধারণ স্মার্ট দেখাল শরৎ-বাবুকে। যথারীতি অন্যমনস্ক হয়ে রইল সুদাস। শরৎবাবু যখন

ফিরে তাকাল সুদাসের দিকে তখনই সুদাস নিশ্চিত হয়ে শরৎবাবুর দিকে মনোযোগ ফিরিয়ে আন্‌ল কারণ অমিতা তখন নিশ্চিতভাবে পর্দ্দার আড়ালে অদৃশ্য হয়েছে।

"আমি মনে করি ইনভেষ্টমেণ্ট্‌টা ভালো—" পুরাণো প্রসঙ্গের জের টেনে চল্‌ল সুদাস।

"ভালো মনে হলে নিশ্চয়ই করবে—আজকালকার ইয়ংম্যান তোমরা বুদ্ধি-বিবেচনায় আমাদের চেয়ে ঢের তুখোর—" যুবশক্তির প্রশংসায় হঠাৎ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠ্‌লেন শরৎবাবু: "কনষ্ট্রাক্টিভ্‌ কাজ আমাদের চেয়ে ঢের বেশি বোঝ তোমরা—আমরা আর কি করতে পারলুম সারাটা জীবন আদর্শের পেছনে-পেছনে ঘোরা ছাড়া?—"

পাছে শরৎবাবু আবার নিজেকে নিয়ে মেতে উঠেন সেই ভয়ে সুদাস তাড়াতাড়ি যা মনে করতে পারল তা-ই বলে ফেল্‌ল: "শমীন বাড়ি নেই?"

শরৎবাবু একটু নিস্তেজ হয়ে পড়লেন: "বাড়িতেই ছিল ত!"

"ওর ঘর ত বন্ধ দেখছি।"

"বেরিয়েছে তাহলে আজ। তোমাদের যুগের অদ্ভুত ছেলে ও—কাজেকর্ম্মে উৎসাহই নেই।" শমীনকে নিয়ে শরৎবাবু আর এগুতে চাইলেন না: "একটা কথা তোমায় বলে দিচ্ছি সুদাস, যুদ্ধ বেধেছে—হুঁসিয়ার হয়ে চারদিকে নজর রেখে কাজ করতে পার ত দাঁড়িয়ে যাবে—অবশ্যি ন্যাশনেল গভর্ণমেন্টের মতো যদি একটা কিছু হয়ে যায় তাহলে তোমার চিন্তা নেই, আর কিছু না করে থাকি স্বদেশী করে জেল ত খেটেছি, তার একটা দাবী নিশ্চয় আছে!"

"যুদ্ধের সময়টাতে কটনের প্রস্পেক্ট আছে—গত যুদ্ধের পরইত এদেশে কটনইণ্ডাষ্ট্রি দাঁড়িয়ে গেল!"

"কটনইণ্ডাষ্ট্রির পেছনে কিন্তু আমাদের চরকা-আন্দোলন আছে—সেকথা ভুলোনা সুদাস—" সুরে সুললিত করে কথাটা

ছাড়লেন শরৎবাবু: "আজ লোটফির চরকা আয়া, সব কাপড়কা পুরকা আয়া'—গান্ধীজির দেওয়া এই মন্ত্র ছেলেদের ধরে ধরে পড়াতুম! ছেলেবেলায় তোমরাও শুনেছ হয়ত। বিদেশী বস্ত্র বর্জ্জনের আমাদের সেই বিরাট চেষ্টার হাত ধরে বোম্বে-আমেদাবাদ আর বাংলার মিলগুলো দাঁড়িয়ে গেল! করেছি—কিছুটা আমরা করতে পেরেছি। আর এখনো হৈ-চৈ না করে করবার চেষ্টা করছি—আমাদের কাছে আর আশা করলে অন্যায় করবে। এবার তোমাদের পালা!"

সুদাস উসখুস করছিল—তার কাজ ফুরিয়েছে। কিন্তু শরৎবাবুর উৎসাহ ফুরোয়নি। অমিতা চা নিয়ে এলে যুবক প্রেমিকের মতো শরৎবাবু আরো যে কি বিশ্রীভাবে উৎসাহিত হয়ে উঠ্‌বেন সে দৃশ্য মনে করে চিন্তিত হচ্ছিল সুদাস। এ অবস্থায় ওদের দুজনের নির্লজ্জতায় লজ্জিত হতে হয় সুদাসকেই। তার চেয়েও সাংঘাতিক ঘটনা—সুদাসের সঙ্গেও যখন অমিতা প্রগল্‌ভ হয়ে উঠ্‌তে চায়! ঘৃণায় তখন গা-বমি বমি করে ওঠে সুদাসের। পিউরিটান-পণা থেকে যে এমন হয় তা নয়। সুদাস নিজেকে পিউরিটান বলে না। কিন্তু পিউরিটান না হতে হলেই যে কদর্য্যতা সহ্য করে যেতে হবে তার কি মানে আছে! শরৎবাবুর বাড়িতে তাই সুদাস তার ব্যবসায়িক দিকটাকেই সজাগ, সচেতন রেখে অন্য দিকের দরজা বন্ধ করে দেয়। এখানে শমীনের সঙ্গে ক্বচিৎ তার দেখা হয়। দেখা হলেও দেখা যায় শমীনের মুখ কেমন রোগা-রোগা আর ফ্যাকাসে। এ যেন অন্যসময়কার শমীন নয়।

অমিতা চা নিয়ে এল—কিন্তু শরৎবাবু আজ আর তেমন উৎসাহিত হতে পারলেন না। দেখা গেল অপর দরজায় শমীন দাঁড়িয়ে আছে।

"সুদাস—কতক্ষণ এসেছিস্?" গলার স্বরে শমীন বাবা আর মাসীর উপস্থিতিটা অগ্রাহ্য করে গেল। চেয়ারের পিঠে মুখ নিয়ে

সুদাস পরম স্বস্তিতে বল্‌লে : "অনেকক্ষণ। বাড়িতেই ছিলি নাকি তুই!"

"পড়ছিলাম।"

"ঘর বন্ধ ছিল যে!"

"বন্ধ ঘরে কি পড়া যায়না?" সেই ফ্যাকাসে হাসি শমীনের মুখে : "তোর সঙ্গে কথা আছে—যাবার আগে শুনে যাস্‌।" শমীন তার ঘরের দিকে চলে গেল আবার।

"চা খাও—" শরৎবাবু মুখ নীচু করে নিজের কাপে চুমুক দিলেন।

"চিনি আর লাগ্‌বে কি না দেখুন—সুদাসবাবু কতোটা চিনি খান আমি কিন্তু জানিনে।" খুসী-খুসী চেহারা অমিতার—কুড়ি একুশ বছরের অবিবাহিত মেয়ের পক্ষে যা একটু অস্বাভাবিক। কিন্তু এতটুকু অস্বাভাবিকতাই সুদাসকে অস্বাভাবিকরকম পীড়িত করে তুল্‌ল। কিন্তু বল্‌তে গেলে মাত্রা থাক্‌বেনা বলেই চুপ করে রইল সুদাস।

"চিনি ঠিক আছে—না কি বল, সুদাস? আরেক চাম্‌চে দরকার তোমার?" শরৎবাবু আপ্যায়নে মেতে উঠলেন।

"না।" সুদাস চায়ে চুমুক দিয়ে চল্‌ল।

"আজ তোমার হাত ঠিক আছে!"

"হাত আমার রোজই ঠিক থাকে—আপনার জিভই ঠিক থাকে না!"

মুখ তুলে অমিতার দিকে না তাকিয়ে পারল না সুদাস। একটা অদ্ভুত হাসিতে অমিতা ওর সাধারণ মুখটাকেও সুন্দর করে তুলেছে। মাথা নীচু করেই ঘাড় নাড়ছিলেন শরৎবাবু—হয়ত খুসীতে—হয়ত এক পলক দেখে নিয়েছেন তিনি অমিতার মুখ।

"বর্ম্মামুলক থেকে এ বদ-অভ্যাস জুটিয়ে এনেছি—বর্ম্মা চুরুট—" অনুতপ্ত অপরাধীর মতো অপরাধ নিবেদন করে চল্‌লেন

শরৎবাবু: "একেকদিন বেশি খাওয়া হয়ে গেলে জিভটাতে চিনি সহজে প্রবেশপত্র পায় না!"

সুদাস চা খাওয়া শেষ করে দাঁড়িয়ে গেল—শরৎবাবুর চায়ের বৈঠকটা আর জম্‌তে দিল না। এমন কি বস্‌বার অনুরোধ আসবার আগেই দরজার দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে বল্‌লে: "রাত হয়ে যাচ্ছে—শমীনের সঙ্গে দেখা করে যাই আজ। আপনার চিঠি নিতে কাল-পর্শু'ই আস্‌ব একবার।"

শমীনের ঘরে এসে সুদাস ঢুক্‌তেই ঘরে আলো জ্বলে উঠল—বোঝা গেল সুদাসের অপেক্ষায় এতক্ষণ অন্ধকারেই চুপচাপ বসেছিল শমীন। শমীনের ঘরে আলো জ্বল্‌ল আর ওদিকে শরৎবাবুর ঘরে নিভে গেল আলো। আলো-নেভাটা চোখে লাগ্‌ল সুদাসের, ওদিককার অন্ধকারটাকে মনে হল কদর্য্য। শমীনের জন্যে একটা সহানুভূতি জাগিয়ে তুল্‌লে সে মুখে। বিমর্ষ মুখে তাকাল শমীনের দিকে। শমীনের মুখও বিমর্ষ। সুদাসের মন শোকাতুর হয়ে উঠ্‌ল। হয়ত শরৎবাবুর পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করে চলেছে শমীন নিজেকে বাড়ির ভেতর এনে কোণঠাসা করে রেখে। হয়ত ভয় পায় বাবার এই অপকীর্ত্তির ইতিহাস নিয়ে বন্ধুদের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াতে। ঘর অন্ধকার করে এতক্ষণ যে বসেছিল শমীন হয়ত মুখ দেখাবার লজ্জা ঢাকবারই চেষ্টায়।

"বোস্"—একটা ক্ষীণ দুর্ব্বল আওয়াজ করে শমীন বারান্দার দিককার দরজাটা এঁটে দিল।

শমীনের গাম্ভীর্য্যের উপর সুদাসের গাম্ভীর্য্য আবহাওয়াটা দুঃসহ করে তুল্‌বে, ভয়ে সুদাস বিমর্ষ মুখ হাসিতে হাল্কা করে আন্‌ল: "এ কি! রীতিমতো মন্ত্রণাসভা তৈরী করলি যে!"

"তাই।" শমীন সুদাসের মুখোমুখি চেয়ার টেনে বসল।

"তাহলে পাঁচ মিনিট সময়। অফিস থেকে বাড়ি ফেরা হয়নি।"

"সকাল-সকাল বাড়ি ফেরার দায় থেকে ত মা তোকে মুক্তি

দিয়ে গেছেন—এখন আর তাড়া কিসের ?" শমীন টেবিলের উপর একটা সিগারেট ঠুক্‌তে সুরু করলে।

হঠাৎ একটা হোঁচট খেয়ে যেন সুদাস ভাব্‌তে লাগ্‌ল, সত্যি এখন আর বাড়ি ফেরার তাড়া কিসের ? কিন্তু এতক্ষণ মন থেকে কেমন একটা ইচ্ছা যেন তাকে বাড়ি ফিরবার জন্যে খুঁচিয়ে চল্‌ছিল। মা বেঁচে আছেন এমন একটা বোধ কি কাজ করে চল্‌ছিল মগজে ? না। অনর্থকই যেন বাড়ির হাতছানি তার চেতনাকে ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে। অনর্থক—কোনো কারণ নেই তবু। কোনো কারণ নেই তবু ? শ্যামলীকে কি আশা করে থাকেনি তার মন ? শ্যামলী আস্‌বে কি না জানা নেই—তবু যদি আসে, একথা ভেবেই কি সজাগ ছিলনা সে বাড়ি ফেরবার জন্যে ? খুঁড়ে খুঁড়ে মন থেকে অপরাধ আবিষ্কার করে সুদাস নিঝুম হয়ে রইল খানিকক্ষণ। শমীন একটু বিপন্ন বোধ করলে। মার কথাটা সুদাসকে মনে করিয়ে দিতে গেল সে ? সেও চুপ করে রইল।

আবার একই সময়ে দুজনারই খেয়াল হল যে অনেকক্ষণ তারা চুপ করে আছে। শমীন কিছু বল্‌বে বলে তাকাল সুদাসের দিকে সুদাস একটা কথা বলেই ফেল্‌ল : "ভালো লাগেনা, শমীন, তোদের বাড়িতে আসতে—!"

"কেন ?" প্রশ্ন করেই শমীন জবাবটা তার পেয়ে গেল নিজের মনে, বল্‌লে : "ওঃ।"

"তোর মা মারা যাবার পর থেকেই এ রকম চল্‌ছে, না ?" প্রশ্নটা অত্যন্ত রূঢ় শোনাতে পারে জেনেও সুদাস না জিজ্ঞেস করে থাক্‌তে পারলনা। শমীনকে সহানুভূতি দেখাতে হলে শরৎবাবুকে আঘাত দিতেই হবে তাতে শমীনের গায়ে যতটুকু আঘাত লাগ্‌বে তার চেয়ে বেশি লাগ্‌বে সহানুভূতির স্নিগ্ধ প্রলেপ।

কিন্তু অবাক হল সুদাস শমীন একটুও আঘাত পায়নি। মুখে

একটা দার্শনিক ভঙ্গী এনে শমীন বল্‌লেঃ "মা বেঁচে থাক্‌লেও হয়ত এ'রকম হ'ত, মার স্বাস্থ্য ভালো ছিল না!"

শমীনের কথায় সুদাস বোকার মতো তাকিয়ে রইল তার মুখের দিকে—এ কথার উপর কি যে বলা যায় কিছুই যেন সে ভেবে পাচ্ছিলনা।

দার্শনিক ভঙ্গীতেই বলে চল্‌ল শমীনঃ "অবাক হয়ে গেলি? কিন্তু অবাক হবার মতো এতে কি আছে? বাবার স্বাস্থ্য খারাপ নয়—জীবনকে অস্বীকার করবার কোনো কারণ নেই তাঁর!"

সুদাস ভেবে চল্‌ছিল শরৎবাবুর ঘরে শমীনের চেহারার সঙ্গে কি শমীনের এ-সব কথার মিল আছে?

"তার মানে তোর বাবার ব্যাপারটা কিছুই·অস্বাভাবিক নয় তোর কাছে?" সুদাস যেন শমীনের নাগাল পাচ্ছেনা।

"নাঃ।"

"তোর অমিতা-মাসীর পক্ষেও ওটা স্বাভাবিক?"

"নিশ্চয়ই স্বাভাবিক মনে করছে ও, নইলে আছে কি করে?"

একটা হাসিতে হাল্কা হয়ে উঠ্‌ল যেন সুদাসঃ "সাব্বাস ভাই গান্ধীর চেলা! এমন ক্ষমাগুণ না থাক্‌লে কি আর গান্ধীজির নাম থাক্‌বে!"

"গান্ধীজিকে নিয়ে আর টানাটানি কেন?" ঠোঁট থেকে সিগারেটটা খুলে নিলে শমীনঃ "বয়েস হয়ে গেলে বাপ-মাকে সবারই ক্ষমা করতে হয়!"

"তাইত ভাব্‌ছি এতো উঁচু স্তরে হঠাৎ উঠলি কি করে?"

"পঙ্গু মা-কে নিয়ে তুই-ও কি খানিকটা উঁচু স্তরেই ছিলিনে?"

"কিন্তু এ কেস্‌টা ত পঙ্গু নয়, বরং নূতন হাত-পা গজাচ্ছে!"

"পঙ্গু না হলেও খাঁচায়-পোরা। প্যাশন নিয়ে, সেক্স নিয়ে সমাজের খাঁচায় বন্দী নন উনি?"

"বেশত, বিয়ে করুন তাহলে।"

"বিয়ে করাটা রীতিমতো ভাল্‌গার!"

"তোর অমিতা-মাসী কি করবে?"

"এ জীবনের চেয়ে ভালো একটা জীবন কোনোদিন ওর ভালো লাগ্‌তে পারে। সেদিন ও বেঁচে যাবে। নইলে মরবে। বাংলাদেশে কতো মেয়েই ত কতো রকমে মরছে!" শমীন সিগারেটে মন দিল।

সুদাস নিঃশব্দে হাসতে লাগ্‌ল। শমীনকে অদ্ভুত মনে হচ্ছে তার আজ। এতটাই যদি উদার সে, তাহলে শরৎবাবুর ঘরে ওরকম ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল কেন তার মুখ। না কি সুদাসই ভুল করেছে দেখ্‌তে—শমীনের মুখ ফ্যাকাসে দেখানো উচিত মনে করেই কি সুদাস ফ্যাকাসে দেখেছিল শমীনের মুখ? সে-ছবিটা ঠিক মনে করতে পারলনা সে এখন। শুধু মনে হল, কথা আছে বলে শমীন তাকে ডাক্‌তে এসেছিল। কি কথা? সুদাস ভেবেছে শরৎবাবুর বিরুদ্ধে অভিযোগের কথাই হয়ত কিছু। কিন্তু তা ত নয়। শরৎবাবুর কথা সুদাসই খুঁচিয়ে তুলেছে—শমীনের কোনো চেষ্টাই ছিলনা ও-কথা বল্‌বার। একটু লজ্জিতও হয়নি সে সরাসরি এ প্রসঙ্গ আলোচনা করতে! কি কথা আর তবে আছে শমীনের সুদাসকে ডেকে এনে যা আলোচনা করতে পারে? সুদাস ভেবে চল্‌ল।

একটা নিরুত্তেজ আবহাওয়াকে হঠাৎ সচকিত করে দিয়ে শমীন বললে: "আচ্ছা সুদাস, প্রবীরকে তোর কি রকম মনে হয়?"

"ভালোমানুষ।" সুদাস নির্লিপ্ত গলায় বল্‌লে।

"কি রকম ভালোমানুষ?"

"ওর একটা আদর্শ আছে আর তার উপর বিশ্বাসও আছে—তোমরা যে-যা-ই বল ওর সে-বিশ্বাস ভাঙবেনা। ভালোমানুষ হতে আর কিছু দরকার আছে?"

"অনুকে চিনিস্ তুই?—প্রবীরের বোন?"

"চিনি।" আবার নিঃশব্দে হাস্‌তে সুরু করল সুদাস।

শমীন সুদাসের দিকে তাকিয়ে সংক্ষেপে একটু হেসে নিয়ে বল্‌লেঃ "তুই জানিস তাহলে? ওর ব্যাপারটাই তোকে বল্‌ব ভাব্‌ছি।"

"তোর ব্যাপারে প্রবীরের সঙ্গে ওর বোনের বনিবনাও হচ্ছেনা, না?"

"তাই।" শমীন চুপ করে গেল।

একটু থেমে রইল সুদাস, শরৎবাবুর ঘরে শমীনের এ চেহারাই সে দেখতে পেয়েছিল। একটু থেমে একটা গম্ভীর আবহাওয়া তৈরী করে নিয়ে সুদাস বললেঃ "বিপ্লবীর একটা সংজ্ঞা আমার মনে তৈরী হয়েছে শমীন, সজ্ঞানে নিজের পারিপার্শ্বিক থেকে নিজেকে যে উদ্ধার করতে পারে তার নামই বোধ হয় বিপ্লবী। সে পারি-পার্শ্বিক শুধু সমাজ বা রাষ্ট্রই নয়, পরিবারও।"

সমর্থনে শমীনের চোখ উজ্জল হয়ে উঠল--সে-চোখকে উজ্জ্বলতর করবার জন্যে আবারও একটু থেমে নিয়ে বল্‌তে সুরু করলে সুদাসঃ "অন্য দেশের কথা জানিনে—প্রবীর হয়ত বলতে পারে সে জানে—আমাদের দেশে সবাই আধা-বিপ্লবী। যারা রাষ্ট্রবিপ্লবে জড়িত পারিবারিক বন্ধনের কথায় তারা নীরব—আবার যারা চেঁচিয়ে পারিবারিক বন্ধনকে অস্বীকার করে রাষ্ট্রিক ব্যাপারে তারা চুপচাপ। মোটের উপর বন্ধন-মোচনের শক্তিটা আমাদের এই এতটুকু—একটি ক্ষেত্রেই ফুরিয়ে তা ফতুর হয়ে যায়।"

"এসব তোর বাজে এনালাইসিস্—" প্রবীরকে আধা-বিপ্লবীর সম্মান দিতেও শমীনের ঘোরতর আপত্তি দেখা গেলঃ "বরং বল্ বিপ্লবের পরামর্শ বিতরণ করাই আমাদের পেশা—নিজের বেলায় পান থেকে চুণটুকু খস্‌লে তেতে উঠি।"

থিয়োরিটা ধূলিসাৎ হ'ল বলে খুব খুসী হতে পারলনা সুদাস—এ নিয়ে সে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তর্ক করে শমীনকে ঘায়েল করতেও

রাজী ছিল কিন্তু এখন সে ক্লান্ত—কাজেই অনেকটা নিস্পৃহ গলায় বললে : "এ ব্যাপারে প্রবীরের আপত্তি কেন ?"

"শুদ্ধান্তঃপুরের নিয়ম ভঙ্গ হবে, তাই আপত্তি।"

"তা কি করে হয় ?"

"তবে ?" শমীন একটু নিস্তেজ হয়ে গেল। সুদাস কি বল্‌তে চায় ? মহীতোষের সঙ্গে রাত্রির ও-ঘটনাটা কি জানে সুদাস ? জান্‌লেও বা কি ? তার আগেকার মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত ত শমীনের চরিত্রে কোনো খুঁত ছিলনা, চরিত্র নিয়ে প্রবীরের তবে আপত্তি থাকবে কেন ? অসম্ভব, প্রবীরের আপত্তি এ ঘটনার উপর তৈরী হতে পারেনা। কিন্তু তবু শমীন ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

"পরিচিত মানুষরা কি বল্‌বে, কি ভাব্‌বে তারি ভয় করছে হয়ত প্রবীর।" সুদাস এবার সহজ পথে সমস্যাটাকে মীমাংসা করতে চাইল।

তাতে আবারও চাঙ্গা হয়ে উঠল শমীন : "নিজেকে কম্যুনিষ্ট বলে ঘোষণা করে' এ ভয় ?"

"ঘোষণা করে বলেই কি সত্যি-সত্যি ও কম্যুনিষ্ট ? একটা অষুধের বিজ্ঞাপনে ত কতো রোগ সারাবারই ঘোষণা থাকে—তা বলে কি সে-অষুধ রোগগুলো সারাতে পারে ?"

শমীন সশব্দে হেসে উঠ্‌ল—আর সেই সুযোগ নিয়ে সুদাস চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে গেল।

"আমাকে তাহলে কি করতে বলিস ?" তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল শমীন।

"অনু যা বল্‌বে তা-ই করবি—এ তো সোজা কাজ !"

"মেয়েরা কি কিছু বলে ?"

"না বল্‌লে তুই এতোটা এগোলি কি করে ?" এবার সুদাসই হাস্‌ল এবং বিরাট শব্দ করে। শব্দটা এতো অস্বাভাবিক লাগল শমীনের কানে যে ভয়ে সে আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করলনা।

একরকম দৌড়েই বাড়ির গেট পার হয়ে রাস্তায় এসে দাঁড়াল

সুদাস। মনে মনে এ-প্রার্থনাই করে চল্‌ছিল যে, বাড়িটার গেটে যেন জীবনে আর ঢুকতে না হয়। কিন্তু ট্র্যামের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে মন তার শমীনের কথাই আলোচনা করে চল্‌ছিল। শরৎবাবুর ব্যবহারের উপর অভিযোগ নেই কেন শমীনের—কেন? অম্নুর জন্যেই হয়ত। অম্নুর জন্যে দুর্ব্বলতায় মন তার এম্নি দুর্ব্বল হয়ে গেছে যে দুর্ব্বলতা দেখলেই সহানুভূতিতে তা ভিজে উঠ্‌তে চায়। নইলে কি করে শরৎবাবুকে ক্ষমা করতে পারে শমীন? এ ধরণের অপরাধে কোনো বাপকেই কোনো ছেলে ক্ষমা করতে পারেনা। ততটা মহানুভবতা বা সহ্যশক্তি কোনো সন্তানের নেই। আশ্চর্য্য যে শমীন এতটা মহানুভব হতে পেরেছে! সুদাসের ত্রুটি-সন্ধিৎসু মন প্রশংসায় উন্মুখ হয়ে উঠ্‌ল। শমীনকে ধন্যবাদ—ধন্যবাদ অম্নুকে! কী সুন্দর করে তোলে মানুষের মনকে প্রেম! রাত্রির ছায়ায় রাসবিহারী এভিন্যুর একটি গাছের তলে দাঁড়িয়ে ঋষি-দার্শনিকের মতো সুদাসের মন উচ্চারণ করলেঃ কী সুন্দর করে তোলে মানুষের মনকে প্রেম!

তারপরই হঠাৎ আবিষ্কার করল সুদাস সে নিজেও যেন দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ছে—যেন দুর্ব্বল হয়ে উঠ্‌ছে তার মন শমীনের উপর। একটু সহানুভূতির ধ্বনি কি শোনা গেলনা এ-ক'টা কথায়ঃ কী সুন্দর করে তোলে মানুষের মনকে প্রেম—এ কথাগুলোতে কি সহানুভূতির একটু মৃদু সুগন্ধ মিশে নেই? এ কথা উচ্চারণ করে শমীনকে কি ক্ষমা করেনি সে মনে-মনে? কেন—কেন সে ক্ষমা করল শমীনকে? কেন? শ্যামলীর জন্যেই কি?

লাইনের উপর ট্র্যামের চোখ দেখা গেল—ষ্টপ্‌-পোষ্টের কাছে এগিয়ে গিয়ে দাঁড়াল সুদাস অস্বাভাবিক দ্রুততায়! কি জানি, শ্যামলী আজ এসে ফিরে গেল কি না!

একটি দিনের শেষ—সমস্ত ট্র্যাম-পথটা তাই সুদাস শ্যামলীর

কথাই ভেবে চল্‌ল। শ্যামলীকে এখন মনের উপর আনা যায়, ঠিক এমনি ধরণের একটা যুক্তি নিয়ে সুদাস গত সন্ধ্যার স্মৃতি হাতড়াতে সুরু করে। গত সন্ধ্যার স্মৃতির শরণ নিতে গিয়ে একটি জিজ্ঞাসাই বারবার তার সাম্‌নে এসে উপস্থিত হচ্ছিল: আজ কি আর শ্যামলী আস্‌তে পারেনা? অনেকবার এই একই জিজ্ঞাসা। শুধু এখন নয়। সুদাস মনে করতে পারছে, এই জিজ্ঞাসাটাই সমস্ত দিন সমস্ত কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাকে তাড়া করে এসেছে। অফিসেও কয়েকবার ভাবতে হয়েছিল তাকে—শ্যামলী কি আজ আসবে? এ রকম আশা করা তার অন্যায়—শ্যামলীকে আস্‌তে সে বলেনি, তবু তার মনে হচ্ছিল শ্যামলীর যেন আসা উচিত।

শ্যামলীর পক্ষের উচিতটাকে এতই বিশ্বাস করে ফেলেছিল সুদাস যে ট্র্যাম থেকে নেমে প্রায় ঊর্দ্ধশ্বাসেই ফ্ল্যাটে এসে উপস্থিত হল। কিন্তু স্বাভাবিক ভাবেই শ্যামলী তার ঘরে আর আজ বসে নেই। ঘরে বসে আছে প্রবীর, সঙ্গে বহুদিনের অনুপস্থিত রঞ্জন। আশায় আঘাত পেয়ে সুদাস রঞ্জনকে দেখেও যথোচিত উৎসাহিত হতে পারলনা। লক্ষ্য করলে দুঃখিত হ'তে পারত রঞ্জন কিন্তু সুদাসকে সম্ভাষণ করতেই এতো ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল সে যে সুদাসের মুখে সূক্ষ্ম অনুভূতি-রেখাগুলো আবিষ্কারের সময় তার আর ছিলনা।

"যাক্‌ বাঁচা গেল বিদ্যাদিগ্‌গজ—রাত্তিরে তাহলে বাড়ি ফিরছ!" রীতিমতো কোলাহল করে রঞ্জন কথাগুলো বল্‌লে।

"দাঁড়া—অফিসের ফাঁস-মুক্ত হয়ে আসি।" ম্লান একটু হাসি ছিটিয়ে মার ঘরের দিকে এগোলো সুদাস—কিন্তু ঘরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ভাব্‌তে লাগ্‌ল এ পোষাকেও ত ওদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলতে পারত সে—পোষাক বদলাতে এঘরে কেন এল তবে? এ কি অফিস থেকে ফিরে মার ঘরে আসার অভ্যাস? না কি গত সন্ধ্যার আচরণেরই পুনরাবৃত্তি করতে হ'ল তাকে? শ্যামলীর উপস্থিতি-বোধটা কি শ্যামলীর অনুপস্থিতিতেও মন থেকে মুছে

যায়নি? প্রবীর আর রঞ্জনের রূঢ় উপস্থিতিও কি ফিকে হয়ে গেল মনের কাছে? নিজের কাছে নিজেই লজ্জিত হয়ে উঠল সুদাস—শ্যামলী বড় বেশি প্রশ্রয় পাচ্ছে তার মনে। খুবই অন্যায়। শ্যামলীকে প্রশ্রয় দিয়ে এইমাত্র একটা গর্হিত অন্যায় সে রঞ্জনের উপর করে এলো। প্রায় চার বছর পর রঞ্জনের সঙ্গে তার দেখা—আতিথেয়তায় একটুও উষ্ণ হতে পারল না তবু সে। বন্ধুত্বের উপরও জুলুম চালিয়েছে শ্যামলী। সুদাস অনুতপ্ত হল।

দুমিনিট পরেই সুদাস দেখতে পেল অনুতাপের কোনো কারণ নেই। ওসব সূক্ষ্ম আচরণ আবিষ্কার করে গায়ে মাখবার ছেলেই নয় রঞ্জন।

"তোদের পাল্লায়ই এসে আবার পড়লুম দাসু—সর্ব্বতীর্থসার বাংলাদেশে। অনেক তীর্থ দেখেও চিত্ত ভরল না এ কথা বলিনে —বরং বলি, fed-up—তাই বাংলাদেশের জলবায়ু হালচালের আশ্রয় নিতে এলুম।" দম নেবার জন্যেই যেন রঞ্জন অনিচ্ছাসত্ত্বেও থেমে গেল।

"দেখা দিলে এবার কি বেশে?" স্বল্পভাষীর মতো স্বল্প হাসি নিয়ে বল্‌লে সুদাস।

"জর্ণেলিস্ট্—সেন্ট্‌পার্সেণ্ট। যুদ্ধের সময় হয় সৈন্য নয় সাংবাদিক এদুয়ের পেশা ছাড়া আর কোনো যুক্তিসঙ্গত পেশা থাক্‌তে পারে না। সৈন্য হবার মুরোদ নেই তাই এ পথ—" আঙুলে-ধরা লুপ্তপ্রায় জ্বলন্ত সিগারেটের টুক্‌রো থেকে আরেকটা ধরিয়ে নিয়ে টান্‌তে সুরু করল রঞ্জন।

"ভালো। তোর কাছ থেকে তাহলে টাট্‌কা টাট্‌কা যুদ্ধের খবর পাওয়া যাবে।"

"তাতে তোমার কি লাভ? শুন্‌লুম ত এক ব্যাঙ্ক ফেঁদে বসেছ—যুদ্ধের খবর ত আর শেয়ার মার্কেটের খবর নয় যে স্কুপ্ জেনে মুনফা লুট্‌বে!"

একটা সিগারেট ঠোঁটে নিয়ে এতক্ষণ প্রবীর প্রায় তুরীয় অবস্থায় ছিল। রঞ্জনের কথায় যেন বাস্তব চেতনায় নেমে এল। তার কারণ আর কিছুই নয়, যেহেতু প্রবীর কম্যুনিষ্ট তার ধারণা অর্থনীতিটা তার নখদর্পণে। অর্থনীতি-সংক্রান্ত কোনো আলাপকে সে উপেক্ষা করতে পারে না।

"ভুল করলি রঞ্জন—" দৈববাণীর মতো আওয়াজ করল প্রবীর: "শেয়ার মার্কেটের জোয়ার-ভাটা তৈরী করতে যুদ্ধই চন্দ্রসূর্য্য।"

"তাহলে আমি হাতে চাঁদ কপালে সূয্যি নিয়ে আবির্ভূত হয়েছি বল ?" প্রবীরের দিকে ঘাড় হেলিয়ে দিল রঞ্জন।

"দাস্থর কাছে অনেকটা তাই।"

"নিশ্চয়—"একটু অস্বাভাবিক জোর দিয়েই বল্‌ল সুদাস: "সাদাসিধে সূর্য্য নিয়েই চল্‌বে আমাদের দিন—তোর মতো লাল সূর্য্যের স্বপ্ন আর পাব কোথায় ?"

"কিন্তু লাল সূর্য্যের খবর পাবি দাস্থ—যে সূর্য্য অস্ত যেতে লাল হয়—"রঞ্জন চেয়ারের পিঠে মাথা হেলিয়ে ঠোঁট থেকে সিগারেটের গুঁড়োগুলো ফুঁ দিয়ে উড়োতে উড়োতে বললে: "Intelligence fails when thought and action go in service for a dead age: when failure becomes chronic, the consequence is extinction. This is modern Europe. সূর্য্য সেখানে অস্ত যেতে বসেছে !"

রঞ্জনের কথায় নয়, রঞ্জনের কথায় প্রবীর উস্‌খুস করছে বলেই খুসী হয়ে উঠ্‌ল সুদাস। প্রবীরকে দেখে অবধি শর্মীনের কথাগুলোই সুদাসের মনে পড়ছিল আর ক্রমেই যেন অসহ্য মনে হচ্ছিল তাকে। কিন্তু শর্মীনের ব্যাপারটা নিয়ে সোজাসুজি প্রবীরকে আক্রমণ করতে কেমন সঙ্কোচ হয়। অন্য প্রসঙ্গে তাকে আক্রমণ করে সে-ঝাল মিটানো বরং সম্ভব। তার চেয়ে

ভালো অন্য কেউ যদি প্রবীরকে আক্রমণ করে। রঞ্জনের কথাগুলো তাই সোৎসাহে উপভোগ করে চল্‌ছিল সুদাস।

প্রবীর নির্ব্বিবাদে রঞ্জনকে মেনে নিতে পারেনা—একটু নড়ে-চড়ে বসে সে বল্‌লেঃ "সাধারণ একটা সিনিসিজ্‌ম্‌ শিখে নিতে এ'ক' বছর সারা ভারতবর্ষ ঘোরবার তোর কি দরকার ছিল রঞ্জন?—ওটা ত ঘরে বসেই শেখা যায় এবং ঘরে বসেই ভালো শেখা যায়!"

প্রবীরের জবাব দিতে রঞ্জনের খুব আগ্রহ দেখা গেলনা—নিরুৎসুকের মতোই সে বল্‌তে লাগ্‌লঃ "ঘরে বসে কি সিনিসিজ্‌মের দিব্যদৃষ্টি লাভ হয়—বরং মনে হ'ত বাংলা দেশে কিছু না হোক, কংগ্রেসমিনিষ্ট্রীতে বুঝি পণ্ডিতজির দেশ সাত হাত উঁচুতে উঠে গেছে—মহাত্মার দেশে হয়ত মাহাত্ম্যের ছড়াছড়ি, বোম্বে বুঝিবা বিলেতই বনে গেল! তীর্থভ্রমণে বেরিয়ে তবে না দেখা গেল একা বাংলাই নয় ব্রহ্মর্ষিদেশ থেকে সুরু করে ত্রিচিনপল্লী তক্‌ সবাই টাকার পেছনে ডগ্‌-রেসের জানোয়ারের মতো ছুটছে! দেখে মন থেকে ভালো ভালো ইজ্‌ম্‌গুলো ধুয়ে-মুছে সাফ্‌ হয়ে গেল। সে-জায়গায় পবিত্র নির্ভেজাল সিনিসিজ্‌ম্‌ এসে আসন পাতল।"

"প্রবীর বল্‌তে চায়—"সুদাস রঞ্জনকে ঠিক জায়গায় এনে উস্কে দিতে চাইলঃ "তার আগে তোর রাশিয়া ঘুরে আসা উচিত ছিল!"

"আসতুম, কিন্তু পাসপোর্ট কোথায়? ক্রেমলিন্‌ কি যাকে তাকে পাসপোর্ট দেয়?"

প্রবীর আরেকটা সিগারেটে মনোনিবেশ করল, ঠোঁটে তার একটা উঁচু দরের হাসি। সুদাস রঞ্জনকে আরেকটু খুঁচিয়ে তুললঃ "ভালো মানুষদের দেয়।"

"যারা Politically Innocent—তাইত পণ্ডিতজির ভাগ্যে পাসপোর্ট জুটলনা। অবশ্য আমি কিছু পলিটিক্সের রাজা-উজীর

নই তবু রাশিয়া হয়ত আমাদের মতো জীবদের ডার্ক হর্স ই ভেবে নেয়—কি জানি সুনীতি চাটুজ্জের মতো যদি রাশিয়ান ভাষাটা আমাদের আয়ত্তে থাকে, আর তা দিয়ে রাশিয়ার খুঁটিনুটির খবর জেনে দেশে এসে রটিয়ে দিই এমন একটা আশঙ্কা রাশিয়া নিঃসন্দেহে করতে পারে!"

সেই হাসিটাই ঠোঁটে নিয়ে প্রবীর বল্‌লেঃ "রবীন্দ্রনাথ ত খবর রটিয়েছেন, নিজেকে ঢেকে রাখবার কোনো দরকার নেই ত রাশিয়ার।"

"আছে।" রঞ্জন একটা সিগারেট দেশলাইএর বাক্সের উপর ঠুক্‌তে সুরু করলেঃ "কারণ রবীন্দ্রনাথ বা ওয়েবদম্পতী ছাড়াও আন্দ্রে জিদের মতো লোক মাঝে মাঝে গিয়ে রাশিয়ায় উপস্থিত হতে পারে!"

"তা পারে। পৃথিবীতে মিস্ মেয়োর অভাব নেই।" প্রবীর চোখ বুঁজে প্রকাণ্ড জ্ঞানীর ভঙ্গীতে বললে।

"মিস্ মেয়ো ভারতবর্ষের ড্রেনের খবর দিতে পারেন—কিন্তু ড্রেনগুলো যে ভারতবর্ষে আছে এ খবর ত মিথ্যে নয়!" পাছে রঞ্জন তর্কের এ সূত্রটা উপস্থিত না করতে পারে সুদাস তাই পদের মাঝখানে টুপ করে কথাটা ফেলে দিলে।

"আন্দ্রে জিদ রাশিয়ার কালো দিকটা দেখেছেন এ কথাও যদি মেনে নেওয়া যায়, তবু আমরা বল্‌ব একটা কম্যুনিষ্ট দেশের পক্ষে সে-কালোও মারাত্মক। প্রবীর, রাশিয়ার দিকে তাকিয়ে যত উৎসাহিতই হও—সেখানেও সেই একই রোগ, অতীত দিনেরই পূজো চলেছে। প্রাক্-বৈপ্লবিক লেনিনের আদর্শগুলোর পূজো এখনও সেখানে শেষ হলনা!" একটু থেমে নিয়ে রঞ্জন বল্‌লে —"যাক্—দাসু, চা খাওয়া ত এক কাপ, এতো কথা বল্‌তে হবে কে জানত আগে, তাহলে টেবিলের উপর এক পট্ চা নিয়েই বস্‌তুম।"

প্রবীর এবার একটু অমায়িক হেসে বল্‌লঃ "প্রাক্-বৈপ্লবিক রাশিয়ায় তোর মতো chatter-box কিন্তু অনেক ছিল!"

"থাক্‌তে পারে। তবে ভারতবর্ষে chatter-boxরা সব সময়ই উপস্থিত—উৎসবে-ব্যসনে-দুর্ভিক্ষে-রাষ্ট্রবিপ্লবে!" রঞ্জন সশব্দে হেসে উঠ্‌ল। তার সঙ্গে সুদাসও যোগ দিলে এবং সবশেষে প্রবীর।

সীধুর উপর চায়ের হুকুম হ'ল।

"আর কিছু খাবিনে? অন্তত এক টুকরো অম্‌লেট?" সুদাস জিজ্ঞেস করল।

হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে রঞ্জন বল্‌লেঃ "মাত্র সাড়ে ন'টা—চল্‌তে পারে!"

"যাযাবরবৃত্তিটা কিন্তু ওর এখনো পুরোদস্তুর আছে—জানিস দাসু?" প্রবীর বল্‌লে।

"অত সংস্কৃত করে বল্‌বার দরকার কি, বল্‌না ভ্যাগাবণ্ড্! তোর মতো Political being বা দাসুর মতো Commercial being যখন নই—পরেরও নই, ঘরেরও নই—তখন আমার বিশুদ্ধ definition হচ্ছে ভ্যাগাবণ্ড্।"

সুদাস একটু বিব্রত হয়েই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলঃ "কোন্ কাগজে ঢুক্‌লি?"

"ঢুকিনি ত!"

"তাতেই নিজেকে বল্‌ছিলি জর্ণেলিস্ট্?" হাস্‌তে লাগ্‌ল সুদাস।

"Mental make-up জর্ণেলিস্টের মতো হয়ে গেছে—সেটা হওয়াই ত আসল, চাক্‌রিটাই কি আসল? বোলপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথ ত মাষ্টারি করেছেন, তার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে কবি না বলে মাষ্টার বল্‌ব?"

"স্রেফ্ ফেরেববাজি চালাচ্ছে ও, দাসু—রয়টারে চাক্‌রি নিয়েই এখানে ওর আসা!"

"ও, তাই ?" সুদাস অম্‌লেটের ব্যবস্থা দেখ্‌তে সীধুর ঘরে গিয়ে উঁকি দিলে। যদিও সে জানে অমলেট সম্বন্ধে আলাপটাই সীধুর পক্ষে যথেষ্ট—সে যখন তা শুন্‌তে পেয়েছে ইতিমধ্যে তা তৈরী হয়ে যাবার কথা—তবু সুদাস উঠে এলো। তার কারণ প্রবীরের গায়ে-পড়ে কথা বলা। প্রবীরকে কিছুতেই সহ্য হচ্ছিলনা আজ তার—প্রবীরের কোনো কথার জবাব দিতে জিভ যেন শাসন মানবেনা—তাই সব সময় প্রবীরের কথা এড়িয়েই এসেছে সে।

চা-অম্‌লেট নিয়ে এগিয়ে এলো সীধু—ট্রে থেকে চায়ের একটা কাপ তুলে নিয়ে সুদাস সীধুর পেছু নিলে।

"দেখ্‌ছি ফর্ম্ম্যালিটি না মানার অভ্যাস এখনো তোর রয়ে গেছে দাসু—" রঞ্জন চা-অম্‌লেটে মনোযোগ দিতে দিতে বল্‌লে।

"চায়ের কাপটা সরিয়ে নিলুম বলে ? ওটা আমার কাপ।"

"একটু শুচিবাই-ও জমে উঠছে ? ব্যাচেলার থাকার ফল !"

"ফলটা আমার উপরই ফল্‌বে কেন—তোরা সবাই আমার চেয়ে কি আর বেশি পুণ্য করেছিস্ ?"

"এত তীর্থ ঘুরেও পুণ্য করিনি ?—কি ভাবিস্ আমায় তুই ?"

"আমাদের চাইতে লায়েক তুই নোস।"

"তোর চাইতে লায়েক—প্রবীরের কথা অবশ্যি বলিনে, কম্যুনিষ্ট মানুষ, ওর ত ট্যাবু না থাকবারই কথা—"

"ট্যাবু আমার নেই—" প্রবীর নিস্তেজ ভাবে বল্‌লেঃ "কিন্তু—"

"কিন্তু সাহসও আমার নেই—এইত ?" রঞ্জন যেন ওৎ পেতে ছিলঃ "এটাত আজকাল শতকরা নব্বুইজন বাঙালীর চরিত্র। তুইও যদি তাই, তোকে আর কম্যুনিষ্ট বলি কোন্ ভর্সায় ?"

"ওর উপর ভর্সা রাখিস নাকি তুই ?" সুদাস এবার আক্রমণের জন্যে তৈরী হ'লঃ "ওরা আসলে ভূদেবী-সংস্কৃতির বাঙালী হিন্দু। কম্যুনিজ্‌ম্‌টা পেশা মাত্র—"

টুঁ শব্দ না করে নির্ব্বিবাদে চায়ে চুমুক দিয়ে চল্‌ছিল প্রবীর।

প্রবীর এবার একটু অমায়িক হেসে বল্‌ল : "প্রাক্-বৈপ্লবিক রাশিয়ায় তোর মতো chatter-box কিন্তু অনেক ছিল !"

"থাক্‌তে পারে। তবে ভারতবর্ষে chatter-boxরা সব সময়ই উপস্থিত—উৎসবে-ব্যসনে-দুর্ভিক্ষে-রাষ্ট্রবিপ্লবে !" রঞ্জন সশব্দে হেসে উঠ্‌ল। তার সঙ্গে সুদাসও যোগ দিলে এবং সবশেষে প্রবীর।

সীধুর উপর চায়ের হুকুম হ'ল।

"আর কিছু খাবিনে ? অন্তত এক টুকরো অম্‌লেট ?" সুদাস জিজ্ঞেস করল।

হাতঘড়িতে চোখ বুলিয়ে রঞ্জন বল্‌লে : "মাত্র সাড়ে ন'টা—চল্‌তে পারে !"

"যাযাবরবৃত্তিটা কিন্তু ওর এখনো পুরোদস্তুর আছে—জানিস দাসু ?" প্রবীর বল্‌লে।

"অত সংস্কৃত করে বল্‌বার দরকার কি, বল্‌না ভ্যাগাবণ্ড্ ! তোর মতো Political being বা দাসুর মতো Commercial being যখন নই—পরেরও নই, ঘরেরও নই—তখন আমার বিশুদ্ধ definition হচ্ছে ভ্যাগাবণ্ড্।"

সুদাস একটু বিব্রত হয়েই তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করল : "কোন্ কাগজে ঢুক্‌লি ?"

"ঢুকিনি ত !"

"তাতেই নিজেকে বল্‌ছিলি জর্ণেলিস্ট্ ?" হাস্‌তে লাগ্‌ল সুদাস।

"Mental make-up জর্ণেলিস্টের মতো হয়ে গেছে—সেটা হওয়াই ত আসল, চাকুরিটাই কি আসল ? বোলপুরে আশ্রম প্রতিষ্ঠা করে রবীন্দ্রনাথ ত মাষ্টারি করেছেন, তার জন্যে রবীন্দ্রনাথকে কবি না বলে মাষ্টার বল্‌ব ?"

"স্রেফ্ ফেরেববাজি চালাচ্ছে ও, দাসু—রয়টারে চাকুরি নিয়েই এখানে ওর আসা !"

"ও, তাই ?" সুদাস অম্‌লেটের ব্যবস্থা দেখ্‌তে সীধুর ঘরে গিয়ে উঁকি দিলে। যদিও সে জানে অমলেট সম্বন্ধে আলাপটাই সীধুর পক্ষে যথেষ্ট—সে যখন তা শুন্‌তে পেয়েছে ইতিমধ্যে তা তৈরী হয়ে যাবার কথা—তবু সুদাস উঠে এলো। তার কারণ প্রবীরের গায়ে-পড়ে কথা বলা। প্রবীরকে কিছুতেই সহ্য হচ্ছিলনা আজ তার—প্রবীরের কোনো কথার জবাব দিতে জিভ যেন শাসন মানবেনা—তাই সব সময় প্রবীরের কথা এড়িয়েই এসেছে সে।

চা-অম্‌লেট নিয়ে এগিয়ে এলো সীধু—ট্রে থেকে চায়ের একটা কাপ তুলে নিয়ে সুদাস সীধুর পেছু নিলে।

"দেখ্‌ছি ফর্ম্ম্যালিটি না মানার অভ্যাস এখনো তোর রয়ে গেছে দাসু—" রঞ্জন চা-অম্‌লেটে মনোযোগ দিতে দিতে বল্‌লে।

"চায়ের কাপটা সরিয়ে নিলুম বলে ? ওটা আমার কাপ।"

"একটু শুচিবাই-ও জমে উঠছে ? ব্যাচেলার থাকার ফল!"

"ফলটা আমার উপরই ফল্‌বে কেন—তোরা সবাই আমার চেয়ে কি আর বেশি পুণ্য করেছিস্ ?"

"এত তীর্থ ঘুরেও পুণ্য করিনি ?—কি ভাবিস্ আমায় তুই ?"

"আমাদের চাইতে লায়েক তুই নোস।"

"তোর চাইতে লায়েক—প্রবীরের কথা অবশ্যি বলিনে, কম্যুনিষ্ট মানুষ, ওর ত ট্যাবু না থাকবারই কথা—"

"ট্যাবু আমার নেই—" প্রবীর নিস্তেজ ভাবে বল্‌লেঃ "কিন্তু—"

"কিন্তু সাহসও আমার নেই—এইত ?" রঞ্জন যেন ওৎ পেতে ছিলঃ "এটাত আজকাল শতকরা নব্বুইজন বাঙালীর চরিত্র। তুইও যদি তাই, তোকে আর কম্যুনিষ্ট বলি কোন্ ভর্সায় ?"

"ওর উপর ভর্সা রাখিস নাকি তুই ?" সুদাস এবার আক্রমণের জন্যে তৈরী হ'লঃ "ওরা আসলে ভূদেবী-সংস্কৃতির বাঙালী হিন্দু। কম্যুনিজ্‌ম্‌টা পেশা মাত্র—"

টুঁ শব্দ না করে নির্ব্বিবাদে চায়ে চুমুক দিয়ে চল্‌ছিল প্রবীর।

সুদাসের কথায় একটু নড়ে-চড়ে উঠল: "কম্যুনিষ্টদের গালাগাল করা দাসুর একটা প্যাশন—জানিস্ রঞ্জন?"

"কম্যুনিষ্টদের উপলক্ষ্য করে তোকে গালাগাল?"

"ছাটস্ ইট্।" একটু জ্বলে উঠ্‌ল সুদাসের চোখ—হয়ত প্রতিহিংসার চরিতার্থতায়।

প্রবীর একটু ম্লানমতো হাস্‌ল। তাতেই বিষণ্ণ হয়ে উঠল আবহাওয়া। তাছাড়া সুদাসের গলার আওয়াজটাও খুব স্বাভাবিক শোনালনা রঞ্জনের কানে। তাই মনে হল তার এখন প্রসঙ্গান্তরে যাওয়া দরকার।

"আমাদের ভালোছেলেটি কি করছে রে দাসু?—শমীন? আইন পাশ করে আরো আইন-মাফিক চলতে সুরু করেছে, না?"

"এক আধটু বে-আইনী কাজ করছে মনে হয়।" সুদাস অন্যমনস্কতার ভান করে প্রবীরের দিকে তাকাল।

"তাই না কি? তাহলে ভালোমানুষেমি ছেড়ে ও মানুষ হচ্ছে বল্।"

"মনে ত হয়।"

"ভালো, ওর সঙ্গে তাহলে দেখা করতে হয়!"

"বাঃ, প্রবীরের বাড়িতে ওর সঙ্গে তোর দেখা হয়নি?" প্রশ্ন করল সুদাস ভঙ্গীটা যথাসম্ভব নির্দ্দোষ রেখে।

"না ত!" রঞ্জন নিরুপায়ের মতো প্রবীরের দিকে তাকালে: "প্রবীর ত একবারও বলেনি শমীনের কথা!"

"তুই ত আমায় জিজ্ঞেসও করিসনি।" প্রবীর অসঙ্কোচে বললে: "আর তাছাড়া শমীন আজ আসেনি, তা ত দেখতেই পেলি!"

"তাতে হয়ত তুই অনেকটা খুসী?" সুদাস সোজাসুজি আক্রমণ না করে আর থাক্‌তে পারলনা।

"তার মানে?" প্রবীরকে এবার একটু অতিরিক্ত ফ্যাকাসে দেখাল।

"মানেটা নিজেকেই জিজ্ঞেস করিস্।" সুদাস চুপ করে গেল।

আবার বিশ্রী হয়ে উঠ্‌ল আবহাওয়া। রঞ্জন এরকম আবহাওয়ায় একটু অস্থিরতাই অনুভব করে। তাই একটা সিগারেটে সে অত্যন্ত মনোযোগী হয়ে পড়তে চেষ্টা করল। কোনো দুর্ব্বোধ্য সূত্র ধরে ওদের কথাবার্ত্তা চলছে, উপরে পড়ে কিছু বলা যায় না। অথচ মুখটা তার যাহোক একটা কিছু বলবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে উঠেছে—ওটাকে সিগারেট-চাপা দেওয়াই ভালো।

সুদাসের কথার সূত্র ধরে প্রবীর মনে-মনে খানিকটা এগিয়ে যেতে চাইল। সুদাসকে কিছু বলেছে কি শমীন? কিন্তু কি বল্‌তে পারে ও? শমীনকে ত কোনোদিন কিছু বলেনি সে। অনুর সঙ্গে শমীনের যে ঘনিষ্ঠতা হয়ত তা তার চোখে একটু পীড়া দেয়; পীড়া দেয় পাছে বাবা-মা ব্যাপারটা নিয়ে তাকেই অপরাধী করেন, পাছে তারা মনে করেন শমীন তারই বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে, তারই সম্মতি পেয়ে অনুর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হয়ে উঠ্‌তে চেষ্টা করছে। কিন্তু তা-ও ত প্রবীরের নিতান্তই ব্যক্তিগত মানসিক পীড়া। এ নিয়ে ত সে কাউকে কোনো কথা বল্‌তে যায়নি।

প্রবীরের মুখ ক্রমেই রক্তহীন হয়ে উঠ্‌তে লাগল। দেখে সুদাসেরও ভেতরটা কেমন বিস্বাদ লাগ্‌ছিল। প্রবীরের উপর আক্রোশটা ঢাল্‌তে না পারলেও সুদাস সুস্থ হতে পারতনা অথচ আক্রোশ মিটিয়েও তার অস্বস্তির সীমা ছিলনা। নিরুপায় হয়ে সুদাস রঞ্জনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বল্লে: "একটা সিগারেট দে—"

"ও স্যিওর—" রঞ্জন প্যাকেটটা এগিয়ে দিলে। সুদাসের নেওয়া হয়ে গেলে প্রবীরের দিকে প্যাকেটটা বাড়িয়ে দিয়ে বললে: "অ্যাণ্ড ইউ—"

"থাক—" ঠোঁটে একটা করুণ হাসি নিয়ে প্রবীর উঠে দাঁড়াল।

"হুঁ, এখন ওঠা যাক্—" রঞ্জনও দাঁড়িয়ে গেল।

সুদাস একটু হাসলে। কারণ হাসি ছাড়া কোনো কথা বলা আর এখন তাঁর মানায়না।

রঞ্জনকে শ্যামবাজারের বাসে তুলে দিয়ে প্রবীর হাজরার মোড়ে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ! দশটা প্রায় বাজে। এখন বাড়ি ফিরে যাওয়া অনুচিত হবেনা। কিন্তু তেমন কোনো প্রেরণাই যেন প্রবীর মনে খুঁজে পাচ্ছিলনা। বরং একসময় পাগুলো তার উল্টো দিকেই চল্‌তে সুরু করল—ভবানীপুরের দিকে। সুপ্রভার ওখানেই উঁকি দিয়ে আস্‌বে একটু প্রবীর। তাতে হয়ত স্নায়ুগুলো তার একটু উৎসাহ পাবে। ধীরে ধীরে উৎসাহিত হয়ে সুস্থ হয়ে উঠ্‌বে।

হাঁটতে হাঁটতেও প্রবীর সুদাসের কথাগুলোই মনে মনে আলোচনা করে চলছিল। রঞ্জন একটু বিরক্ত হয়ে উঠেছে সুদাসের উপর। বাসে উঠবার আগেও সুদাসকে নিন্দা করেই গেল—কেমন যেন রুক্ষ, অসহিষ্ণু নাকি মনে হ'ল তাকে। কথাটা যে সত্য প্রবীরের চেয়ে কেউ আর তা বেশি জানে না। কিন্তু চারবছর পরে এসে রঞ্জনের চোখে সুদাসের শুধু এ-চেহারাটাই ধরা পড়ল! হয়ত এখন বিচার করতে গেলে আগেকার সুদাসকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা। মার মৃত্যুর পর থেকে কেমন যেন ধারাল শুক্‌নো হয়ে উঠ্‌ছে সে, তার শরীর-মন থেকে মমতার স্নিগ্ধতা যেন বাষ্প হয়ে উবে গেছে। মাকে সত্যি ভালোবাস্‌ত সুদাস—মার মৃত্যুতে তার ভালোবাসা নিরাশ্রয়—তাই ধীরে ধীরে তার মনের মৃত্যু হচ্ছে! সুদাসের প্রতি করুণায় ভরে উঠ্‌ল প্রবীরের মন। জন-বিরল রাত্রির রাস্তায় একা হাঁটতে সুরু করলে মন এম্নি দুর্ব্বলই হয়। এ দুর্ব্বলতাকে প্রবীর মেনে নিল। সুদাস তার বন্ধু। জীবনের অনেকখানি সময় রমণীয় হয়ে উঠেছে সুদাসের সঙ্গ পেয়ে। এ দুর্ব্বলতা সে-মুহূর্ত্তগুলোরই প্রতি কৃতজ্ঞতা মাত্র।

সুপ্রভার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে প্রবীর খানিকটা আশান্বিত

হ'ল—সুপ্রভা না হয় লীলা একজন কেউ আছেই। রান্নাঘর ছাড়া ফ্ল্যাট্-টার অন্য ঘরে আলো নেই—নাইট্-কলে গেছে হয়ত কেউ-কেউ, ঘুমিয়েও পড়তে পারে সবাই।

প্রবীর ঘরে ঢুকে দেখ্‌ল লীলা ঘরে নেই—সুপ্রভা বিছানায় চোখ বুঁজে শুয়ে আছে। কল্ থেকে এসেছে হয়ত এইমাত্র, কালো-পাড় শাড়িটাও বদলায়নি।

একটা শব্দ করবার জন্যেই টেবিলের পাশ থেকে অনাবশ্যক-ভাবে চেয়ারটা খানিকদূর টেনে এনে প্রবীর তাকাল সুপ্রভার দিকে। চোখ-বোঁজা রেখেই ভুরু কুঁচকে সুপ্রভা বল্‌লে: "ঈস্!"

অগত্যা চেয়ারে বসে প্রবীরকে গলার আওয়াজই করতে হল: "তোমার শরীর আজ ভালো নেই নাকি?"

একটু চম্‌কেই সুপ্রভা চোখ মেলে তাকাল: "প্রবীরদা! তোমার কথাই ভাবছিলুম—তুমি হয়ত বা এসে চলে গেছ!" উঠে বস্‌ল সুপ্রভা।

"কিন্তু এ-সময়ে তুমি ওরকম শুয়ে আছ কেন? লীলা কোথায়?" প্রবীরের গলায় আন্তরিকতার চেয়ে মাষ্টারি ভঙ্গীটাই ফুটে উঠল বেশি।

"লীলা কলে গেছে।"

"আর সবাই?"

"আমি কি জানি! দেখে এসো!" জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল সুপ্রভা।

"সারাদিন খেটে এসে মেজাজটাও তোমার ভালো নেই দেখা যাচ্ছে।" প্রবীর হাসতে লাগ্‌ল।

"সারাদিন খাট্‌লে মেজাজ কারো ভালো থাকেনা।"

"মেজাজ খারাপ থাক্‌লেও ক্ষতি নেই কারণ আমি পড়াতে আসিনি। দেখা করতেই এসেছি।"

"রাত দশটায় কেউ পড়াতে আসেনা আমি জানি।"

"তবে আর কি?" প্রবীর আপন মনেই হাস্‌তে লাগ্‌ল: "কিন্তু বলো ত কোন্‌টা তোমার খারাপ—মন না শরীর।"

"জেনে তোমার কি লাভ?"

"জানালে তোমারও ক্ষতি নেই।"

"শরীর-মন সবই আমার খারাপ—একাজ আমি আর করবনা।" কেমন যেন একটু অভিমানের ছোঁওয়ায় সুন্দর শোনাল সুপ্রভার কথাগুলো। তক্ষুণি আর প্রবীর কোনো কথা বল্‌তে পারলনা, তার মন যেন উপভোগ করতে সুরু করল সুপ্রভার কণ্ঠস্বর। সুপ্রভাও মেঝের দিকে তাকিয়ে রইল অপলক যেন প্রবীরের কাছ থেকে নয় দৈবের কাছ থেকেই কোনো একটা আশ্বাস পাবার অপেক্ষায় আছে।

"কি হয়েছে?" প্রবীরের প্রশ্নের পেছনে আশ্বাস শোনা গেল।

"তোমাদের পার্টিতে আমাকে একটা কাজ দেবে, প্রবীরদা—শুধু খাওয়া-পরা আর থাক্‌বার জায়গা দিও।" প্রবীরের মুখের দিকে তাকাল সুপ্রভা কিন্তু চোখে অন্যমনস্কতার ছাপ।

"তা নাহয় হল—"

প্রবীরকে কেটে দিল সুপ্রভা: "একজন নার্সের মুখ থেকে কাজ ছাড়ার কথাটা হয়ত তোমাদের কানে অস্বাভাবিক শোনায়না কিন্তু নার্সের কাজ করি বলে কি কোনোদিকেই আমাদের শান্তি থাকবে না?"

"কিছুই ত বল্‌ছনা তুমি—" অসহায়ের মতো বল্‌লে প্রবীর।

"ভাসুর আমাকে ভাত দেননি—আমারি দুর্ভাগ্যে না কি বিয়ের এক বছর পরে তাঁর ভাই মারা গেছেন। দাদা যদিবা রাজী ছিলেন তাঁর সংসারে আশ্রয় দিতে—বৌদি ক্ষেপে উঠ্‌লেন। খেয়ে পরে বাঁচতে হবে বলেই একাজে এসেছি আমি, তাঁদের গলগ্রহও হতে চাইনি, অভিমানও নেই তাদের উপর। কিন্তু ওঁরা

আমায় এখানেও তাড়া করবে!" কান্নায় দুলে উঠ্‌ল সুপ্রভার শরীর, উবু হয়ে একমুঠো কাপড় চোখে-মুখে চেপে ধরলে সে।

"ওঁরা এসে কেউ উপস্থিত হয়েছেন না কি ?" কঠিন গলায় জিজ্ঞেস করল প্রবীর।

সুপ্রভা মুখ তুল্‌লনা। প্রবীর মনে-মনে ভাব্‌তে সুরু করল এখান থেকে সুপ্রভাকে কোথাও নিয়ে যাওয়া সম্ভব কি না। কোথায় নেওয়া যায় ? কোনো কম্রেড আশ্রয় দিতে পারবে কি ? আজ রাত্রিতেই আশ্রয় করে দেওয়া হয়ত কারো পক্ষে সম্ভব হবে না। হয়ত কিছুটা সম্ভব সুদাসের ওখানে। মুখে যা-ই বলুক সুদাস—বন্ধুত্বের দাবীকে সে অস্বীকার করতে পারবে না, ততটুকু কঠোর এখনও সে হয়ে উঠ্‌তে পারেনি।

"উপস্থিত হননি—" হঠাৎ মুখ তুলে স্বাভাবিক গলায় বল্‌তে চেষ্টা করল সুপ্রভা : "ভাশুর চিঠি দিয়েছেন দাদাকে আমার দুর্ণামে না কি গাঁয়ে মুখ দেখাতে পারছেন না। দাদা লিখেছেন তাই আমাকে, মান বাঁচেনা বলেই না কি আমাকে নিয়ে যেতে কলকাতা আস্‌বেন। আমাদের উপর তোমাদের জুলুমের কবে শেষ হবে বল্‌তে পারো, প্রবীরদা ?"

"যাক্‌ চিঠির সঙ্গেসঙ্গেই যখন এসে উপস্থিত হয়নি, তোমাকে তাহলে ওঁরা সময় দিয়েছেন।" সুপ্রভাকে আশ্বাস দেওয়া নয়, নিজেই যেন আশ্বাস পেল প্রবীর।

"দাদার ওখানে আমি যাবনা। তাই হয়ত এখান থেকেও আমায় চলে যেতে হবে। তুমি আমায় একটা ব্যবস্থা করে দেবে ত প্রবীরদা ?"

"ব্যবস্থা নিশ্চয়ই করতে হবে।" প্রবীর গম্ভীর হয়ে রইল।

"তোমার ত অনেক বন্ধুবান্ধব আছে—তাদের বলে-কয়ে কি আমাকে কাজ নিয়ে দিতে পারবেনা ?—যে কোন কাজ ?"

"ভাব্‌ছি।"

"সেদিন সিনেমায় দেখা হয়েছিল তোমার যে বন্ধুর সঙ্গে—তিনি করে দিতে পারেন না একটা চাক্‌রি ?"

"মহী ?" প্রবীর কয়েক সেকেণ্ড অন্যমনস্ক থেকে বল্‌ল : "চাকরির জন্যে ওর সঙ্গে পরিচিত হবার সাহস আছে তোমার ? তোমাদের ভাগ্য-বিধাতা ক'জন ডাক্তারের মতোই কিন্তু ওর স্বভাব।"

"ও" সুপ্রভা কি বুঝ্‌ল ঠিক বোঝা গেলনা—তারপরই বললে : "আরো ত তোমার অনেক বন্ধুই আছেন।"

"আছেন। দাদার সঙ্গে যদি যেতে না চাও ব্যবস্থা হ'বে একটা।" প্রবীর ভাবতে সুরু করল মহীতোষেরই কথা। সুপ্রভার স্মৃতি থেকে মহীতোষ মুছে যায় নি। খবরটা জান্‌তে পেরে একটু অস্বস্তিই যেন বোধ করছিল প্রবীর। মহীতোষ নিজেকে খুব চমৎকার ভাবে মেয়েদের সাম্‌নে উপস্থিত করতে পারে—সুপ্রভার সাম্‌নেও ঠিক তেম্নি সে উপস্থিত হয়েছিল সিনেমায়। মহীতোষের সঙ্গে যাতে সিনেমার শেষে সুপ্রভার দেখা না হয় সে ব্যবস্থা প্রবীর করেছিল কিন্তু এখন দেখা যাচ্ছে তাতে বিশেষ লাভ হয়নি। ইন্টারভেলের ওই সময়টুকুর দেখাই যে যথেষ্ট হবে—তাতেই যে সুপ্রভার স্মৃতিতে এসে জমা হয়ে থাক্‌বে মহীতোষ, এ ব্যাপারটা আবিষ্কার করে একটু বিষণ্ণই হয়ে পড়ল প্রবীর।

"দাদার সঙ্গে যাবার কোনো প্রশ্ন উঠ্‌তে পারে ভাব্‌ছ না কি তুমি ?" সুপ্রভা যেন একটা ধাক্কা দিয়ে প্রবীরকে সজাগ করে দিলে।

"আমি ভাব্‌ব কেন, তুমিই ভাবো।"

"তুমি যদি দায়িত্ব নিতে না চাও তাহলে ভাব্‌ব।"

একটা বিষণ্ণ হাসি নিয়ে প্রবীর বল্‌লে : "রাগ করে তুমি বাজে কথা বল্‌ছ।"

"কিন্তু তুমি খুব কাজের কথা বল্‌ছ, না ? একবারও কি তুমি

বললে, এখানে আমার আশ্রয় আছে?" অভিমানের চেয়ে রাগটাই প্রখর দেখালে সুপ্রভার ঠোঁটে।

প্রবীর খুসী হয়ে উঠল—সুপ্রভা তার উপরই তাহলে নির্ভর করছে একান্তভাবে। খুসী হয়ে উঠল তার পৌরুষ। প্রবীর নিজের মনের কাছে এ স্বীকারোক্তি করে যে সুপ্রভার ব্যাপারে সে পুরুষ, কম্যুনিষ্ট নয়। সুপ্রভার মনের স্বাধীনতায় তাই সে বিষণ্ণ হয়ে পড়ে—তার পৌরুষ বিষণ্ণ হয়। কিন্তু বিষণ্ণ হওয়ার বাইরে সে আর তার পৌরুষ নিয়েও এগুতে চায়না, কম্যুনিষ্ট মন ততটুকু সংযত তাকে করে এনেছে।

"ক'বার আর বলতে হবে বলো ত—তোমার ব্যবস্থা আমি করে দোব?" খুব উৎসাহ নিয়ে বললে প্রবীর।

"আমায় বাঁচালে প্রবীরদা—" সুপ্রভা ছেলেমানুষের মতো খুসী হয়ে উঠল।

প্রবীর হাস্‌তে লাগল। মন তার দুশ্চিন্তা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠতে চাচ্ছিল—কিন্তু এই ভেবে মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেল্‌ল যে আজ রাত্রিতে অন্তত কোনো দুশ্চিন্তা নেই। আজ রাত্রিতেই সুপ্রভার একটা ব্যবস্থা করতে হলে কি মুস্কিল যে হ'ত তা ভাবতেও এখন বিভীষিকা দেখছিল প্রবীর। সে-বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাওয়া কম আরামের নয়। সেই আরামের চিহ্নই তার হাসিতে ফুটে উঠল। কিন্তু এ তথ্য সুপ্রভা আঁচ করতে পারলেনা—প্রবীরের হাসিকে হাসি হিসেবেই গ্রহণ করে সে-ও হাসি ফুটিয়ে তুলল মুখে: "সত্যি প্রবীরদা—আমার যে কি দুশ্চিন্তা হয়েছিল চিঠিটা পেয়ে—শুধ্‌ ভাবছিলুম কখন তুমি আস্‌বে!"

"তাহলে দেখা যাচ্ছে—" প্রবীর একটা নির্দ্দোষ রসিকতার ভূমিকা করলে: "সস্তা উপন্যাসের নায়কের মতো সময় বুঝে আমি আবির্ভূত হয়েছি!"

"আমাদের সস্তা জীবনে কি আর দামী উপন্যাস তৈরী হয়?—

তোমার অদৃষ্ট খারাপ!" কথাটা বলেই উঠে দাঁড়াল সুপ্রভা— অনর্থক জানালার কাছে গিয়ে এক সেকেণ্ড দাঁড়িয়ে থেকে আবার ফিরে এ'ল। ফিরে এসে দেখতে পেল ঝি এসে দাঁড়িয়ে আছে দরজায়—তার মানে খেতে যেতে হবে। আগের কথাটা মুছে ফেলবার একটা সুযোগ পেয়ে সুপ্রভা তাড়াতাড়ি বলল: "বাড়ি যাও প্রবীরদা—অনেক রাত হয়েছে হয়ত।"

১৭৪০

এক

মিশন রো এক্সটেন্‌শনে দোতলার এক কুঠুরিতে এসে কয়েক ঘণ্টা মহীতোষকে বস্‌তে হয়। ভোরে-পড়া দৈনিক কাগজটা খুলে নিয়ে ক্ষুদে অক্ষরের সংবাদগুলোতে চোখ বুলোয় খানিকক্ষণ—পাশের কামরায় লোক যাতায়াতের শব্দে ঘাড় উঁচু করে তাকায় কেউ এলো কি না। অন্য কেউ না আসুক অন্তত ডাক-পিওন দু'একটা চিঠি নিয়ে আস্‌তে পারে। আর তাহলে অন্তত খানিকক্ষণের জন্যে টাইপ-রাইটারের খট্‌-খট্‌ আওয়াজ করে ঘরের চুপচাপ বিশ্রী আবহাওয়াটা ভেঙে দেওয়া যায়। একটা চিঠির উত্তর দিতে পারা-কেও আজকাল সৌভাগ্য বলে মনে করে মহীতোষ, অফিসের কর্ম্মহীনতা এম্নি বিনয়ী করে তুলেছে তাকে। মনের স্বাভাবিক সৎ চিন্তায় একবার সে ভেবেছিল যে এখন অফিস-পাড়ায় একটা অফিস-ঘর না নিলেও চলে—অফিসের টুকিটাকি যে সামান্য কাজ আছে তা বাড়িতে একটা টেবিলের উপরই করা যায়। কিন্তু চিন্তাকে সৎ রেখে ব্যবসা করা যায়না—অফিস-পাড়ায় একটা অফিস-ঘর না থাকলে সুদাস হয়ত ভেবে বস্‌বে যে তার টাকাটা মহীতোষের সংসার খরচেই মারা গেল। তাছাড়া যদি দৈবাৎ কারো এমন ইচ্ছাই হয় যে 'সোনার বাংলা কটন মিলস্‌'-এর শেয়ারের খোঁজ করা যাক্‌—তখন ছোট হলেও এমন একটা টিপ-টপ অফিসের অগাধ প্রয়োজন। কিন্তু অফিসটাকে টিপ-টপ করতে সুদাসের দেওয়া অনেকটা টাকাই বেরিয়ে গেছে—বাকি যে আছে তা দিয়ে একটা ডিজেল-এঞ্জিন মাত্র হ'তে পারে, তার বাইরে এক জোড়া তাঁতও আর হবেনা। সুদাসের টাকা-টা অবশ্য কোম্পানী অরগেনাইজ করবার জন্যেই—ও ক'টা টাকায় যে মেশিনারি কেনা যায়না সুদাসও তা অনুমান করতে পারে। কিন্তু কোম্পানী কি অরগে-নাইজড হচ্ছে? চেষ্টার ত্রুটি করছেনা মহীতোষ—আগে সে হেলা-ফেলা করত এখন রীতিমতো চেষ্টা করছে শেয়ার ক্যাপিটেল তুলবার

জন্যে। কিন্তু কাজ এগোচ্ছেনা। আমেদাবাদের সুদিন না আসা পর্য্যন্ত কটন মিলসে বিশ্বাস ফিরে আস্‌বেনা কারো। মহীতোষের মনের আর দেহের স্বাস্থ্যে ভাটা পড়তে সুরু করেছে আজকাল—খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাক্‌তেও তার ইচ্ছা হয়, চরিত্রে যে-রোগ তার কোনোদিন ছিলনা। মহিমবাবুর আশ্বাসেও আশ্বস্ত হতে পারেনা সে—রক্তের স্বাভাবিক উৎসাহই যেন নষ্ট হয়ে গেছে।

মাঝে মাঝে প্রণব আসে। তার আবির্ভাব প্রয়োজনীয় না হলেও অবাঞ্ছিত মনে হয়না। অনেকক্ষণ চুপ করে বসে থেকে যখন চিন্তাতে ঝিমুনি লাগে তখন পাওনাদারের আবির্ভাবও প্রীতিপ্রদ। প্রণব পাওনাদার নয়, তার প্রতি তাই কৃতজ্ঞই যেন হয়ে ওঠে মহীতোষ। অনেকক্ষণ পর সিগারেটের বাক্সটাকে স্মরণ করে পকেট থেকে তুলে এনে টেবিলের উপর রেখে দেয়।

"ব্যবসায় ডুবে গেছিস একদম—রোজ এসে অফিসে তোকে ধরতে হয়!" আড্ডার জন্যে তৈরী হয়ে ঘরে ঢুকে প্রণব।

মহীতোষ হাস্‌তে চায় কিন্তু হাসিটা পরিচ্ছন্ন দেখায়না।

"অফিস ফেঁদে বেশ কিছু গুছিয়ে নিচ্ছিস্ ত?" একটা সিগারেট ঠোঁটে তুলে নেয় প্রণব।

মহীতোষ হাসিটা অর্থব্যঞ্জক করে তোলে। তা করা ছাড়া আর উপায় কি? প্রণবের কাছে দৈন্য জাহির করে লাভ নেই—শুধু প্রণব বলে কি, ব্যবসা করতে বসে কারো কাছেই দৈন্য দেখানো চলে না। তাছাড়া এ বৃত্তি তার রক্তেই নেই। শ্যামলীকে সাহায্য করবার সামর্থ্য যে তার ছিলনা এ খবর সে নিজে ছাড়া আর কাকপক্ষীটিও জান্‌তে পায়নি। এমন কি শ্যামলীর তীক্ষ্ণ বুদ্ধিকেও ফাঁকি দিতে পেরেছে মহীতোষ। শ্যামলী হয়ত জানে সুদাস এসে মাঝখানে দাঁড়িয়েছিল বলেই মহীতোষ একটা মহৎ মনোভাবের প্রেরণায় তাদের পথ থেকে সরে গেছে—মহীতোষের আর্থিক অনটনের কথা কল্পনাও করতে পারেনি। আর সুদাস? সুদাসও

কি তার আর তার কোম্পানীর ফুটো থলের খবর জানে? কোম্পানীর টাকা আছে জেনেই কোম্পানীকে টাকা ধার দিয়েছে সুদাস। সুদাসকে জানাতে হয়েছে যে কোম্পানীর টাকা আছে। মহীতোষের চালচলন, কথা বলার ভঙ্গীতে জানাতে হয়েছে। ব্যবসার বা জীবনের আসল কাজই হচ্ছে বিশ্বাস তৈরী করে তোলা বিশ্বাসী হওয়া নয়। খুঁতখুঁতে সুদাসকেও ফাঁকি দিতে পেরেছে মহীতোষ—বেচারী প্রণব ত মনে করবেই মহীতোষ টাকার উপর গড়াগড়ি দিচ্ছে! আধুনিক সাহিত্যিকদের ফ্রয়েড আর যা-ই শিখিয়ে থাকুন টাকার বাজারের রকম-সকম শেখাতে পারেন নি! হাসিটাকে ক্রমে মহীতোষ বুদ্ধিদীপ্ত করে তোলে—এক বছর আগের চেহারায় ফিরে আসে।

"ভীষণ বেনিয়া হয়ে উঠ্‌ছিস্ দিনকে-দিন—" চোখ বুঁজে প্রণব চেয়ারের পিঠে মাথা এলিয়ে দেয়।

"তার মানে?" জোর করে হাসিটাকে ঠোঁটে ধরে রাখে মহীতোষ।

"মানে ত নিজেই বুঝ্‌তে পারছিস্। আমার মুখে কি তা আর বেশি মোলায়েম শোনাবে?"

"তবু?"

"মানে অ্যাব্‌নর্ম্যাল হয়ে উঠ্‌ছিস্ দিনকে-দিন?"

"দ্যাট্‌স্ ইট্—" মহীতোষ খুসী-খুসী চোখে বল্‌লে: "ও কথাটার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম এতক্ষণ!"

প্রণব খানিকটা বোকা হয়ে গেল।

"তোদের চোখে বিয়ে করাটা ত অ্যাব্‌নর্ম্যাল জানি—টাকা রোজগার করাটাও কি না তা-ই জানবার সখ ছিল!"

"ও—" প্রণব চোখা হয়ে উঠ্‌তে চাইল আবার: "কিন্তু তা ত নয়। টাকা রোজগার করা গ্রেট্—কিন্তু টাকা আঁকড়ে থাকা ক্রিমিন্যাল।"

"যেমন বিয়ে করা ভালো কিন্তু বউ-তে আসক্ত থাকা অন্যায়—মতটা তোর একটু সংশোধিত হয়েছে, না?" এতক্ষণ মহীতোষের সিগারেটের পিপাসা এলো ঠোঁটে।

"অনেকটা তাই কিন্তু সবটা নয়।"

"সবটা যে হবেনা তা আমি জানি—কারণ বাক্যটা আমার, তোর নয়।"

"তোর হলেও ক্ষতি ছিলনা যদি সম্পূর্ণ মানে বোঝাত! ভালো মন্দর মতো হেঁয়ালি না বলে বিয়েটাকে একনমিক বলাই ভালো, তার কম বা বেশি ওর কোনো গুণ নেই।"

"যাক্ তবু এ-টা শুভলক্ষণ বল্‌তে হবে। আমরা যারা অ্যাব্‌নর্ম্যাল আছি তাদের চোখে ক্রমেই তোরা নর্ম্যাল হয়ে আস্‌ছিস্!"

"আমিও কল্লোলী-সমাজের সাহিত্যিক নই—রোলাঁর খপ্পরে পড়ে যারা ভাবত বিবাহিত মানুষ অর্দ্ধেক মানুষের বেশি নয়!"

"খুসী হওয়া গেল ক্রমেই অ্যাব্‌নর্ম্যাল্ হচ্ছিস দেখে!"

"অ্যাব্‌নর্ম্যাল!" যেন স্বগতোক্তি-ই করল প্রণব—তারপর চোখ বুঁজে আবার ঝিমিয়ে পড়ল।

সমস্ত মুখে অত্যাচারের চিহ্ন নিয়েও প্রণব এত করুণ দেখাচ্ছিল যে মহীতোষ সঙ্কুচিত হতে সুরু করল। খুঁটিয়ে দেখ্‌লে প্রণবের পোষাককে সম্ভ্রান্ত বলা যায়না, ধুতিপাঞ্জাবীস্যাণ্ডেলের চেহারাটা গরিবানারই স্বাক্ষর। আর যা-ই হোক একটা সৃষ্টিশীল মনের অধিকারী সে—সে-মনের উপর অত্যাচার করে চলেছে দারিদ্র্য। মহীতোষের কাছে আসে প্রণব কয়েকটা মুহূর্ত্তের লোভে—যখন দারিদ্র্যকে মন থেকে মুছে ফেলা যায়। হয়ত সজ্জনের ভাষায় সে মুহূর্ত্তগুলো অসাধু কিন্তু সমাজের ভাষায়ও কি তা তা-ই? সমাজের কি অধিকার আছে এ-কথা উচ্চারণ করবার? মহীতোষের অধিকার আছে? ট্রাউজারের পকেটে হাত চালিয়ে ব্যাগের ওজনটা

বুঝে নেয় মহীতোষ। অনেকদিন বিফল হয়ে চলে গেছে প্রণব আজ আর তাকে বিফল করা যায়না।

মহীতোষ বুঝ্‌তে পারছিলনা প্রণব ঘুমিয়ে পড়েছে কি না। হয়ত ঘুমই হবে—সস্তা কোনো বার্-এ ঢুকে পকেটের পয়সা ক'টা হয়ত খরচ করে এসেছে। ক্লান্তিও হতে পারে—জীবন সম্বন্ধে নিরুৎসাহ হয়ে গেলে যা হয়। প্রণবের কথা খানিকক্ষণ ভাবতে গিয়ে মহীতোষ নিজেই কেমন যেন ছট্‌ফট্ করে উঠ্‌ল। নিজেকে বাঁচাবার জন্যেই যেন কথা বলবার দরকার হল তার।

"কিছু লিখছিস্-টিখ্‌ছিস্ প্রণব, আজকাল ?"

"দশটাকা হারে মাসিক কাগজে দু-একটা গল্প !" চোখ বুঁজে সজাগই আছে প্রণব।

"তোদের আর বেকারদশা ঘুচলনা !"

প্রণব চোখ মেলে সোজা হয়ে বস্‌ল ঃ "দে না রোজগারের দু-একটা ফিকির-ফন্দী বাৎলে।"

"কোথাও পাব্লিসিটি অফিসারের চাকরি নিয়ে নে না !"

"দূর ব্যাঙ্কের লেজারে বরং কাজ করতে পারি, ভাষা-বিদ্যার অসদ্ব্যবহার করা যায়না।"

মহীতোষ চুপ করে হাস্‌তে সুরু করল। প্রণব মিথ্যে কথা বলেনি—কোম্পানীর শেয়ার বিক্রি করার কাজে মহীতোষ পারদর্শী ; তা'বলে কোনো প্রয়োজনেই সে দুপয়সার দাদের মলম ক্যানভাস করতে পারবে না। মানুষের শারীরিক প্রয়োজনটাই কি সব ? মনের প্রয়োজন বলেও ত কিছু থাক্‌তে পারে। প্রবীর হয়ত বল্‌বে শারীরিক প্রয়োজন মিটে গেলেই মন এসে তার প্রয়োজন নিয়ে উপস্থিত হয়, তার আগে নয়। কোন্ দূরবীন হাতে নিয়ে যে প্রবীর এসব কথা বলে মহীতোষ বুঝ্‌তে পারে না ; শরীর আর মনের নেক্-টু-নেক্ রেস চলেছে, কে আগে কে পরে যাচ্ছে তা কি বলা সম্ভব ? কিন্তু অদ্ভুত কথা বল্‌লেও প্রবীরের ভেতর পদার্থ আছে।

মহীতোষ প্রণবকে ছেড়ে দিয়ে প্রবীরের পেছু নিলে। অদ্ভুত কাজ করবার সাহস আছে প্রবীরের—সুপ্রভাকে বিয়ে করল ত সে। তার জন্যে বাড়ি ছেড়ে আস্‌তে হ'ল তবু। মহীতোষ টাবু-মুক্ত বলে নিজেকে ঘোষণা করে কিন্তু মহিমবাবুকে কি সে অমান্য করতে পারত? এই যে আধুনিক সাহিত্যিক প্রণব—বিয়ে সম্বন্ধে অনেক থিয়োরীই কপচায়—তারও ক্ষমতা নেই এধরণের বিয়েতে এগিয়ে যেতে!

"তোর স্ত্রী কোথায়, প্রণব? এখনো দাদার ওখানেই?" মহীতোষের গলায় একটু ঠাট্টার রুক্ষতা শোনা গেল।

"দাদার ওখানেই, রাজসাহীতে। আমার পক্ষে বিয়েটা একনমিক হলনা।" প্রণব দ্বিতীয় সিগারেট হাতে তুলে নিল।

"দাদার ইচ্ছেয় যখন বিয়ে করেছিস, দাদার ওখানেই ত থাক্‌বে!"

"দাদার ইচ্ছেয় বিয়ে করেছি মানে? ইচ্ছেটা আমার, ঘটকালি মাত্র দাদার।"

"সে যা-ই হোক—সুপুত্র হবার কথাটাই বল্‌ছি, যথানিযুক্তোস্মি তথা করোমি!"

"ওত সুপুত্রের লক্ষণ নয়, সুমনার লক্ষণ। যে কোন একটি মেয়েকে ভালোবাসার মতো মন রাম-শ্যাম হরির থাক্‌তে পারে না।"

"সুমনা না বলে মানুষটাকে কি এ বলা যায়না যে ডাল হলেও তার চলে, অম্বলেও আপত্তি নেই, ঝাল হলে বা মন্দ কি, দই-ও খারাপ নয়। অর্থাৎ মনের একটা নিদারুণ হীন অবস্থা থেকে ভুগছে মানুষটা।"

"মনের উচ্চ অবস্থার লক্ষণটা কি?" প্রণবের হাসিতে মেধাবীর চিহ্ন ফুটে উঠল।

"উচ্চ অবস্থার খবর জানিনে—স্বাভাবিক অবস্থার কথা বলতে পারি। যে মেয়েকে জানি আমার ভালো লেগেছে তাকেই মাত্র বিয়ে করা যায়—মনকে গলা ধাক্কা দিয়ে বলা যায়না অমুক মেয়েকেই ভালো লাগাতে হবে।"

"তুই যাকে গলাধাক্কা বলছিস তার নাম সুবিবেচনাও হতে পারে।"

"পেনালকোড ও হতে পারে!"

প্রণব অস্বাভাবিক শব্দে হেসে উঠল! কথার সার্থকতায় খানিকটা উত্তেজিত দেখাল মহীতোষকে। ঘাড় কাৎ করে সিগারেটের ছাই-টা ঝাড়তে সুরু করে প্রণব বললেঃ "জীবনটা পুরোদস্তুর রোমান্টিসিজম্ নয় আবার পুরোদস্তুর গদ্যও নয়। জীবনটা রবীন্দ্রনাথের গদ্যকবিতার মতো। শেলীবায়রণের মতো মনের নৈরাজ্যও সেখানে চলেনা—কল্লোলী সাহিত্যের মতো শরীরের নৈরাজ্যও সেখানে অচল। মন আর শরীরকে পাশাপাশি যদি স্বধর্ম্ম বজায় রেখে চলতে হয় তাহলে আমাদের কাছ থেকে জীবন আবেগ, মেধা আর সুবিবেচনা এই তিনটি বস্তু দাবী করে বসে। $33\frac{1}{3}\%$ করে এই তিনটি বস্তুই আমাদের থাকা চাই—এ পরিমাণের বেশি-কম হয়ে গেলেই মুস্কিল।—মানে আমার ভাষায় অ্যাব্‌নর্ম্যাল।" সশব্দ হাসিতেই প্রণব তার বক্তব্য শেষ করল।

প্রণবের মুখে অ্যাব্‌নর্ম্যাল কথাটা শুনেও মহীতোষ কোনোরকম উত্তেজনা অনুভব করতে পারলনা এমনকি তার আগেকার উত্তেজনাও কেমন যেন শিথিলতায় ঠাণ্ডা হয়ে গেল। প্রণবের কথাগুলোর উত্তরে কোনো কথা মহীতোষের মন খুঁজে পাচ্ছেনা আর তাই যেন সমস্ত শরীর তার অবশ, সঙ্কুচিত হয়ে যাচ্ছে। খানিকক্ষণ আগে প্রণবকে করুণা দেখাতে গিয়ে যে-মন ফুলে ফেঁপে উদার হয়ে উঠেছিল—মহীতোষ অনুভব করল—তাতেও একটা ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপটা এসে লাগছে। কয়েকটা মুহূর্ত্ত। তারপরই মহীতোষ যে-কে-সে হয়ে উঠল। জীবন বা সাহিত্য নিয়ে সূক্ষ্ম তর্ক করবার ক্ষমতা আছে এমন অভিমান তার নেই। একটু আগে সে-তর্কে ঢুকে পড়েছিল বলে এখন সে মনে-মনে বরং হেসেই উঠল।

বারান্দায় ভারি জুতোর আওয়াজ। এ-আওয়াজে অভ্যস্ত

নয় মহীতোষ। স্যাণ্ডেলের পাতলা সোল টিপে এ-সময়ে পাশের কোম্পানীর বেয়ারা এসে উপস্থিত হয়—মহীতোষের ঘর বন্ধ করে 'সোনার বাংলা কটন মিলস্'-অফিসের ডিউটি শেষ করে। একটা আস্ত বেয়ারার কাজ নেই অফিসে—তাই এই প্রতিবেশীর শরণ নিয়েছে মহীতোষ। বুড়ো তেওয়ারী কাঁচা চামড়ার ওজনদার নাগ্রাই পরলেও এতোটা আওয়াজ করতে পারবেনা। প্রণবের ব্যাপারে অমনোযোগী হয়ে মহীতোষ আওয়াজটাতে মনোযোগ দিলে। মহীতোষের ঔৎসুক্যে প্রণবকেও উৎসুক হ'তে হল।

সুদাস। দরজায় কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে দাঁড়াল তারপর স্মার্ট দেখাবার কানুন অনুসারে একটু বাঁকা ভঙ্গীতে এসে ঘরে ঢুক্‌ল। খুব বেশি অবাক হলনা মহীতোষ বরং খানিকটা শুকিয়ে উঠল। আরো দু-একদিন সুদাস এসেছে—পাওনার কথা মুখেও আনেনি—এসেছে খানিকক্ষণ গল্প করে যেতেই। কিন্তু মহীতোষ খুব খোলাখুলিভাবে গল্পে যোগ দিতে পারে নি—সুদাসের ঠোঁটের প্রত্যেকটা ছোট হাসিতে কেমন একটা আশঙ্কা বোধ করেছে, সুদাসের পুরাণো সিনিক গাম্ভীর্য্যে সন্ত্রস্ত হয়ে গেছে।

প্রণবের সঙ্গে সুদাসের পরিচয় নেই। পরিচয় করিয়ে দেবার সুযোগে মহীতোষ চোখে-মুখে, গলার স্বরে খানিকটা স্বাভাবিক হয়ে উঠতে চেষ্টা করল। মহীতোষের মুখে প্রণবের খ্যাতির কথা শুনে সুদাস ভদ্রতার খাতিরেও খানিকটা উৎসুক হতে পারত। ভদ্রতা সে করল কিন্তু তাতে ঔৎসুক্য ছিলনা।

"আমি দুঃখিত, আপনার কোনো বই আমার পড়া নেই।" একটা অন্যমনস্কতার ভাব নিয়ে সুদাস বল্‌লে: "আধুনিক সাহিত্য কিছু-কিছু আমি পড়ি—এমন কি আপনাদের আধুনিক কবিতা পর্য্যন্ত।"

"আপনাকে তাহলে আধুনিক সাহিত্যের খুব ভালো পাঠক বলতে হয়!" একটা বিনীত হাসি মুখে নিয়ে প্রণব উঠে দাঁড়াল।

"তা কি করে বললেন! দেখলেন ত আপনার বই-ই আমি পড়িনি!"

"অনেকগুলো বই ত আমার নেই কাজেই পাঠকমাত্রেই আমার কোন-না-কোন বই পড়তে বাধ্য এমন ব্যবস্থাও নেই।" প্রণব একটু থেমে নিয়ে মহীতোষের দিকে তাকিয়ে বললে: "আজ চলি।"

প্রণবকে যেতে দিতে মহীতোষের আপত্তি ছিলনা, সুদাসের সামনে তৃতীয় ব্যক্তিকে নিয়ে বসে থাকতেই বরং তার আপত্তি।

"আধুনিক সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মতো পাঠকদের একটা নালিশ আছে—" প্রণবের কানে কথাটা পৌঁছিয়ে দিতে না পারলে সুদাস যেন শান্তি পাচ্ছিলনা: "দেশের আর্থিক আর রাষ্ট্রিক জীবনটা বাদ দিয়ে আপনারা সাহিত্য-সৃষ্টিতে লেগে গেছেন!"

"তাই নাকি?" সুদাসের ধরণের হাসিতেই সুদাসকে জবাব দিয়ে প্রণব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু মহীতোষের মন থেকে তক্ষুনি সে মুছে গেলনা। প্রণবের সঙ্গে সন্ধ্যাটা কাটাবে আজ ভেবেছিল মহীতোষ—তার নিজের প্রয়োজনে নয়, প্রণবেরই প্রয়োজনে। সে-কথাটা মনে পড়েই একটু যেন থিঁতিয়ে গেল সে। কয়েকঘণ্টার জন্যেও খুসী হয়ে বেঁচে উঠতে পারত প্রণব। এযুগে ত স্বাভাবিক উপায়ে খুসী হওয়া যায়না, জোরজবরদস্তি করে খুসী হয়ে উঠতে হয়।

"তারপর?" খুসী-খুসী মুখে সুদাস একটা সিগারেট তুলে নিল।

"বলো—তারপর কি?"

"যুদ্ধটা কেমন ছড়িয়ে পড়ছে?"

"এগিয়ে আস্‌ছেও বলা যায়!"

"দূর!" সুদাস সিগারেটের ধোঁয়ায় বক্তৃতার মেজাজ তৈরী করে নিলে: "নাৎসী একনমিক্সের ক্ষমতা নেই অনেকদিন যুদ্ধ চালিয়ে য়ুরোপের পর এশিয়ায় ধাওয়া করে। তবে এটুকু বলার

আছে যে রণ-হুঙ্কারটা ওদের আগাগোড়াই 'শো' নয়, যুদ্ধ করবার ক্ষমতা আছে।"

"কিন্তু ফরাসীর পতনে ত এখানকার মরেইলও অধঃপাতে যাচ্ছে। টাকা যাদের আছে হারানোর ভয়ে পায়রার মতো গলায় থলে করে টাকা ঢুকিয়ে রাখতে চায়!"

"স্বাভাবিক। যুদ্ধের দরুণ যে নয়, চিরকালই যে ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত এই ফিলসফিটাই এখন ব্যবসায়ীদের প্রচার করতে হবে।"

"তোর ব্যাঙ্কের পজিশন ত প্রায় সিকিওর।" সুদাসের নিরুদ্বিগ্নতায়ই কথাটা আন্দাজ করল মহীতোষ।

"যে-রাষ্ট্রবিপ্লবের হিড়িক চলছে, ব্যাঙ্কের পজিশন সিকিওর হতে পারেনা। কয়েকটা ব্রাঞ্চ খুলেছি মফঃস্বলে, ওরা ভালো কাজ করছে—এ পর্য্যন্তই বলা যায়!"

সুদাস যে-পর্য্যন্তই বলুক, মহীতোষ অনেকদূর পর্য্যন্তই ভেবে নিল। সেই উদাসীন সুদাস জীবনকে তুমুলভাবেই আঁকড়ে ধরেছে। জীবনের ঝুঁটিত মহীতোষও আঁকড়ে ধরেছিল, মুঠো তার আল্‌গা হয়ে গেল কেন? হয়ত এই অফিসটার জন্যে। দিনের পর দিন এই একটা উৎসাহহীন অফিসঘরের চেহারা দেখতে হয় বলেই হয়ত। অক্লান্তভাবে আবার মহীতোষ টইটই করতে সুরু করবে, ক্লান্তি এলে আছে ফারপো, আছে ক্যাসানোভা —ব্যাঙ্কের ওভার-ড্রাফট্ লিমিট পার হতে কয়েকটা হাজারের ঘর আরো টপকাতে হবে। এ করেও যদি কয়েকটা ভারি ওজনের শেয়ার বিক্রি করে ফেলা যায় ত কোম্পানী দাঁড়িয়ে গেল। যে-উপায়েই হোক কোম্পানী দাঁড়িয়ে গেলেই হ'ল— কি করে দাঁড়াল সে খোঁজ কেউ করেনা, দাঁড়াল কিনা তা-ই ছাখে। সুদাস যদি তার ব্যাঙ্কের অবস্থা ফিরিয়ে দিতে পারে, মহীতোষ কয়েকটা তাঁত কিনবার টাকা যোগাড় করতে পারবেনা?

নিশ্চয়ই পারবে। একটা বিশ্রী ভয়ের তাড়া খেয়ে মরছে এতদিন। অনর্থক মরছে। ব্যবসাতে আসল কথাই হচ্ছে সাঃ —সাধুতা নয়, সাবধানতা নয়, সচ্চরিত্রতা নয়, শুধু সাহস আর সাহসের বিজ্ঞাপন। তোমার সাহস যে জয়যুক্ত হচ্ছে তারই বিজ্ঞাপন।

"চুপ করে আছিস্ কেন ?" অনেক রকম মানে করা যায় এম্নি এক-ধরণের হাসি হেসে চলছিল সুদাস: "ভীষণ পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে তোর, চুপ করে থাকিস্—সাহিত্যিকের সঙ্গে আড্ডা দিস্, কোনোটাইত তোর সাবেকী চালচলনের মধ্যে নয় !"

এক মিনিট আগের প্রতিজ্ঞাটা মনে-মনে স্মরণ করে মহীতোষ খানিকটা সাবেকী হতে চাইল: "তুই ভুলে যাচ্ছিস্ প্রণব আধুনিক সাহিত্যিক, মধুসূদনের ট্র্যাডিশনের মানুষ, ভূদেবী-সংস্কার ওর মধ্যে নেই !"

"গু-ড" সুরে টেনে আওয়াজটাকে একটু বিলম্বিত করে তুল্‌ল সুদাস: "আশ্বস্ত হওয়া গেল। তোর জন্যে একটা দুশ্চিন্তাই হয়েছিল আমার। জান্‌তুম মানুষের ফাণ্ডামেণ্টাল বদলায়না— তোকে দেখে সে-ধারণা পাল্টে যাচ্ছিল !"

"তোর ফাণ্ডামেণ্টালে কিন্তু পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে !"

"না—এটাই আমার আসল রূপ, মাঝে তোরা যা দেখেছিস্ ওটা মেঘাবৃত অবস্থা।"

"হবে।"

"বিশ্বাস হলনা ?"

"বিশ্বাস করতে বললে বিশ্বাস হবেনা কেন ?"

"ততটা শ্রদ্ধাবান ছাত্র না হয়ে এম্নিতে বিশ্বাস হয়না ?"

"হওয়া কঠিন।"

সুদাস হাসিতে ফেটে পড়তে চাইল। সঙ্গে সঙ্গে মহীতোষকেও নিঃশব্দে একটু হাসতে হল।

"প্রবীরের সঙ্গে তোর দেখা হয়, মহী? অনেকদিন আমার সঙ্গে ওর দেখা নেই।" হঠাৎ হাসি থামিয়ে সুদাস বললে।

"কম্যুনিষ্ট মানুষ, আমার সঙ্গে দেখা হবে কোন্ সুবাদে?"

"ওর বাড়ির নম্বরটা জানিস্?"

"কম্যুনিষ্ট হলেও আমাকে ও বাড়ির নম্বর জানাবেনা।"

"মেয়েটিকে তুই চিন্‌তিস?"

"চিনতুম না, দেখেছি একদিন!"

"প্রবীরের উপর যা-কিছু রাগ ছিল আমার, এ-ব্যাপারটার পর সব ভুলে গেছি।"

"ভালো।" এবার মহীতোষের হাসিটা রহস্যময় হয়ে উঠল।

হাসিটা লক্ষ্য করলেও তার দিকে মনোযোগ দিতে পারলনা সুদাস—রাস্তায় মোটরের হর্ন বাজছিল সেদিকেই মনোযোগ দিতে হল তাকে—কোটের আস্তিন তুলে ঘড়িটাতে একটু চোখ বুলিয়ে সুদাস বললেঃ "চলি আজ। আর আস্‌বনা তুই একদিন আমার অফিসে না গেলে।"

"তোর গাড়ি ডাক্‌ছে বুঝি?" মহীতোষের ঠোঁটে রহস্যের রেশ-টুকু লেগে আছে।

"হ্যাঁ, ড্রাইভারকে বলেছিলুম পাঁচটা অবধি এখানে থাকব।" সুদাসের প্রস্থানটাও খুব সপ্রতিভই দেখাল।

পাঁচটা বেজেছে। মহীতোষও হাতের ঘড়িটার দিকে একবার তাকাল। পাঁচটা অবধি এখানে থাকার কথা ছিলনা। প্রণবকে নিয়ে আগেই বেরিয়ে গেলে পারত। তাতে আরেকটা লাভ ছিল—সুদাসের সঙ্গে দেখা হতনা। অনেক কথাই বল্‌ল সুদাস কিন্তু শ্যামলীর নামটা পর্য্যন্ত ওর মুখ থেকে বেরুলনা! সুদাসের টাকায়ই শ্যামলী পোষ্ট-গ্রাজুয়েটে পড়ছে—মহীতোষের টাকায়ও পড়তে পারত! অন্তত পড়ার কথা ছিল! শ্যামলীকে পাওয়ার কৃতজ্ঞতা জানাতেই হয়ত সুদাস কালেভদ্রে এসে মহীতোষের

সঙ্গে দেখা করে যায়। সেই কৃতজ্ঞতায়ই হয়ত টাকাটাও দিয়েছে তাকে! কিন্তু সুদাসের তাতে অপরাধ কি? টাকা ধার নেওয়ার সময় শ্যামলীকে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবার কথা মহীতোষেরই ত মনে হয়েছিল। আজ আর তার জন্যে অনুতাপ করে কি হবে?

ছোট্ট একটু আওয়াজ করে পেপার-ওয়েটটা টেবিলের উপর চেপে ধরল মহীতোষ। তারপর উঠে দাঁড়াল। তেওয়ারী এখনো আস্‌ছেনা কেন? না কি এসে আগেই কয়েকবার উঁকি দিয়ে গেছে! ওর খোঁজ করতে হয়।

বোর্ডিংএর কমনরুমে সুদাসের জন্যেই যেন অপেক্ষা করছিল শ্যামলী আর সুদাসের মোটরও বোর্ডিং-এর গেটে গিয়ে কয়েক-সেকেণ্ড দাঁড়াল যেন একটা ছোঁ মেরেই শ্যামলীকে তুলে নেবার জন্যে। ড্রাইভার আনকোরা অযোধ্যার মানুষ, তার উপস্থিতিকে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রাহ্য করে কথা বলা যায়।

"প্রায় একঘণ্টা আমি অপেক্ষা করছিলুম!" খুসীতে মুখটা মসৃণ করে তুল্‌ল শ্যামলী।

"আমি কিন্তু মিনিট দশেক মাত্র লেট!"

"ঈস্‌, ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় চল্‌তে হয় আর কি!"

"কি করব, ব্যবসায়ী মানুষ ত!"

"থাক্ আর বাহাদুরী করতে হবেনা!" শ্যামলী সীটের পিঠে মাথা এলিয়ে দিল, সুদাসের একটা হাত সেখানে ছড়িয়ে আছে জেনেই হয়ত।

"কোম্পানীর চাকরের আবার বাহাদুরী কি বল!" একটু কাৎ হয়ে শ্যামলীর মুখোমুখি হল সুদাস।

"চাকরের বাহাদুরীর কথা ত বলিনি—ম্যানেজিং-ডিরেক্টরের বাহাদুরী—ঈস্ তোমার চাকরির নামটা এতো বড় আর বিদঘুটে—" ভুরু কুঁচকে মুখে অসন্তোষ ফুটিয়ে তুলতে চাইল শ্যামলী।

সুদাস চুপ করে রইল, চোখে তার একটা নিবিড় হাসি—শ্যামলীর মুখের প্রত্যেক রেখায় সে-হাসি বুলিয়ে যাচ্ছিল সুদাস। এসময়েই হয়ত মেয়েদের চোখে তন্ময়তা আসে। আঙুল দিয়ে মুখের উপর থেকে চুল সরিয়ে দিয়ে শ্যামলী বল্‌লে: "ঘুম পাচ্ছে।"

"বেশ ত, ঘুমাও।"

"তোমার ঘুম পাচ্ছেনা ?"

"না।" সে-হাসিই হেসে চলেছে সুদাস।

"আবোল-তাবোল বকতে ইচ্ছে করছে—" মাথাটা উঁচুতে তুলে সুদাসের হাতের উপর নিয়ে গেল শ্যামলী।

"কেন ?"

"কি জানি !"

"জানো না বুঝি ?" সুদাস অন্যমনস্ক হয়ে গেল—শ্যামলীর চুল তার হাত ছুঁয়ে-ছুঁয়ে যাচ্ছে—হাওয়ার মতো হাল্কা সে-স্পর্শ। কিন্তু রক্তে তার অনুভব তুমুল, অসহ্য।

"কাল তোমার ওখানে থাক্‌ব, না ?" ঘুম-ভাঙা পাখীর কাকলির মতো শোনাল শ্যামলীর কণ্ঠ।

"কাল আমারও ছুটি—ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় ছুট্‌তে হবেনা।" শ্যামলীর মুখে মনোযোগ ফিরিয়ে আন্‌ল সুদাস।

"সারাদিন তুমি আর আমি !"

"সাঁধুও অবিশ্যি।"

"সাঁধু ত ওর মতোই···" শ্যামলী থুত্‌নি উঁচিয়ে ড্রাইভারকে দেখাল: "পেছন ফিরে আমাদের দিকে তাকাবেনা।"

দুজনেই হেসে উঠ্‌ল ওরা ছোট ছোট শব্দের ঢেউ তুলে। শ্যামলীর দেহের নরম নিটোলতার অদৃশ্য ঢেউ সুদাসকে চারদিক থেকে জড়িয়ে ধরে—ওর শ্যামল স্নিগ্ধতা মুঠো মুঠো ছায়ার মতো করে কে যেন সুদাসের গায়ে ছড়িয়ে দেয়। সুদাস ঘুমিয়ে পড়তে

পারে ! শ্যামলীর যেমন ইচ্ছা করছিল ঘুমুতে ঠিক তেম্নি ঘুম পাচ্ছে সুদাসেরও।

"তোমার বন্ধুরা কেউ যদি কাল তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসে ?" শ্যামলীর মন কালকের দিন-রচনায় ব্যস্ত।

"আমার নতুন ফ্ল্যাটের খোঁজ বন্ধুরা রাখেনা।"

"কেন ?"

"বন্ধুরা দূরে সরে যাচ্ছে।"

"আমি কাছে এসেছি বলে ত ?" বিষণ্ণ হয়ে উঠ্‌ল শ্যামলীর মুখ।

"তা কেন ?"

"তা-ই। তোমার বন্ধুদের উপর আমি অবিচার করছি।"

"তেমন অবিচার কাউকে কোনদিন করতেই হ'ত।"

"সে-কেউ হয়ত আমার চেয়ে ঢের ভালো হত।" মনে-মনে সুদাসের সঙ্গে একটা ব্যবধান তৈরী করে চলছিল শ্যামলী।

"কি করে জানো ?" অসহায়ের চোখ নিয়ে তাকাল সুদাস।

"আমার মতো জোর করে ত সে আসতনা !"

"নিজেকে এমন মনে কর কেন তুমি !"

"মনে হয়।" শ্যামলীকেও, মনে হল, অসহায়।

"কিন্তু তাতে আমার মনে ত লাগ্‌তে পারে।"

সুদাসের দিকে তাকাল শ্যামলী মমতাময়, ছায়াচ্ছন্ন চোখে। সুদাস সত্যি ব্যথিত হয়েছে, শ্যামলী জানে এধরণের কথায় ব্যথিত হয় সুদাস। তবু এধরণের কথা না বলে সে পারেনা। সুদাসকে ব্যথা দেবার জন্যে নয়, নিজেকে উন্মুক্ত করে তুলবার জন্যেই। সহজ স্বাভাবিক পথে পরিচিত হয়ে সুদাসকে ভালোবাসবার সুযোগ তার হয়নি—তাই ছোট্ট একটা ক্ষতের সামান্য একটু অস্বস্তি মাঝে মাঝে এসে শ্যামলীর মনে উঁকি দেয়। এ-অস্বস্তি হয়ত মহীতোষের বেলায় তার থাকৃতনা। সুদাসকে ভালোবাসে বলেই এ-অস্বস্তি

তার। সীটের পিঠ থেকে শ্যামলী মাথা তুলে এনেছিল একটু আগে—আবার সে নিজেকে এলিয়ে দিল সুদাসের হাতের উপর।

শ্যামলীর মনের উপর একটু-একটু মেঘ উড়ে যাওয়াটাকে সুদাসের ভালোই লাগে। নিজেকে খানিকক্ষণ ব্যথিত করে রাখতেও ভালো লাগে তার। আনন্দের একটানা ছোট ছোট সোনালী মুহূর্ত্তগুলোতে ব্যথার একটু ম্লান ইঙ্গিত যদি ছায়া ফেলে না যায় তাহলে আনন্দ নিটোল হয়ে ওঠেনা। সুদাস অনেক সময় ভাবে আমাদের ব্যথাগুলো-ও হয়ত আনন্দেরই একটা নতুন চেহারা। অনুভবের একটি তার বেজেই আনন্দ আর ব্যথা তৈরী হয়। তাই মার মৃত্যুতে, সুদাস বুঝতে পারেনি, ব্যথিত না আনন্দিত হয়েছিল সে।

"আমাকে তোমার ভালো লাগে ?" ছেলেমানুষের মতো হঠাৎ জিজ্ঞেস করল শ্যামলী।

সুদাস হাস্‌ল।

"হাস্‌ছ কেন, বলো !" ছেলেমানুষের আব্দার এলো শ্যামলীর গলায়।

"ভালো লাগেনা বলে মনে হয় তোমার ?"

"না।" আস্তে-আস্তে মাথাটা দুলিয়ে বল্‌ল শ্যামলী : "মনে হয় একদিন হয়ত ভালো লাগবেনা।"

"শেষের কবিতার লাবণ্যেরও তাই মনে হয়েছিল।"

"লাবণ্যের যা-খুসী মনে হোক—বলো, সবসময় ভালো লাগবে আমাকে ?"

সুদাস শ্যামলীর চোখের দিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ তারপর গোপন-কথা বলার মতো করে বললে : "সব সময়।"

আর কিছু বললেনা শ্যামলী। চোখ বুঁজে এলো তার—ঠোঁটে হাসি নয়, হাসির চেয়ে অস্পষ্ট একটা স্নিগ্ধতা ফুটে উঠল। অপরূপ দেখাতে লাগল শ্যামলীকে। সুদাস তাকে এর চেয়ে সুন্দর

কোনোদিন আর দেখতে পায়নি। আশ্চর্য্য হয়ে যেতে হয়—এই শ্যামলীকেই যে কোনসময় অন্যরকম দেখায়! বিশ্বাস করা যায়না। সুদাস কিছুতেই ভাবতে পারেনা, এই শ্যামলীই একবছর আগেকার শ্যামলী ছিল—কার্জ্জন পার্কের শ্যামলী, তার-ফ্ল্যাটে-হঠাৎ-হাজির-হওয়া শ্যামলী!

"জানো আমার কি মনে হয়—" স্বপ্ন জড়িয়ে এসেছে শ্যামলীর গলায়ঃ "গাড়িটা যদি এম্নি সবসময় চলতে থাক্‌ত—যদি থাম্‌তে না হতো আমাদের—ব্রাউনিং-এর মতো মনে হচ্ছে আমার। আমরা পারিনে অনেকদূর চলে যেতে—যেতে-যেতে যেখানে গিয়ে দেখব তুমি আর আমি ছাড়া আর কেউ নেই?"

"হুঁ—" শ্যামলীর গলার সুরের সঙ্গে সুর মিলিয়েই বল্‌লে সুদাস তারপর হঠাৎ সচেতন হয়ে উঠল পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে। চৌরঙ্গী ছাড়িয়ে এসেছে তারা অনেকক্ষণ। কিন্তু আশ্চর্য্য, চৌরঙ্গীর রোদ আর শব্দ যে তার গাড়িতে এসে কখন ঠিক্‌রে গেছে সে তার কিছুই জানে না। তার চারদিকে ঘিরে ছিল শ্যামলীর চোখের কালো রশ্মি—আর হয়ত ফুল-ফোটারই শব্দের মতো শ্যামলীর কথার শব্দ। সুদাস এখন দেখছে ভবানীপুর পার হয়ে গাড়ি কালিঘাট পার হয়ে যাচ্ছে—দু-তিন মিনিট পরেই বালিগঞ্জে তার নতুন ফ্ল্যাটের সাম্‌নে গিয়ে দাঁড়াবে গাড়ি।

"এমন হয় না?" শ্যামলী জিজ্ঞেস করল।

"এমনই ত হবে।" সুদাসের গলায় একটু বাস্তবতার সুর শোনা গেল।

"এমন কি হ'তে পারে?"

"পারে না?"

চোখ মেলে তাকাল শ্যামলী। সুদাসের মনে হ'ল একটি ফুল ফুটে আছে আর তা এতো সুন্দর দেখতে যে ছিঁড়ে নিতে ইচ্ছে হয়।

সুদাসের নূতন ফ্ল্যাটেও ঘরের ছড়াছড়ি নেই। একটি ছোট বস্‌বার ঘর—সেটি, টেবিল আর গদীআঁটা ছোট একটা চৌকিতেই ঘরটা আকণ্ঠ হয়ে আছে—বই-এর ক্ষুদে আলমারীটা সেখানে অনধিকার প্রবেশ করেছে মনে হয়। শোবার ঘর এমন নয়—হাতপা ছড়িয়ে সেখানে শোয়া যায়—পায়চারি করবারও ঢের জায়গা আছে। অবিবাহিতের শোবার ঘরে পায়চারির একটু জায়গা থাকা খুবই দরকার—কারণ অনিদ্রায় সে-জায়গার ব্যবহার চলে পায়চারি করে আর দৈবাৎ বিয়ে করে ফেললে স্ত্রীর শোবার ব্যবস্থা হয় সে-জায়গা জুড়ে। সুদাসের খাট, একটা টি-পয়, টেবিল, দুটো চেয়ার, বেত-মোড়া বিপুলকায় একটা স্যুটকেশ আর একটা আলনা ঘরের আসবাব—তবু সেখানে অঢেল জায়গা পড়ে আছে। এই অঢেল জায়গা থাকা ছাড়া সুদাসের অবিবাহিত্বের আর কোনো চিহ্ন ঘরের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যাবেনা—আসবাবগুলো নিখুঁত গোছানো, টেবিলে আর আলনায় একটু উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। এতে সীধুর হাত যতখানি, সুদাসের হাত তার চেয়ে ঢের বেশি।

"আমাকে না হলেও তোমার চলে।" একটা চেয়ারে বসে পা দোলাচ্ছিল শ্যামলী। খাওয়ার হাঙ্গামা চুকে গেছে। সীধু তার তল্পি নিয়ে নীচের সিঁড়ি কোঠায় বসে এখন হয়ত বিড়ি ফুঁকছে।

"কেন?" মুখোমুখি আরেকটা চেয়ারে বসে আছে সুদাস।

"তোমার চেয়ে ভালো করে আমি ঘর গুছিয়ে রাখতে পারবনা।"

"এ-ব্যাপারে আমি খানিকটা লরেন্সীয়। লরেন্স বন্ধুবান্ধবদের নিজের হাতে রেঁধে পর্য্যন্ত খাওয়াতেন—ততটা আমি পারবনা।"

"আমাকে দিয়ে তোমার কোনো দরকার নেই—মিছিমিছি একটা বোঝা হয়ে থাক্‌ব তোমার—" শ্যামলী হাস্‌ছিল, কেমন নির্জীব যেন সে-হাসি।

"ঘর গুছিয়ে রাখবার জন্যেই কি তোমাকে আমার দরকার?"

"না—" শ্যামলী বুঝতে পারছিল সুদাস ব্যথিত হতে সুরু

করেছে : "কিন্তু গুছিয়ে রাখাও আমার উচিত। আমি কোনো কাজেরই নই। দেখো তুমি ঠক্‌বে।"

নিজেকে নীচের দিকে টেনে নেবার যে একটা স্রোত বইতে সুরু করেছিল শ্যামলীর মনে তা থেকে মুক্তি পাবার চেষ্টায় একটু হাল্কা হয়ে উঠ্‌ল সে এখন। তাই আবারও বল্‌লে : "শেষটায় দেখবে আমি একটা সাধারণ মেয়ে!"

"আসাধারণ মেয়েরই যে আমার দরকার একথা তোমায় কে বলেছে?" টেবিলের উপর একটা সিগারেট ঠুক্‌তে সুরু করল সুদাস।

"সাধারণ মেয়ে ত অনেক ছিল!"

"ছিল। সেই অনেক থেকেই একটিকে বেছে নিয়েছি—একটিকে ত নিতে হবে?—সেটি না-হয় তুমিই হলে!" হেসে উঠল সুদাস। শ্যামলীও হাস্‌তে লাগলো।

"আমি কিন্তু সিগারেট খাবো এখন।" নিজের গলার স্বরে নিজেই যেন অবাক হয়ে গেল সুদাস। এমন স্বর অনেকদিন হল তার কথা থেকে মুছে গেছে। কবে, কখন এমন স্বর ছিল তার?

"কেউ সিগারেট খেতে থাক্‌লে গন্ধটা আমার বেশ লাগে।" শ্যামলী টেবিল থেকে নেইল-কাটারটা তুলে নিয়ে নখে মনোযোগ দিলে।

স্মৃতি থেকে তুলে নিয়ে এলো সুদাস কবে, কখন এমন স্বর ছিল তার : "তুমি ঘুমিয়ে থাকো, আমি কিন্তু অফিসে যাব এখন।"—মাকে বল্‌ত সুদাস এ-কথা। ঠিক এম্নি স্বরে বল্‌ত। নিজের স্বরই নিজের কানে বাজ্‌ছে সুদাসের। শ্যামলী কি বল্‌ল শুন্‌তে পেলেনা সে। মাকে সে ভুল্‌তে চেয়েছিল শ্যামলীকে পেয়ে, কিন্তু শ্যামলীকে সাম্‌নে রেখেই মা এসে উঁকি দিতে চাচ্ছেন তার মনে। বোঝা যাচ্ছে—মনের সবটুকু আবেগের মুখ

সে ফিরিয়ে দিতে পারেনি শ্যামলীর দিকে। কিন্তু ফিরিয়ে দিতে হবে। ফিরিয়ে দেবে বলেই ত শ্যামলীকে তার দরকার ছিল!

"বাঃ সিগারেট খাচ্ছনা যে—" নখ থেকে চোখ তুলে শ্যামলী বল্‌ল।

"ও" সিগারেট-টা ধরিয়ে নিলে সুদাস।

"কি ভাব্‌ছিলে?" এবার মুখ না তুলেই বল্‌লে শ্যামলী।

"ভাব্‌ছিলুম?" একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠ্‌ল সুদাসের ঠোঁটে: "ভাবছিলুম যে মাকে আমি খুবই ভালোবাসতুম।"

"আমি তা জানি!" সমবেদনার ছায়া ঘনাল শ্যামলীর মুখে।

"কি করে জানো? আমাকে ত তখন তুমি ছাখোনি।"

"জানি। নইলে আমাকে এতো ভালোবাস্‌তে পারতেনা তুমি।"

সিগারেটটা আঙুলে তুলে নিয়ে তার নীল্‌চে ধোঁয়ার দিকে চেয়ে রইল সুদাস খানিকক্ষণ! তার মনে হলো এমন একটা নীল্‌চে পর্দ্দা হয়ত তার মুখের উপর পড়েছে এবং শ্যামলী তা-ই দেখ্‌তে পাচ্ছে। দেখুক। শ্যামলী যদি তার স্বাভাবিক চেহারাটা দেখ্‌তে পায় তাতে তার লাভ ছাড়া ত ক্ষতি নেই।

"তুমি যে কতো একা তা আমি জানি—তাই তোমায় ছেড়ে যাবার কল্পনাতেও আমার ভয় হয়—"

সুদাসের মনে হ'ল এ যেন শ্যামলীর কথা নয়—তার সমস্ত শরীরে যেন ঠোঁটের স্পর্শ বুলিয়ে যাচ্ছে শ্যামলী:

"ভাবি, যদি কারো মরতেই হয়—আমি যেন আগে মরে না যাই—একা থাকার দুঃখ তুমি সইতে পারবেনা আমি হয়ত পারব।"

অ্যাশ্‌-ট্রেতে ঘষে সিগারেটটা নিভিয়ে দিলে সুদাস। ধোঁয়ার দিকে না চেয়ে থেকে শ্যামলীর চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা অনেক ভালো। স্বপ্নের নরম ছায়াগুলো সে-চোখ থেকে ঝাঁক বেঁধে নাম্‌ছে—আবার কবে, কখন এমন সময় আস্‌বে কে জানে?

"কি দেখ্‌ছ?" শ্যামলীর গলায় একটা রমণীয় ক্লান্তির রেশ।

"তোমার চোখ।"

"আমার চোখ দেখ্‌তে ভালো নয়।"

"ভালো।"

"ভালো নয় তবু কেন ভালো বল্‌ছ?"

"ভালো নয় কেন?"

"মেয়েদের চোখ আরো কতো ভালো হয়।"

"ঠিক তেম্নি ভালো তোমার চোখ।" সুদাস একটা হাত বাড়িয়ে দিল শ্যামলীর দিকে।

হাতটা নিজের মুঠোতে নিয়ে শ্যামলী বল্‌লেঃ "না। আমার যা খারাপ তাকে কেন ভালো বল্‌বে তুমি। বল্‌বে খারাপ। খারাপ জেনেও আমাকে ভালোবাস্‌তে হবে।"

শ্যামলীর হাতের কোমলতায় নিজেকে হারিয়ে ফেল্‌ছে সুদাস, অনেক চেষ্টায় যেন সে একটু হাসি ফুটিয়ে তুল্‌ল ঠোঁটে।

"কেমন?" শ্যামলী দুহাতের মুঠোতে সুদাসের হাতটা উঁচুতে তুলে ধরল।

এবারও কথা বল্‌লেনা সুদাস—কেবল হাতটা আরেকটু উঁচুতে তুলে শ্যামলীর ঠোঁটের উপর আঙুল বুলিয়ে আন্‌লে।

চোখ বুজে এলো শ্যামলীর। এবার যেন তারও কথা ফুরিয়েছে।

ভোরবেলা বিছানায় শুয়ে থেকেই সুদাস বল্‌লেঃ "কখন উঠ্‌লে, আমি ত জান্‌তেও পারলুম না।"

"তোমার কি ইচ্ছা ছিল সীধু এসে আমাদের ঘুম ভাঙাক?" ঝরঝরে গলায় বল্‌লে শ্যামলী।

"কি ক্ষতি ছিল তাতে?" সুদাসের ফোলা-ফোলা চোখে অস্পষ্ট হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

"কি মনে করত সীধু?"

"কিছুনা। তোমাকে ও-ত বৌদিদিমণি বলেই জানে।"

"ভালো।" নিজের মনেই হাসল শ্যামলী।

"তুমি বোর্ডিং-এ আছ কেন সে-নালিশ সীধু প্রায়ই করে।"

"আমাকে মনে করেছে ভালোমানুষ—এখানে এলে যে ওর জীবন অতিষ্ঠ হবে তাত ও জানেনা।"

"তোমাকে জানে ও—আমার চেয়ে ভালো জানে।"

"জানে ত ভালোমানুষ বলে!"

"ওটাত মিথ্যে জানা নয়—" বিছানায় উঠে বসল সুদাস।

"শেষটায় দেখবে! এখন মুখ ধুয়ে এসো ত—ষ্টোভে চায়ের জল ফুটছে।"

বিছানা থেকে উঠে এসে টুথ-ব্রাসে হাত দিল সুদাস: "চায়ের জল ফুটছে অথচ ও ব্যাটার দেখা নেই।"

"তোমার মতোই ঘুমুচ্ছে হয়ত—" একটা কৌতুক ঠোঁটে চেপে নিলে যেন শ্যামলী।

"আস্‌ছি—বোঝা যাবে—" সুদাস বাথ-রুমে চলে গেল।

একটা নিটোল ঘুমের পর শরীরে একটুও ক্লান্তি ছিলনা শ্যামলীর কিন্তু মন যেন কেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ছিল। চা তৈরীর কাজে মনটাকে জোর করে ঢুকিয়ে দিতে চাইল সে। কিন্তু পেছনে সীধু দাঁড়াবামাত্রই শ্যামলী একটা ঝঞ্ঝাট থেকে নিজেকে উদ্ধার করে নিয়ে বল্‌লে: "চটপট চা-টা করে দাও ত সীধু—রুটি দিয়ে গেছে, খানকতক টোষ্টে জেলি-মাখন মাখিয়ে দিও।"

নিত্যকর্ম্মের উপর উপদেশে সীধু বিরক্ত হতে পারত কিন্তু তা সে হলনা বরং বিগলিত হয়ে একটু হাসবার চেষ্টা করলে।

শোবার ঘরে এসে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে রইল শ্যামলী। অনেকদূর ত সে এগিয়ে গেল সুদাসের সঙ্গে—এর চেয়ে বেশি দূর বলে আর কিছু নেই—কিন্তু তারপর যদি ভেঙে পড়ে সুদাসের সঙ্গে

তার সম্বন্ধ ! ভেঙে পড়বার কারণ যা আছে তাকে উপেক্ষা করবার মতো সাহসের অভাব শ্যামলীর হবেনা ; কিন্তু যে-বাধা ডিঙোতে সাহসের প্রয়োজন নেই, স্নেহে দুর্ব্বল, চোখের জলে অসহায় যে কঠিন বাধা তাকে জয় করবার ক্ষমতা কি শ্যামলীর আছে? কলকাতাঁয় এসেছিল সে পড়বার জন্যেই—প্রেমে পড়বার জন্যে নয়। মা-ও ভেবেছেন, মহীতোষ আছে, মামা আছেন, এদের সাহায্যে পড়া তার হয়ে যাবে। পড়ার পর তার একটা চাকরি হয়ে গেলে দাদার গরীব সংসারে মাকে আর গলগ্রহ হয়ে থাক্‌তে হয়না। তার জন্যেই মার যা কিছু উৎসাহ। নইলে একা শ্যামলীকে কলকাতায় আসতে দেবার কল্পনাও তিনি কোনোদিন করতে পারেন নি। এমন কি মহীতোষকে দিয়েও তাঁর বিশ্বাস ছিলনা, যদিও বাবার সঙ্গে মহীতোষদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা ছিল আত্মীয়ের মতো। সুদাসের সঙ্গে কথা বলবার সময় শ্যামলীর মনের পেছনে দাঁড়িয়ে থাকেন মা। অনেক চেষ্টায় অনেক সময় সে মার উপস্থিতিটা মুছে ফেলে দেয় কিন্তু সবসময় তা হয়ে ওঠেনা। এখনো মা সুদাসের নাম শোনেন নি—মামার চিঠিতে এই ভুল খবরটুকুই পেয়েছেন যে মহীতোষের টাকায় শ্যামলী পড়াশুনো করছে। বোর্ডিং-এ যাচ্ছে বলে মামার বাসা থেকে সেই যে ছ'মাস আগে এসেছে শ্যামলী তারপর আর সেখানে যায়নি। তবু ভালো, শ্যামলী সম্বন্ধে মামীমা তাঁর কাল্পনিক অনুমানের কোনো ছবি এঁকে মার কাছে পাঠান নি! শ্যামলী যে তাঁদের বাড়িতে নেই এইটুকুতেই হয়ত তাঁরা আশাতীত খুসী। কিন্তু সত্য খবর মা কি একদিন জান্‌তে পারবেন না? আর কারো মুখে না হোক শ্যামলীর মুখেই হয়ত শুন্‌বেন সব খবর! তখন? মার অবস্থা যে তখন কি হবে—শ্যামলী ভাবতে পারে না। এ ব্যাপারটাতে মার মন কিছুতেই কোনোরকম শুচিতা বা স্বাভাবিকতা আবিষ্কার করতে পারবেনা—সহ্য করতে পারবেন না তিনি শ্যামলীকে। শ্যামলী জানে, সবই জানে। কিন্তু জেনেও

সুদাসের কাছ থেকে সে সরে যেতে পারেনি—কোনদিন সরে যেতে পারবেও না। তাই হয়ত নিজের মনের উপরই অত্যাচার করতে থাক্‌বে শ্যামলী, অদ্ভুত ব্যবহারে আর অর্থহীন কথায়। সুদাসের আবেগের সঙ্গে তার আবেগ যেন মিশে না যায় প্রাণপণে সে চেষ্টাই করে শ্যামলী আর তাই নিজের মন থেকে যেন শরীরটা তার আলাদা হয়ে পড়ে।

সুদাস এলো, তারপর সীধু। সীধুকে বাজারে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দিয়ে চায়ের টেবিলে এসে বস্‌ল সুদাস। শ্যামলী তার পারিপার্শ্বিকে ফিরে এলেও চুপ করে ছিল, বলবার মতো কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছিলনা।

"তুমি কি বলতে চাও তুমি ঘুমোওনি?" সুদাস দৈনিক কাগজের সামনের পৃষ্ঠায় বড় বড় হরফগুলোতে চোখ বুলোতে সুরু করলে।

শ্যামলী টিপট থেকে কাপে চা ঢাল্‌ছে—কথা বললনা।

খবরের কাগজ থেকে শ্যামলীর উপর চোখ ফিরিয়ে এনে সুদাস বল্‌লে: "কি জানো, য়ুরোপে রাতদিন যুদ্ধ চলছে কিন্তু আমাদের নিদ্রার ব্যাঘাত নেই!"

"যুদ্ধ ছাড়াও না ঘুমোবার মতো অনেক কারণ আছে আমাদের—" হাল্কাভাবেই কথাটা বলতে চাইল শ্যামলী কিন্তু তার আগে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকাতে কেমন যেন একটু ভারি ভারি শোনাল শ্যামলীর গলা।

"হনলুলুতে বন্যা হলে এখানে আমাদের চাঁদা তুল্‌বার অভ্যাস আছে কি না, তাই য়ুরোপের যুদ্ধে নিজেদের নিদ্রিত দেখে আশ্চর্য্য হচ্ছি।"

"নিজেদের সমালোচনা করে কি লাভ—চা জুড়িয়ে যাচ্ছে—" হাসতে লাগল শ্যামলী। সুদাসও হাস্‌ল, ঠোঁট দিয়ে মুখ বন্ধ করবার আগে বলে নিলে: "পাঁচমিনিট পরে আমিও জুড়োবো।

খবরের কাগজ পড়বার সময়টুকুতে মাত্র ত আমাদের শরীরে যুদ্ধের উত্তাপ থাকে !"

"যুদ্ধের উত্তাপে সারাদিন হুঙ্কার দিয়ে বেড়াতে চাও না কি তুমি ?" হাসির সঙ্গে কথাগুলো ছিটিয়ে দিলে শ্যামলী।

"তা ত নয়—" ঠোঁট চিবিয়ে চল্‌ল সুদাসঃ "যুদ্ধটা সম্বন্ধে আমাদের খানিকটা সচেতন থাকা উচিত, আমাদের ভাগ্যের সঙ্গেও জড়িত যে এ যুদ্ধ, ততটুকু সচেতন। হল্যাণ্ড-ডেনমার্কে নাৎসী এরোপ্লেন বোমার ফসল বুন্‌ছে কিনা বা প্যারিস্ ত্যাগ করতে রেণো ক'ফোঁটা চোখের জল ফেলেছে এসব উত্তাপসৃষ্টিকর খবর না রাখলেও চলে যদি এটুকু কাণ্ডজ্ঞান থাকে যে পৃথিবীর রং বদলাবার যুদ্ধ চলেছে—আর ভারতবর্ষ সেই পৃথিবীরই একটা দেশ।"

"তুমি বক্তৃতা দিতে জান এটুকুই জানালে ত ?" শ্যামলী চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

"না যুদ্ধটাকে আমি অনুভব করি।" একটা গভীর অনুভূতির দীপ্তিই সুদাসের মুখে ফুটে উঠ্‌ল।

"তার প্রমাণ ত এই আমার সঙ্গে বসে গল্প করা—"

"বাঃ—" খানিকটা অপ্রতিভের মতো হাসল সুদাস ঃ "তোমার সঙ্গে গল্প করলে বুঝি আর কিছু করা যায়না।"

"করা যায় না। আমি জানি তুমি কিচ্ছু করছনা। আগে বই পড়তে তা-ও এখন পড়ো না—"

"সবই করি—"

"না। বসে-বসে কেবল আমার কথাই ভাবো। তোমাকে আমি নষ্ট করে ফেল্‌ছি—" মনটাকে আবারও শ্যামলী কালো করে তুল্‌ল।

"কেন এসব বল ?" সুদাস অসহায় হয়ে পড়েঃ "তাহলে আমি কি বল্‌তে পারিনে যে আমি তোমার অনিষ্ট করছি ?"

শ্যামলী কোনো কথা বল্‌লে না—সুদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে

রইল কয়েক সেকেণ্ড, তারপরই চোখ তার ভারি হয়ে এলো, টলটল করতে লাগল জলে। অভিভূতের মতো সুদাস চেয়ার ছেড়ে শ্যামলীর গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল : "একি হচ্ছে ?"—এ'ক'টি কথা ছাড়া আর কিছুই বল্‌তে পারলনা সে।

"কিছু না"—চোখে-মুখে আঁচল ঘসে হাস্‌তে চেষ্টা করল শ্যামলী।

শ্যামলীকে নয়, নিজের মনকে প্রশ্ন করে সুদাস শ্যামলীকে জেনে নিতে চাইল। প্রায় এক বছরের পরিচয়ে মাত্র প্রথম কয়েকটা দিন শ্যামলীকে কঠোর মনে হয়েছে তার। যখনই সুদাস সে-কঠোরতা ভাঙবার প্রতিজ্ঞা করেছে, সে-মুহূর্ত্ত থেকে শ্যামলী আর কঠোর নয়। নিঃসন্দেহে তখন ভেবে নিয়েছে সুদাস, সাধারণ বাঙালী মেয়েদের মতোই শ্যামলীর মনের ভিত নরম। এখনো তা-ই ভাবে সে। কিন্তু আগেকার মতো নিঃসন্দেহে ভাবে না। মনের ভিত যার নরম, চর্চ্চা করেও কোনো একসময় সে কঠোর হয়ে থাক্‌তে পারে না। শ্যামলীর মনের সত্যিকারের চেহারা কি তাহলে কঠোর ? সেই কঠোরতাকে চেপে মেরে ফেল্‌তে হচ্ছে বলেই কি এককেসময় শ্যামলী এমন অদ্ভুত হয়ে ওঠে ?

"চুপ করে আছ যে ?" একটা সঙ্কোচের হাসি ফুটে ওঠে শ্যামলীর মুখে।

"কথা বল্‌তে ভয় করে।"

"তাত' নয়—রাগ করেছ।"

"রাগ ?" অকৃত্রিমভাবে অবাক হল সুদাস : "রাগ ত বরং তুমি করেছিলে।"

"কেন রাগ করব আমি ?"

"তা তুমিই জানো।"

"আমি জানি রাগ আমি করিনি।"

"ভালো। তাহলে চা-টা খেয়ে ফেল—" ঘটনাটাকে আর

টেনে আনতে চাইলনা সুদাস। খানিকটা দুর্বোধ্য থাক্‌না শ্যামলী। কি ক্ষতি? শ্যামলীর সবকিছু জেনে ওকে ফতুর করে দিলে বা কি লাভ?

"ঠাণ্ডা চা খেয়ে বুঝি দেখাতে হবে রাগ করিনি?" শ্যামলীর গলায় খানিকটা উৎসাহ শোনা গেল।

"একটা কিছু প্রমাণ দিতে হবে ত?"

"গাছ ভেঙে ভূত যেমন পালিয়ে যাবার প্রমাণ দেয়?"

সশব্দে দুজনেই ওরা হেসে উঠ্‌ল।

আবার সে-মুহূর্ত্ত ফিরে এল যখন দুজনেই ওরা মনের স্বাস্থ্য ফিরে পায়। সব ভুলে গিয়ে যখন শ্যামলী সুদাসের সান্নিধ্যের উত্তাপ উপভোগ করতে থাকে। সুদাসের গায়ে মাথা এলিয়ে দিয়ে খানিকক্ষণ চুপচাপ করে রইল শ্যামলী। তারপরই হঠাৎ চকিত হয়ে মাথা তুলে নিয়ে বল্‌লে: "সীধু বাজার থেকে এক্ষুনি আস্‌বে, না? এম্নি তোমাকে দাঁড়িয়ে থাক্‌তে দেখলে ও কি ভাব্‌বে!"

"ভাবরার কি আছে আর ওর? ও জানে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে!"

"বিয়ে হয়ে গেলে বুঝি আর লজ্জা থাক্‌তে নেই?" আব্দারে মিষ্টি শোনাল শ্যামলীর গলা।

অগত্যা পাশের চেয়ারে গিয়ে আবার বস্‌তে হ'ল সুদাসকে। শ্যামলীর মুখের উপর সম্পূর্ণভাবে তাকিয়ে এবার বল্‌ল সুদাস: "আচ্ছা শ্যামলী, আজ, কাল বা পর্শু আমাদের বিয়ে হয়ে যাওয়াতে ক্ষতি কি? সীধু না হয় ফাঁকিতে পড়েছে—নিজেদের আমরা ফাঁকি দিচ্ছি কোন হিসেবে?" সুদাস হাস্‌তে সুরু করলে।

"বিয়ে কি আমাদের হয়ে যায়নি? অনুষ্ঠানটাই ত বাকি, ও-ত একদিন হলেই হ'ল!"

"অনুষ্ঠানের উপর আমার ঝোঁক নেই—কিন্তু অনুষ্ঠানের অনুমোদন না থাক্‌লে তোমার অসুবিধে হ'তে পারে ত!"

"পরীক্ষার পর যে-কোনোদিন তা হয়ে গেলেই হ'ল !"

"আমাকে নিয়ে তোমার বোর্ডিং-এর মেয়েরা উৎসুক নয় ?"

"কেউ-কেউ উৎসুক।"

"তাদের কাছে আমার পরিচয়টা কি ?"

"দাদা।"

"নির্বিরোধে পরিচয়টা মেনে নিয়েছে ওরা ?"

"আমার সঙ্গে তা নিয়ে বিরোধ করতে আসেনা—নিজেদের মধ্যে যা-ই করুক।"

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সুদাস হাস্‌তে লাগল তারপর বল্‌লে : "তুমি যাই বলো, বিয়েটা আমাদের হয়ে যাওয়া উচিত।"

"কেন ?" শ্যামলীও হাস্‌তে লাগল।

"কেন নয় তা-ওত তুমি বলতে পারবে না।"

"যদি বায়রণের কথা বলি ?"

"সে ত তোমার কথা হলনা !"

"তোমার ওকালতি করেই যদি বলি, প্রেমিকার সঙ্গে বসবাস করার চেয়ে প্রেমিকার জন্যে মরা অনেক সহজ ব্যাপার !"

"তেমন উকিলের দরকার আমার নেই—রবিঠাকুরের অমিত রায়ের হয়ত দরকার ছিল।"

"দরকার নেই এখন তুমি কি করে জানো—আমাকে ত তুমি সবটুকু জানোনা !"

"তোমার কথাই বলছি, তুমি খারাপ, আর তা জেনেও, আমার কথা বলছি, বায়রণের ওকালতির দরকার আমার নেই !"

"তুমি মিছিমিছি তর্ক করছ !"

"তোমার তর্কেরও কোনো মানে নেই।"

"হয়ত নেই।" অন্যমনস্ক হয়ে পড়তে চাইল শ্যামলী।

টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিলে সুদাস। বার কয়েক ওটাকে ঠুকে অনেক ভেবেচিন্তে যেন ঠোঁটে চেপে ধরলে, দেশলাই-

এর বাক্সটা একটু নাড়াচাড়া করে শেষ একটা কাঠি জ্বালিয়ে সিগারেট-টা ধরিয়ে নিলে। ত্রিশ সেকেণ্ড অন্তত সময় খরচ হল এই সাধারণ ব্যাপারটাতে। সদ্য-ধরানো সিগারেটে ছাই জম্‌তে পারেনা তবু সে ঠোঁট থেকে সিগারেটটা আঙুলে তুলে নিয়ে ছাই ফেলবার চেষ্টা করল।

"কি জানো অনেকসময়ই মনে হয় আমার—" সিগারেট-খাওয়ার ভূমিকার পরও খানিকটা কথার ভূমিকা করে নিল সুদাস ঃ "আমাদের এ অবস্থাটা স্বাভাবিক নয়।"

শ্যামলী উৎসুক হয়ে তাকাল শুধু।

"আমরা বিয়ে করব জানি, তবু আমরা বিয়ে করছিনে—ব্যাপারটা অ্যাব্‌নর্ম্যাল নয়? শুধ্ মনের নয় শরীরের স্বাস্থ্যের পক্ষেও হয়ত খারাপ!"

"মনে করলেই ত হয় যে আমাদের বিয়ে হয়ে গেছে!"

"ঐশ্বরিক মন ছাড়া ওরকম মনে করা যায়না!"

"আমি মনে করি।"

"তুমি পুণ্যবান্।"

"তোমার বা এমন পাপী মন কেন?" হাসি ঝিল্‌কিয়ে উঠল শ্যামলীর মুখে।

কিন্তু সে-হাসির ছোঁয়াচ এবার আর সুদাসের মুখে এসে লাগ্‌লনা। কেমন অদ্ভুত বিষণ্ণ হয়ে গেল যেন সে হঠাৎ। সুদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে শ্যামলীর হাসি মেঘের রঙের মতো মিলিয়ে গেল। একটু আগেও যে হেসে উঠেছিল শ্যামলীর তার এতটুকু চিহ্নও আর মুখে দেখা গেলনা।

"এভাবে থাকতে তোমার কষ্ট হয়, আমি জানি।" শ্যামলী বল্‌লে।

"তোমারও কষ্ট হয়, তুমি জানোনা।"

"আমার কষ্ট হয়না। আমি ভাবি, আমার ত পাওয়া হয়ে গেছে। এতটুকুই বা ক'জন পায়!"

"পেতে হলে সবটুকুই পাওয়া দরকার—মধ্যপথে হঠাৎ থেমে থাকার কোনো মানে নেই—। 'ভূমৈব সুখম্' কথাটা ভারতবর্ষেরই —অথচ আজ আমরা মনে করে বসে আছি যে বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাটা ভারতীয় নীতিতে গর্হিত। আর সেই ভুল নীতির উপরই নিজেদের মন গড়ে তুলছি।"

শ্যামলী চুপ করে রইল।

"বেশি পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা না থাকলে ঈশ্বরের মতো বিরাট একটা কল্পনাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাও কারো মনে জাগতে পারেনা। উপনিষদের যুগে ঐশ্বর্য্যে লালিত রাজারাজড়াই তাই ব্রহ্মজ্ঞানের জন্যে পাগল হয়েছিল, জীবনের সারসত্য জান্‌বার বিরাট স্পর্দ্ধা হয়েছিল তাই রাজার দুলাল গৌতমের। অল্প নিয়ে থেকে জীবনের কোনো দিকই ভরে ওঠেনা। এর নাম সংযম নয়, অপচার।" আবেগের গাম্ভীর্য্যে সুদাসকে কঠিন, উদ্ধত এবং খানিকটা যেন ভয়ঙ্করই মনে হল। কেমন বিমূঢ়ের মতো তাকিয়েছিল শ্যামলী। মনে হচ্ছিল একটা ভয়ই যেন ওর বুকে দুড়দুড় করছে। সুদাস তা লক্ষ্য করল এবং হাসির একটা অস্পষ্ট আভাস ফুটিয়ে তুলল মুখে। বক্তৃতার মতো কতগুলো কথা বলে যেন একটু লজ্জিতই হয়ে পড়েছিল সে। এমন কি দরকার ছিল এ-প্রসঙ্গে এত সব বড় কথা বলার? কিন্তু কি করবে সে—কথা বলাটা তার অভ্যাসে দাঁড়িয়ে গেছে, বেশি বইপড়ার কুফল ফলছে তার চরিত্রে। নানাব্যাপারে মোক্ষম কথা বল্‌তে পারার ক্ষমতা হয়ত তার ব্যবসায়ী জীবনে খুবই কাজ করে কিন্তু শ্যামলীর কাছে সে-ক্ষমতার প্রদর্শনী খুলে বসা প্রায় বর্ব্বরতারই সামিল। যেখানে চুপ করে বসে থাকতে পারাই মস্ত লাভ সেখানে সুদাস এ-ধরণের বজ্রনিনাদ করতে গেল কেন? সিগারেট-টা ঠোঁটে গুঁজে দিয়ে সুদাস চোখ বুঁজে রইল।

সুদাস কি বলল শ্যামলী তা শোনেনি, সুদাস কি বলতে চাচ্ছে শ্যামলীর মন তা-ই শুনে চলছিল। নিজেকে সংযত করবার একটা

ইচ্ছা ত শ্যামলীর মনে কাজ করে চলছেই। পাছে মার পাওয়াতে ব্যাঘাত আসে, নিজের পাওয়াকে তাই সে খর্ব্ব করতে চায়। যখন পাওয়ার ইচ্ছাকে কিছুতেই আর রোধ করা যায়না তখন সে লুকিয়ে তা পেতে চায়। মা যে তার কিছুই জান্‌লনা সেটুকুই শ্যামলীর তৃপ্তি। সত্যি, কি বিশ্রী হয়ে উঠেছে তার জীবন! অসহায়ভাবে ঠোঁট কামড়াতে সুরু করল শ্যামলী। পা দোলাতে সুরু করে আবার তা থামিয়ে দিলে।

বাজার সেরে ফিরে এসেছে সীধু। থলেটা রান্নাঘরের দুয়ারে ধপ্‌ করে ফেলে একগাল হাসি নিয়ে সীধু এসে বরাবর হাজির হল এ-ঘরে। হাফসার্টের পকেট থেকে একটা কাগজের প্যাকেট টেনে বার করে নিয়ে বললে সীধুঃ "বৌদিদিমণি—তোমার জন্যে এনেছি—"

সুদাস আর শ্যামলী সীধুর দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে তার বুদ্ধির প্রতীক্ষা করতে লাগল। সীধু অন্যহাতে প্রসারিত হাতের কনুইটা ছুঁয়ে বললেঃ "সিঁদূর, তোমার নেই বলে আন্‌লাম!"

দুই

পরদিন অফিসে এসে সুদাসের যেন ক্লান্তির আর সীমা ছিলনা। নেশা ছেড়ে গেলে যে অবস্থা হয় অনেকটা যেন সে রকম। শ্যামলীর সঙ্গে চব্বিশ ঘণ্টা থাকার পর লোন, ইনভেষ্টমেণ্ট, বিল ডিসকাউণ্টিং-এর কমিশন নিয়ে টানাহেঁচড়া করা অসম্ভব। তার চেয়ে শ্যামলীর না আসাও এক রকম ভালো। ব্রাঞ্চগুলোতে কয়েকটা জরুরী চিঠি লেখার ছিল, সুদাসের মনে হল এখন তা লিখতে গেলে তার জরুরীত্ব ত থাকবেই না এমন কি লজিক থাকে কিনা সন্দেহ। শ্যামলীর চলে যাওয়াটা তার স্নায়ুগুলোকে মুচড়ে দিয়ে গেছে।

এবং স্নায়বিক এই দুর্ঘটনা এবার যেন আগেকার চেয়ে অনেক বেশি করে অনুভব করছে সুদাস। তার যে কোনো কারণ নেই তা নয়। সুদাস ভেবে রেখেছিল, এবারই বিয়ের ব্যাপারটার একটা রফা করে ফেলবে। কিন্তু কোথায় কি যেন একটা বাধা শ্যামলীর মনে কাজ করে যাচ্ছে—যাতে কিছুতেই সে তাতে রাজী হলনা। মহীতোষ সম্বন্ধে একটা সন্দেহও একবার হাল্কা মেঘের মতো সুদাসের মনের উপর দিয়ে ভেসে গেছে। খুব অসম্ভব নয় যে মহীতোষকে ভালোবাসে শ্যামলী। জীবন সম্বন্ধে নিরুৎসাহ মেয়েরা যার কাছে প্রথম উৎসাহের আশ্রয় পায় তাকে সহজে ভুলতে পারেনা। অবশ্যি তার জন্যে যে সুদাসকে ভালোবাসেনা শ্যামলী তা নয়। ওদের ভালোবাসা অনেক রকম। হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে সুদাসকে ভালোবাসে শ্যামলী, হতে পারে যে মন তার মহীতোষের কাছে ঋণ স্বীকার করে।

"আমি আর আসবনা—যাবার সময় মুখভার করে কেন থাক তুমি ?" কাল একসময় বলেছিল শ্যামলী।

"তুমি চলে যাচ্ছ, আমার খারাপ লাগেনা ?"

"আমি চলে যাচ্ছি যখন তখন ত তুমিও আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছ—খারাপ ত আমারও লাগে—আমি ত মুখভার করে থাকি নে।"

"তুমি পার, আমি পারিনে।"

"আমি পারিনে তবু হাসি তোমারি জন্যে। আমার মুখভার থাকলে কিছুতেই তোমার কাজে মন বস্‌বেনা জানি।"

কথাগুলো স্মরণ করে সুদাস—কোথায় আছে এখানে মহীতোষ ? হয়ত শ্যামলীর মনে মহীতোষ কবেই মুছে গেছে, মুছে যায়নি শুধু সুদাসের মন থেকে। সুদাসই বরং মহীতোষের ব্যাপারে দুর্ব্বল। শ্যামলীর সামনে মহীতোষের নাম পর্য্যন্ত উচ্চারণ করতে সাহস হয়না তার। ভয় হয় পাছে শ্যামলীর গলায় মহীতোষ সম্বন্ধে

একটু কৃতজ্ঞতার সুর বেজে ওঠে। মহীতোষ যদি না হয়, শ্যামলীর মনে আর কি বাধা থাকতে পারে? প্রথম-দেখা কার্জ্জন পার্কের সেই শ্যামলীর জীবনে কোনো বাধা এসে দাঁড়াতে পারে বলে কেউ ভাবতে পারবেনা। সুদাসের আড়ষ্ট মনকে এই বাধাহীনতার চমকই নাড়া দিয়ে গ্রিয়েছিল, প্রবীরের মতো মুখ ফুটে তা বলতে না পারলেও মনটাকে ত অনুভব করেছিল সুদাস! আজ সে-শ্যামলী কোথায়?

নীল-পেন্সিল দিয়ে প্যাডের পিঠে আঁকিবুঁকি কাটতে সুরু করল সুদাস! তার কামরার বাইরে তার অফিস দ্রুতগর্জ্জনে ছুটে চলেছে। ক্যাসিয়ারের কাউণ্টারে টাকার আওয়াজ, টাইপ-রাইটারের আর টেলিফোনের বাজনা, ডিস্‌পেপটিক্ একাউণ্টেণ্টের মেজাজ সবই সুদাসের কানে আসা উচিত কিন্তু মৃদু নিশ্বাসের মতো অস্পষ্ট নরম শ্যামলীর কতগুলো কথা ছাড়া তার কানে আর কোনো শব্দ নেই। অফিস আজ সে করতে পারবেনা। মহীতোষকে নিয়ে সিনেমায় যাওয়া যায় কি? যতই ভালোবাসুক মহীতোষ শ্যামলীকে সুদাসের কাছে শ্যামলীর ব্যাপারে সে নিরুৎসুকই হয়ে থাকবে।

বেয়ারার হাতে একটা চিরকুট এলো। পুশ্‌ডোরটা নড়ে ওঠার সঙ্গে-সঙ্গেই চোখে-মুখে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হয়ে উঠেছিল সুদাস। চিরকুটটা হাতে নিয়ে অবাক হতে পারত সে কিন্তু বেয়ারার সামনে অবাক হওয়া যায়না বলেই বল্‌ল: "বোলাও—"

অবাক হল সুদাস বেয়ারার চলে যাবার পর। হঠাৎ আজ প্রবীর এসে হাজির হল কেন? আর কি আশ্চর্য্য, একটু আগে প্রবীরের কথা অনেকদিন পর মনে হয়েছিল তার। অটো-সাজেশ্যন্! অটো-সাজেশ্যনের লীলা আজকাল খুঁটেখুঁটে লক্ষ্য করছে সুদাস। মিলিয়ে দেখা গেছে এমন অনেক রাত্রি পাওয়া যায় যখন সে আর শ্যামলী কেউ ঘুমুতে পারেনি।

বিশুষ্কতর চেহারা নিয়ে প্রবীর এসে সুদাশের কামরায় ঢুকল কিন্তু মুখের হাসি তেমনি আছে—তেমনি হেসে প্রবীর হাত বাড়িয়ে বললে: "একটা সিগারেট দে দাসু—"

আপনা থেকেই হৃদ্যতার একটা মোলায়েম হাসি ফুটে উঠল সুদাসের মুখে—'দাসু'-সম্বোধনটা অনেকদিন পর সে শুনতে পাচ্ছে। প্রবীরের মতো দু-একজনের মুখেই এ নামটা তার বেঁচে আছে আর যাঁদের কাছে এ-নামে তার পরিচয় ছিল তাঁরা কেউ আর পৃথিবীতে নেই।

"তোমাকে ধরে চাবকানো দরকার!" সিগারেটের টিনটা এগিয়ে দিয়ে গভীর আহ্লাদে বললে সুদাস।

"এই ফ্যাসিষ্ট ইচ্ছা কেন?"

"যেহেতু ফ্যাসিষ্টরা এখন তোদের বন্ধু! এটা বন্ধুবাৎসল্য।"

"বন্ধু তোকে কে বললে—?" প্রবীর অত্যন্ত স্নেহে একটা সিগারেট মুখে তুলে নিলে।

"নন-এগ্রেশন্ প্যাক্ট। ফরাসীর কম্যুনিষ্টরা এখন কি করছে বলতে পারিস? আমার একটা সন্দেহ হয় সেখানে কম্যুনিষ্টই নেই—মানে রাশিয়ার শিষ্য সম্প্রদায় নেই। আমাদের দেশটাকে দুর্ভাগা আর বেওয়ারিশ পেয়ে তোরা একদল এখানে গজিয়ে উঠেছিস্!"

"চাবকানো শেষ না সুরু?" হাসতে লাগল প্রবীর।

"এটা সুদ—আসলটা অন্যরকম।"

"তাহলে আসলের আগেই পালানো দরকার!

"ভুলে যাস্‌নে এটা ব্যাঙ্ক—এখানে সুদের চোট-টাই বেশি, ওটাই আসল তৈরী করে চলে!" সুদাস ঝরঝর করে হেসে উঠল; নিজেই সে বুঝতে পারছিল প্রবীরকে পেয়ে মনের মেঘটা তার পরিষ্কার হয়ে আসছে।

"যাক্ বাঁচা গেল।"

"তার মানে? মনে করেছিস্ আমার কথাটি ফুরোলো?"

"তুই অফুরন্ত কথা বল্—শুন্তে রাজী আছি। এতো ভালো সিগারেটের টিন থাক্লে দুশ্চিন্তার কোনো কারণ নেই।"

"তাহলে শোন্—বিয়েতে বন্ধুদের আহ্বান করা কি তোদের প্রোলিট্কাল্টের বিরোধী?"

"বিয়ে যে করছি তা জানবার আমারই সময় ছিলনা!"

"কিন্তু তারপর আজ ছাড়া নিশ্চয়ই সময় ছিল।"

"আজ পর্য্যন্তও দুঃসময়ই চলেছে। তিনদিন পর আজ সিগারেট খাচ্ছি, অদ্ভুত লাগ্ছে তাই।" হাসিটা একটুও ম্লান দেখালনা প্রবীরের।

কিন্তু সুদাস হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে গেল। এনভেলাপ-ওপেনারটা দিয়ে নখ খুট্তে সুরু করে বললেঃ "তোরা আছিস কোথায়?"

"বৃন্দাবন পালিত লেন।"

"শমীন বিয়ের খবরটাই দিয়েছিল—তোর আর কোনো খবর দিতে পারেনি।"

"খবর কিছুই নেই—টাকা রোজগারের চেষ্টা করতে হয় কিন্তু রোজগার হয়না।"

এক পলক চোখ বুলিয়ে দেখল সুদাস—প্রবীরে খদ্দরের পাঞ্জাবীটার অনেক জায়গাই ফেঁসে গেছে। বোঝা যায় শেষ দাড়ি কামিয়েছে যেদিন শেষ সিগারেট খেয়েছিল। মেয়েটি নার্সের কাজ করত, শমীন বলেছিল সুদাসকে। হয়ত এখনও তা-ই করে আর সে-টাকা দিয়েই দুজনের চলতে হয়। প্রবীর রোজগার করতে পারবেনা কারণ টাকাকে সে চেনেনা। কিন্তু রোজগার ত তার করা উচিত। এ-বিয়েতে যে মনের জোর দেখিয়েছে প্রবীর—টাকার অভাবে যদি বিয়ের পরিণতিটা অসুন্দর হয়ে ওঠে, তাহলে এ বিয়েও ব্যর্থ হ'ল আর সে মনের জোরেরও কোনো মানে রইলনা।

"টাকাটা দরকার—" প্রবীরই নিজে থেকে বললেঃ "ভাবছি শেয়ার মার্কেটে এক বন্ধুর সঙ্গে ভিড়ে যাব। আণ্ডার ব্রোকার ছেলেটি, ভালো রোজগার!"

সুদাসের কারবারের এলাকার কথা বল্‌ছে প্রবীর! কিন্তু এ সম্বন্ধে চুপ করেই গেল সে। যে হাসি হেসে প্রবীরকে ঠাট্টা করবার সুযোগ ছিল সে-হাসি নিয়েই বললেঃ "আজ তোর ঘরকন্না দেখতে যাবোই।"

"যেতে পারিস, দেখবার মতো কিছু নেই। রঞ্জন মাঝে-মাঝে যায়।"

"রঞ্জন যায়—আর আমি তোর লিষ্ট থেকে বাদ?"

"রঞ্জনের কাছে মাঝে-মাঝে আমিও যাই!"

"আমার কাছে আসা-টা বাতিল হ'ল কেন, হাতে খড়্গ নিয়ে ত আমি বিচরণ করছিনে!"

"রঞ্জনের হাতের চেয়ে তোর হাত কম মুক্ত নয় জানি, তোকে রিজার্ভ রেখেছিলুম—দেখা গেল এখন রিজার্ভ ভাঙতে হবে!"

"রিজার্ভ ভাঙবার একটা কণ্ডিশন আছে।" একটু গম্ভীর হয়ে গেল সুদাস।

"কি?" প্রবীর আরেকটা সিগারেট তুলে নিতেই যেন মুখ নীচু করলে, আসলে একটু লজ্জিতই সে হচ্ছিল পাছে সুদাস হ্যাণ্ডনোটের কথা বলে।

"শেয়ার মার্কেট ছাড়তে হবে।"

অবাক চোখে প্রবীর তাকাল সুদাসের দিকে—এই অদ্ভুত প্রস্তাব কেন তার?

"তোর মত মানুষকে দিয়ে ও কাজ হবেনা—তার চেয়ে মাষ্টারী করা তোর পক্ষে অনেক ভালো—" সুদাস মুখস্থের মতো কথাগুলো বলে একটু থেমে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেঃ "কতো লাগবে?"

হাসি মুখে প্রবীর ডানহাতের পাঞ্জাটা তুলে দেখালে। ড্রয়ার

খুলে দশটাকার পাঁচটা নোট তুলে আন্‌ল সুদাস--তারপর উবু হয়ে দাঁড়িয়ে প্রবীরের বুক পকেটে নোটগুলো গুঁজে দিয়ে বললে : "আমার কাছ থেকে টাকা নিয়েছিস্ স্ত্রীকে এ-কথা বল্‌তে পারবিনে—খবদ্দার।"

"পাগল—বল্‌ব মার্কেটের একটা ডিল-এই পেয়ে গেলুম!" প্রবীর হাসতে লাগল।

প্রবীরের সঙ্গে নিজেকে অত্যন্ত ব্যস্ত রাখবার ব্যগ্রতা নিয়ে সুদাস বল্‌লে : "তারপর, আর সব খবর কি বল্?"

"বাবামার সঙ্গে বিরোধ চল্‌ছেই। সুবীর হু'দিন এসেছিল—বললে—পরিবার থেকে আমার নামটা মুছে গেছে!"

"কম্যুনিষ্টের নাম ত কোনো পরিবারের তালিকায় থাকেনা—"

"কম্যুনিষ্ট বলেই যে আমি বিয়ে করেছিলুম তা-ত নয়, যে-কোন ভদ্রলোকই এ-বিয়ে করতে বাধ্য হতেন।"

সুদাস একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল—তারপর সেই অন্যমনস্কতার মধ্যে থেকেই যেন বলে উঠল : "সুবীর আজকাল নিশ্চয়ই খুব পালিটিক্স করে বেড়াচ্ছে, ফরোয়ার্ড ব্লকের তুব্‌ড়ি ছাড়ছে, না?"

"ওদের সঙ্গে কম্যুনিষ্টদের বনিবনাও হবেনা—লেফ্‌ট্ কন্‌সলিডেশন্ কথাটা ওদের পলিসি মাত্র—আসলে সুভাষ বোস সুভাষ বোসই।"

"দোষটা সুভাষ বোসের নয়—দোষ তোদের ভুল ধারণার—তোদের ইউনাইটেড ফ্রন্ট—পপুলার ফ্রন্ট থিয়োরীগুলোর। আসলে চ্যাংকাইশেক চ্যাংকাইশেকই—মাওসেতুং গিয়ে তার সঙ্গে হাত মিলালেই তার রংবদল হয়ে যাবেনা। তোরা সব জিনিষই একটু দেরিতে বুঝিস্—" প্রিয় প্রসঙ্গে সুদাস উত্তেজিত হ'তে সুরু করল।

"তা নয়, আমরা ভাবি মিলেমিশে যতটুকু কাজ এগোনো যায় ততটুকুই ভালো—প্র্যাকৃটিক্যাল জ্ঞানটা আমাদের একটু বেশি!" আগের দিনগুলোর মতো প্রবীর নির্ব্বিকারে সিগারেট টেনে চল্‌ল।

"স্বাধীনতা গান্ধীজির কংগ্রেস দিয়ে হবেনা এই কি তোদের প্রাক্‌টিক্যাল জ্ঞান ?"

"গান্ধীজির অহিংসা প্রায় অকর্ম্মণ্যতার পর্য্যায়ে গিয়ে পড়ছে—এ যুদ্ধটাও যে সাম্রাজ্যবাদের রঙে রঙীন গান্ধীজি তা বুঝতে পাচ্ছেন না !"

"তোরা তাই দেশ স্বাধীন করবার আশায় ছিঁটেফোঁটা ষ্ট্রাইক করিয়ে কর্ম্মপরায়ণতার প্রমাণ দিচ্ছিস্‌ ?"

"চুপ করে অন্তরের আহ্বানের প্রতীক্ষা করার চেয়ে এ কাজ নিশ্চয়ই খারাপ নয় !"

"প্র্যাকটিক্যাল জ্ঞান নিয়ে ত প্রশ্ন করতে পারি এতে পজিটিভ ভ্যালু কি পাওয়া গেল ?"

"আমাদের অসন্তোষের প্রমাণ দেওয়া গেল !"

"ব্যাপারটা স্রেফ্‌ আইডিয়্যালিজম্‌ ছাড়া ত আর কিছু নয় ?"

"যুদ্ধ এগিয়ে যাক্‌—দেখা যাবে !"

সুদাস অল্প একটু হেসে একটা সিগারেট তুলে নিয়ে চেয়ারে গা এলিয়ে দিলে : "জানিস্‌ প্রবীর, তোদের কম্যুনিষ্ট নামটাই পাল্টে ফেলা উচিত—নাম নিয়ে নে ফিউচ্যারিষ্ট। ভবিষ্যতের উপর সবকিছু চাপিয়েই ত তোরা নিশ্চিন্ত ! তোদের অধার্ম্মিক বলা অন্যায়—ভবিষ্যৎই তোদের ভগবান !"

প্রবীর চুপ করেই রইল। তর্ক করে লাভ নেই, বিশেষ করে সুদাসের সঙ্গে। কারণ সুদাস দুর্ব্বলতার দরুণ কখনো থেমে যায় না, থেমে যায় নিজেকে যথেষ্ট জোরালা মনে করলে। প্রবীরের মগজ কিছুতেই এখন পলিটিক্সের ঠাঁই করে দিতে চাচ্ছিলনা। কাজেই সুদাস এখন নিজেকে জোরালো মনে করুক।

প্রবীরের উত্তর না পেয়ে সুদাস সত্যি প্রসন্নতায় স্নিগ্ধ হয়ে উঠল। অখণ্ড মনোযোগে সিগারেটটা উপভোগ করতে সুরু করলে সে।

"তারপর, তুই কেমন আছিস ?" প্রবীর ঘরোয়া প্রসঙ্গে এসে ঢুকতে চাইল।

"কোনোরকম।"

"কিন্তু মনে হচ্ছে ভালোরকম !"

"কি করে ?"

"চেহারায় উৎসাহে, কথাবার্ত্তায় !"

"এসব জিনিষ ব্যবসায়ীর ফোঁটাতিলক, মনের অবস্থা এ দিয়ে বোঝায় না।"

"মনকে শরীর থেকে আলাদা করে ভাবা যায় না কি ?"

"তোরা ভাবতে না পারিস কিন্তু বুর্জ্জোয়ারা ভাবে।"

"বুর্জ্জোয়া ভাবনায় তোকে পেয়ে বস্‌ল ?"

"কি আর করা যায়, বুর্জ্জোয়াদের পথে গতিবিধি যখন !"

"ভালো—" প্রবীর আবারও চুপ করে গেল।

"দেখা যাচ্ছে সবই আজকাল মেনে নিতে শিখেছিস্—" সুদাস চোখগুলো কৌতুকী করে তুল্‌ল: "বিয়েটা তোকে সত্যি নরম করে ফেলেছে—"

"হয়ত।" অন্যমনস্ক থেকে প্রবীর বল্‌লে।

"তাহলে বিয়ে করা কি খুব উচিত হয়েছে ?"

"বিয়ে না করলেও তখন খুব উচিত হতনা।" প্রবীর অপ্রিয় আলাপ থেকে মুক্তিপাবার চেষ্টা করলে: "আজ চলি দাসু—টাকাটা কবে দিতে পারব বলতে পারিনা—" হাসিতে মুখটা অসম্ভব করুণ হয়ে উঠ্‌ল প্রবীরের।

"চলি মানে ?" সুদাস দাঁড়িয়ে গেল: "আমি যাবনা তোর বাসায় ?"

"এক্ষুণি যেতে পারবি কাজ ফেলে ?"

"যার জন্যে তুই এক্ষুণি বাড়ি যেতে চাস, কাজের চেয়ে তাকে দেখবার কৌতুহল আমার বেশি।" সুদাস দু'পা এগিয়ে প্রবীরের পাশে এসে দাঁড়াল।

"কৌতূহলের জন্যে শেষটায় আফশোষ করিসনে।" সুদাসের হাতের টিন থেকে একটা সিগারেট খুঁটে নিলে প্রবীর।

"যে মেয়ে তোকে বিয়ে করতে পেরেছে তার সঙ্গে আলাপ করে আফশোষ হতে পারে না—চল্—" সুদাস প্রবীরের পিঠে হাত দিয়ে আচমকা একটা ধাক্কা দিলে।

হাঁফ ছাড়বার জন্যেই যেন বাড়িটা দোতলা হয়েছে—উপরে উঠে একটু আকাশ পাবার জন্যে। তে-কোণা একটু উঠোন নিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম জুড়ে দুখানা ঘর—তার উপরে বরাবর দুখানাই ঘর, পরিসরে বরং একটা একটু ছোট কারণ সিঁড়ির জন্যে খানিকটা জায়গা ছেড়ে দিতে হয়েছে। নীচের দুখানা ঘরে দুজন ভাড়াটে—তাদের সঙ্গে এজমালি সর্তে উপরের ভাড়াটে প্রবীর কল-চৌবাচ্চার ভোগদখলকার। কল আর চৌবাচ্চা বাদ দিয়ে উঠোনে যে ক'ইঞ্চি জায়গা আছে এঁটোকাঁটার আর ভাতের গুড়োয় তা সবসময়ই আকীর্ণ। উপরের বাসিন্দেদের এই অনির্ণীত ড্রেনকেই রাস্তা করে নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছতে হয়। সুদাসকে নিয়ে প্রবীরের সঙ্কোচ হচ্ছিল। তাছাড়া এইমাত্র গাড়ির গালিচা থেকে পা নামিয়ে এনে এজায়গাটুকু হেঁটে পার হতে নিজেই সে কেমন যেন একটা অস্বস্তি অনুভব করছিল। নিজেকে এবং সুদাসকে অন্যমনস্ক রাখবার মতলবেই একটা কিছু বলতে হল তাকে: "মোটরটা একটা মারাত্মক ব্যাপার। অনিচ্ছাসত্ত্বেও নিজেকে বুর্জোয়া বলে মনে হয়।"

"তাতে এইমাত্র প্রমাণ হয়, আমাদের মনের রং-টা পুরোপুরি ইতর-বুর্জোয়ার।" সুদাস দু'জন মহিলা ও একপাল শিশুর কৌতূহলী দৃষ্টির মধ্য দিয়ে অত্যন্ত সতর্কতায় প্রবীরকে অনুসরণ করে চলল।

"তাতে ত অপরাধ নেই, কারণ আমরা সে শ্রেণীরই লোক!"

সিঁড়ির গোড়ায় এসে একটু থামল প্রবীর। কিন্তু সুদাসের পা বা মুখ কিছুই থাম্‌লনা, সিঁড়ি বেয়ে উঠ্‌তে উঠ্‌তেও বললে সে: "আমরা মানে? তোরা ত নিজেদের বলিস্ শ্রেণীহীন!"

"যাঁরা শ্রেণীহীন হতে পেরেছেন তাঁরা বলতে পারেন।"

"তাহলে বল্ তোরা পেটিবুর্জ্জোয়া কম্যুনিষ্ট!"

কিছু বল্‌বার আর সময় ছিলনা প্রবীরের। ততক্ষণে সে উপরে উঠে সুপ্রভার প্রায় মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গেছে।

প্রবীরের সঙ্গীকে রঞ্জন বলে ভুল করেছিল সুপ্রভা নইলে দুয়োরে এসে সে দাঁড়াত না। তবু সুদাসের সম্পূর্ণ অপরিচিত মুখ দেখে সে পালিয়ে গেলনা, কিন্তু ঘোমটা-টা খোঁপা থেকে তুলে কপালের কাছাকাছি এগিয়ে দিল।

"সুদাস—আমার ছেলেবেলাকার বন্ধু—" প্রবীর ব্যস্ত না হয়েই বল্‌লে।

হাত তুলে ছোট্ট একটা নমস্কার করে প্রবীরের আগেই গিয়ে সুপ্রভা ঘরে ঢুক্‌ল! দু'পা পিছিয়ে আছে সুদাস—তার জন্যে ঘরের দরজায় দু' সেকেণ্ড অপেক্ষা করে প্রবীর তাকে সঙ্গে নিয়ে নিলে।

মুখে আশ্চর্য্য সুন্দর একটা অভ্যর্থনার হাসি সুপ্রভার, সুদাস অপ্রতিভ না হবার চেষ্টা করে বল্‌লে: "প্রবীর আপনার কাছে নিজেকে নির্বান্ধব বলে পরিচয় দিয়েছে কি না জানিনে যদি দিয়ে থাকে—তবে যে তা কতো মিথ্যা রঞ্জনের পর আমাকে দেখে হয়ত বুঝ্‌তে পারছেন!"

"আপনি আর রঞ্জনবাবুকে ছাড়াও আমি আরেক জনকে চিনি।"

সুদাসের মুখে একটু ঝিমিয়ে পড়া হাসি দেখা গেল আর প্রবীরের মুখে একটু উদ্বেগ। সুপ্রভা ঘরের একমাত্র বেতের চেয়ারটার উপর সুজনি বিছিয়ে দিয়ে বল্‌লে: "বসুন—"

বসবার আগে সুজনিটা তুলে রাখবার উপক্রম করছিল সুদাস,

প্রবীর বল্‌লে—"ওটা তুলিসনে—ছারপোকা চাপা দেবার জন্তেই এ ব্যবস্থা।"

"জৈনদের মতো এতো মায়া না দেখিয়ে গরম জল ঢেলে মেরে ফেল্‌তে পারিসনে?"—নিজেই কিন্তু সুদাস ছারপোকার অস্তিত্ব সম্বন্ধে জৈনদের মতো নিস্পৃহ হয়ে চেয়ারটাতে নিজেকে অসঙ্কোচে প্রসারিত করে দিল।

"গরমজলে ওরা মরবে?" সুপ্রভা হাস্‌তে লাগ্‌ল: "অ্যামিবার জাত-ভাই ওরা, কিছুতেই মরে না।"

সুদাস হেসে উঠ্‌ল, বাঙালী মেয়ের কথায় বিজ্ঞানের গন্ধ পেয়ে খুসী হয়ে উঠেছে সে। প্রবীর নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত ছিল খানিকক্ষণ—জামাটা গা থেকে খুল্‌তে হয়েছে, তারপর একটা পুরোণো খবরের কাগজ খুঁজে এনে মেঝেতে বিছিয়ে দিয়েছে। তার উপর বসে এখন সে সুপ্রভাকে অনুরোধ জানালে: "সুদাসকে চা খাওয়াবে না?"

"নিশ্চয়—" সুপ্রভা ব্যস্ত পায়ে পাশের ঘরে চলে গেল।

"ভালো।" প্রবীরের দিকে নিষ্পলক তাকিয়ে থেকে সুদাস একটু একটু হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"কি?"

"ভালোই করেছিস্ বিয়ে করে!"

"ও," প্রবীর বুদ্ধিমানের মতো হাসল।

"মান্‌তে রাজি না আমার কথা?"

"বিয়েটা সত্যি ভালো কিন্তু মুস্কিল হচ্ছে তারপর টাকার ভীষণ দরকার হয়ে পড়ে!"

"কিন্তু টাকার অভাবটা সাংঘাতিক হয়না যদি একে অন্যকে ভালোবাস্‌তে পারে।"

"ভালোবাসা থাক্‌লে আর ডাইভোর্স কি করে হয়!"

"ভালোবাসা থাকার কথা নয় ভালোবাস্‌তে পারার কথাই বলছি। ভালোবাসতে পারেনা বলেই মানুষ বিয়েও করে

ডাইভোর্স'ও করে!" কথাটা বলেই সুদাস কেমন যেন একটু নিস্তেজ হয়ে পড়ল। শ্যামলীকে যে ভালোবাসতে পারবে এ বিশ্বাস কি নিজের উপর তার নেই আর তাই কি সে বিয়ের জন্যে পীড়াপীড়ি করে শ্যামলীকে ?

"তোর ধারণায় তাহলে বিয়ে আর ডাইভোর্স দুটোই দুর্ব্বলতার লক্ষণ!"

"তাছাড়া আর কি ? আর আরেকটা সত্যি কথা হচ্ছে এই যে আমরা সবাই দুর্ব্বল।"

"যাক বাঁচা গেল, তুই-ও নিজেকে অনেক নরম করে আন্‌ছিস এবং বিয়ে না করেই!"

"তাই নাকি ?" পকেট থেকে সিগারেটের টিন-টা তুলে নিয়ে সুদাস প্রবীরের কোলের উপর ছুঁড়ে দিল।

এককাপ চা নিয়ে এলো সুপ্রভা, সঙ্গে পটেটো চাপ্‌স্ নয় কয়েক-টুকরো বিশুদ্ধ আলুভাজা। সুদাসের সামনে এগিয়ে এসে সুপ্রভা প্রবীরকে বললে: "তোমার চা করা আছে—নিয়ে এসো গিয়ে।"

ভালোছেলের মতো প্রবীর উঠে গেল। সুদাস সুপ্রভার হাত থেকে চা-টা নিয়ে বললে: "ভাজার প্লেটটা চেয়ারের হাতলের উপরই রাখুন।"

"তাই রাখছি।" সুপ্রভা হেসে ফেললে।

"চা-টা আপনি ভালো করেন—" একচুমুক চা টেনে বললে সুদাস: "এবং তা থেকে বোঝা যায় ভালো সেবা-যত্ন পেয়ে প্রবীর আরামেই আছে!"

"বাঙ্গালী ছেলেরা সেবাযত্নের লোভেই ত বিয়ে করে আর তাছাড়া সেবা করার জীবিকাইত ছিল আমার।" চেহারাটা সুপ্রভার যত মোলায়েমই থাক কথাগুলো খুব ধারালো করেই বললে।

চায়ের কাপের উপর উবু হয়ে ঠোঁট লাগিয়ে প্রবীর এসে ঘরে ঢুকল।

"শুনছিস্ প্রবীর—" কথাগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে বলা দরকার বলে কয়েকটা আলুভাজাই চিবোতে শুরু করলে সুদাস: "ইনি বলছেন বাঙালী ছেলেরা না কি সেবাযত্নের লোভেই বিয়ে করে।"

"সম্পূর্ণ মিছে কথা—" প্রবীর চায়ের কাপটা মেঝেতে রেখে একটা সিগারেট ধরিয়ে দেয়ালে হেলান দিলে।

"তাই না—" থুতনির নীচেটা সুপ্রভার অভিমানে ভারি দেখালে: "আমার কাজ তুমি আমায় করতে দিচ্ছ?"

"ওটা একটা মহৎ কাজ নয়।"

"তোমার সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে নাইট স্কুলে পড়ানো একটা মহৎ কাজ!"

"পড়ানো কেন, দু-একটা বস্তিতে কি তোমার নার্সের বিদ্যা কাজে লাগেনি?"

"প্রবীরের নামে মিথ্যে অভিযোগ আপনার, কম্যুনিষ্ট হয়ে ও কি আপনাকে হেঁসেলে ঢুকিয়ে রাখতে পারে?" সুদাস মধ্যস্থের ভূমিকা নিয়ে বললে।

"তা-ও ভালো ছিল—" সুপ্রভা এমন ভাবে হাস্তে শুরু করলে যে আঁচল টেনে মুখে গুঁজতে হল: "কিন্তু ওর জ্বালায় নিরিবিলিতে হেঁসেলেও থাকা যায়না, আমাকে সাহায্য করবার নাম করে যা কাণ্ড একেকসময় করে বসে—" আঁচলেও হাসি থামলনা সুপ্রভার।

"ও কিছুতেই স্বীকার করবেনা আমি রাঁধতে জানি—" অসহায় হাসিতে সুদাসের কাছে আবেদন জানালে প্রবীর।

মুখ নীচু করে ফেলবার প্রয়োজন বোধ করলে সুদাস—কাপে যতটুকু চা ছিল তা না খেলেও চলে, তবু মুখ নীচু করে ওইটুকুই টেনে নিতে হল। যেন হঠাৎই আবিষ্কার করল সুদাস যে ছোট ছোট কথার হুল প্রবীরকে নাগাল পাবার স্পর্দ্ধা করতে পারেনা।

মাথা নীচু করে সুদাস তার অতীতের সেই স্পর্দ্ধাকেই যেন লুটিয়ে দিতে চাইল।

"স্বীকার করিনে মানে? তোমার রান্না ত আমি খেয়েছি!" হাসি চেপে সুপ্রভা প্রবীরকে অকূলে ভাসাতে চেষ্টা করলে।

"খেয়েছ এবং তৃপ্তির সঙ্গে।" অকূলে ভাসতে চাইলনা প্রবীর!

"এক কাপ চা তৈরী করেই সুদাসবাবুকে সে-তৃপ্তিটা দাও দিকিনি—ওঁর চা ফুরিয়ে গেছে—"

"না-না আমার আর চা লাগবেনা—" চোখ প্রায় কপালে তুলে বল্‌লে সুদাস: "তাছাড়া আমার চা তৈরীতে ওর এমন কিছু প্রেরণা আস্‌তে পারেনা যাতে আপনার মুখের তৃপ্তি আমিও পাব!"

"এ আপনি আপনার বন্ধুর উপর অবিচার করছেন—"

"বিয়ের আগে বন্ধুদের কাছে বন্ধুত্বের সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত থাকে—পরে নয়।"

"কিন্তু আমিও সে-সর্ব্বস্বত্ব হাতে নিয়ে বসিনি।"

"আপনি তাহলে সত্যিকারের কম্যুনিষ্ট!" সুদাস সশব্দে হেসে উঠল। তারচেয়েও বেশি হাসতে লাগল সুপ্রভা।

সুদাসকে মোটর পর্য্যন্ত পৌঁছে দিতে এলো প্রবীর। কিন্তু প্রবীরের সঙ্গে সুদাসের একটি কথাও হলনা—কেবলি শ্যামলীকে মনে পড়ছিল তার। মোটরে উঠবার আগে মাত্র সুদাস হঠাৎ প্রবীর সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। এবং হঠাৎই সে অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলে উঠল: "টাকা-পয়সার তোর খুবই অভাব যাচ্ছে—না রে?"

"বলাবাহুল্য", বেশ সহজ ভাবে উত্তর দিলে প্রবীর।

"কি করে চলে?"

"একআধটা টিউশনি জুটে যায়, লেফট্ লিটারেচারের দালালিতে

কিছু হয়—কিন্তু তাতে কুলোয়না, তাই ত শেয়ার মার্কেট-টা ভেবেছিলুম ভালো !"

"ক্যাপিটালিষ্ট সোসাইটিকে সার্ভ করবিনে এ আত্মঘাতী ধারণা রেখে লাভ নেই—চাকরি কর।"

"হয়ত সিরিয়াস্‌লি চাকরি খুঁজতে হবে। টাকার দরকার আছে। ওর শরীর ভালো নয়—এখন থেকেই ডাক্তার দেখানো উচিত, তোর টাকাটা সে-জন্যেই ! মাস পাঁচ-ছয় পর হয়ত আবার একটা মোটা টাকার দরকার হবে। আর তারপর ত টাকা চাই-ই।" লজ্জিত হাসি না হেসে প্রবীর বলিষ্ঠভাবে হেসে উঠল।

"টাকার দরকার থাকলে আমার ওখানেই যাবি।" মুখটা সুদাসের কেমন দেখাচ্ছে নিজেই সে তা আঁচ করতে পারলেনা আর তাই তাড়াতাড়ি মোটরের ভেতরে ঢুকে পড়ল।

প্রবীর এসে উপরে উঠতেই সুপ্রভা হেসে লুটিয়ে পড়ল : "এ তুমি কি রকম বন্ধু নিয়ে এসেছিলে ?"

প্রবীর অবাক হ'ল, "কেন ?"

"বই-এর ভাষায় মেপে-মেপে কথা বলেন !"

"ও" প্রবীর আশ্বস্ত হয়ে বল্‌লে : "মেয়েদের সঙ্গে ওর মেলামেশা কম। আগে ত মেয়েদের সঙ্গে রূঢ় ব্যবহারই করত—রূঢ়তাকে ঢাকবার জন্যেই হয়ত এখন মেপে কথা বলে !"

"কিন্তু এ-বন্ধু তোমার লোক ভালো অন্তত সে-বন্ধুর মতো নয় !"

"মহীতোষের মতো হতে যাবে কেন সুদাস ?"

"হতে ত পারত -তাই বল্‌ছি।"

"ওসব বাজে কথা থাক্‌—ভালো আছ আজ ?"

"নাঃ—" সুপ্রভা একটু গম্ভীর হয়ে গেল।

"কালই একজন ডাক্তার ডাকা যাক্‌, কি বল ? তোমার পরিচিত কেউ আছেন না কি ?"

"আমার পরিচিত যাঁরা ছিলেন তাঁরা ত সবাই তোমার বন্ধু মহীতোষবাবুর মতো!" গাম্ভীর্য্য মুছে ফেলে আবার হেসে ফেল্‌ল সুপ্রভা।

"তাহলে আমার পরিচিতেরই শরণ নিতে হয়!"

"ডাক্তার দিয়ে কি হবে—কি দরকার এতো হাঙ্গামায়!"

"বিজ্ঞানে যখন আমি বিশ্বাসী—দরকার হলেই বিজ্ঞানের শরণ আমি নোব।"

"এ তোমার বিলাস! রোগে ভুগে কতো মানুষ কতো ভীষণ যন্ত্রণা পায়, পয়সার অভাবে একফোঁটা অষুধ পর্য্যন্ত পায়না! তা জেনেশুনেও বুঝি তুমি পয়সা আছে বলে একটা সাধারণ ব্যাপারে ডাক্তার আর অষুধ নিয়ে হৈ-চৈ লাগিয়ে দেবে!"

"হৈ-চৈ-টা পরে করার চেয়ে আগে করে রাখাই ভালো। ওটা পয়সা থাকার লক্ষণ নয়, বুদ্ধির লক্ষণ।"

"থাক্—তোমার সঙ্গে সারাদিন আমি তর্ক করতে পারবনা।"

চেয়ারটা দখল করে সুপ্রভা পা দোলাতে সুরু করলে।

জানালার গোড়ায় দেয়ালের উপর আশ্রয় নিলে প্রবীর—কলেজ-জীবনে এভাবে বসেই মাষ্টারদের বক্তৃতা শুনেছে সে। প্রথম-প্রথম সুপ্রভা আপত্তি জানিয়ে বলেছিল: 'চেয়ার কিন্‌লে দুটোই কিনতে হয়।' দুটো কিন্‌বার অসামর্থ্য চেপে রেখে চেয়ারের প্রতি ঔদাসীন্য দেখিয়ে কৈফিয়ৎ দিয়েছিল প্রবীর: 'চেয়ারের পিঠ থেকেত আর হাওয়া আসেনা, এখানে হাওয়া দেখেছ?" সুপ্রভা হাওয়া দেখতে চায়নি এবং চেয়ারেও আপত্তি জানায়নি।

"জানো, তোমার বোন এসেছিল আজ দুপুরবেলা—সুবীর নিয়ে এসেছিল—" খানিকক্ষণ চুপ থেকে সুপ্রভা হঠাৎ এই তুমুল সমাচার প্রচার করল।

"কে, অনু?" খানিকটা সন্ত্রস্তই মনে হ'ল প্রবীরকে।

"অনু। চমৎকার মেয়ে!"

"অনু হঠাৎ এলো কি করে?"

"সিনেমার নাম করে নাকি বেরিয়েছিল ওরা—অবশ্যি আমার সঙ্গে দেখা করা সিনেমার ছবিরই ত একটা ঘটনা!" সুপ্রভার মুখের উপর দিয়ে একটা ছায়া উড়ে গেল।

"হতে পারে সিনেমার ঘটনা। কিন্তু ওদের ত আমি ডাকতে যাইনি, ওরা কেন আসে?"

"সিনেমায়ও ডাক্‌তে যাওয়ার দৃশ্য থাকেনা!" সুপ্রভার মুখ অনেকটা হাল্কা হয়ে এলো।

"তুমি জিজ্ঞেস করলেনা, কেন ওরা এল?"

"একথা জিজ্ঞেস করা যায় কাউকে—আর অনু ত চড়াসুরে বাঁধা তোমার মতো কম্যুনিষ্ট নয়, ভালো মেয়ে।"

"সুবীরও কিছু বল্‌লেনা?"

"বললে। সুবীরের মুখে আমার কথা শুনে আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্যে পীড়াপীড়ি করছিল অনু!"

"তামাসা দেখার সখ!"

"ওদের উপর রাগ করছ কেন তুমি—তোমার মাবাবার মতো ত বয়েস নয় ওদের যে এ বাড়িতে পা দেবেনা বা পা দিলেও তামাসা দেখবার জন্যে দেবে!"

"তুমি কি করে জানো সুবীর গিয়ে আমাদের খবর মা-বাবাকে দেয়না?"

"শত হোক সুবীর পলিটিক্‌স্ করে ত!" সুবীর সম্বন্ধে একটা নিশ্চিন্ততার ভাব মুখে এনে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকে সুপ্রভা।

"ওদের আবার পলিটিক্‌স্!"

"কেন, পলিটিক্‌সের বাঁধা সড়ক কি তোমাদেরই না কি?"

"তুমি মিছিমিছি ওদের ভালো ভাব্‌ছ কেন?"

"তুমি বা কেন খারাপ ভাব্‌ছ?"

"ভালো-খারাপ আমি কিছুই ভাব্‌ছিনে। ভাব্‌ছি আমার সঙ্গে ওদের দরকার নেই।"

"অমুর মতো একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার আমার দরকার ছিল।"

"বেশ, যেয়ো অমুর বাড়িতে!"

"তা কেন যাব, ও-ইত আস্‌বে বললে!" হাসতে সুরু করলে সুপ্রভা।

"একটা চরকা নিয়ে ত?" প্রবীরের মুখেও হাসির আভাস দেখা গেল।

"মন্দ কি, বসেই ত থাকি। তোমার সার্টের জন্যেও ত খদ্দর দরকার!"

"নাইটস্কুলে না গেলে ত বসেই থাক্‌তে হয়!"

"তোমাদের পার্টির কাজ সবার ভালো লাগবে তার কি মানে আছে?"

"আলসেমি ভালো লাগলে আমাদের কাজত ভালো লাগতে পারে না!"

"বস্তির বাচ্চাদের ক-খ শেখানোর চেয়ে কুঁড়েমি আর আছে না কি?" সুপ্রভা উঠে গিয়ে মেঝেতে একটা পাটি বিছিয়ে দিলে—চেয়ারে বসে থাকতে ভালো লাগছিলনা তার। পাটির উপর গা ঢেলে দিয়ে চোখে-মুখে স্বস্তি ফিরে এল: "আমার কিন্তু এখন কুঁড়েমিতে পেয়ে বসেছে!"

"কুঁড়ে হয়ে উঠছ বলেই ত ডাক্তারের পরামর্শ দরকার!"

"ওখান থেকে কথা বললে কারো পরামর্শই আমি নোবনা!" অদ্ভুত অভিমানের ছোঁওয়ায় চোখগুলো সুন্দর করে তুলল সুপ্রভা।

"কি করতে হবে?" কি করতে হবে জেনেও প্রবীর অবান্তর-ভাবে কথাটা বলে জানালার আরাম ছেড়ে গভীরতর আরামের দিকে এগিয়ে এল।

"এখানে বস্‌তে হবে—আমার কাছে। সারাদিন শুধু বাইরে-বাইরে ঘুরবে—" কথা শেষ করতে পারলনা সুপ্রভা, গলায় তার অভিমান গাঢ় হয়ে উঠল।

বাড়ি এসে সুদাসের মনে হচ্ছিল যা কিছু পাবার সবই যেন সে পেছনে পথে-পথে ফেলে এসেছে। প্রবীর আর সুপ্রভাকে দেখে এ বোধটা তার আরো তীব্র হয়ে উঠেছে মনে। শ্যমলী বলে—গভীর বিশ্বাস নিয়েই বলে, তাদের না কি দেনাপাওনার আর কিছুই বাকী নেই। কিন্তু সুদাস ত এ-বিশ্বাস দিয়ে মনকে চুপ করিয়ে রাখতে পারেনা। কেবলি তার মনে হয় কিছুই যেন তার পাওয়া হলনা। অনেক বেশি চাওয়া হয়ত সুদাসের মনের একটা কু-অভ্যাস—এমন কিছু পাওয়া চাই যাতে নিজেকে পুরোপুরি হারিয়ে ফেলা যায়; সে-পাওয়ার আগে সুদাসের মন হয়ত থাম্‌তে চাইবেনা। এই অতৃপ্তির জোরেই ব্যাঙ্ক তার এগিয়ে চলছে আর এই অতৃপ্তিতেই মন তার মেঘাচ্ছন্ন হয়ে উঠছে দিনকে দিন। অতৃপ্তির জন্যেই কোনো রাজনৈতিক দলের সঙ্গে রং মেশানো সম্ভব হয়নি তার—সুদাসের ভয় হয়, কোনোসময় ভালোবাসার রং-ও না বিষিয়ে তোলে এই অতৃপ্তি!

শ্যামলী বলেঃ "ক্লাশের অনেক মেয়ের মুখেই শুন্‌তে পাই তাদের ভবিষ্যৎ ফাঁকা, আঁকড়ে ধরবার মতো কিছু নেই সামনে। আমার ত তা নয়! আমি ওদের চেয়ে কতো সুখী ভাবো ত একবার!"

ভালবাসার স্বাদ হয়ত শ্যামলীর মনে নূতন, পারিবারিক ভালো-বাসার স্নিগ্ধতাও হয়ত কোনো দিন তাকে স্পর্শ করে যায়নি—গরীব বাঙালী পরিবারের মেয়েরা পরিবারের স্নেহের স্পর্শ দাবী করতে পারে না। যে স্বাদ নূতন তার একটুতেই মন ভরে ওঠে। শ্যামলীর তাই অনুযোগ করবার কিছু নেই। কিন্তু সুদাসের শৈশব আর

কৈশোর মা আর বাবার অগাধ স্নেহে সিঞ্চিত—ভালোবাসার নরম স্বাদে ভরে আছে তার মন। সে-মনকে সুখী করতে হলে ছোট ছোট মুহূর্ত নিয়ে চলেনা, চলেনা ভবিষ্যতের সুখের স্বপ্ন নিয়ে। 'তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুইব্যা মরি—' বাংলাদেশের পল্লী-প্রেমিকের এই তীব্র আবেগ সুদাসের ইচ্ছার গায়ে রঙ বুলিয়ে যাচ্ছে। আবেগের রাজ্যে বুদ্ধিকে আর মেধাকে অনুপস্থিত রাখতে চায় সুদাস। সেখানে সে বাংলাদেশের নরম মাটির নরম মনের ছেলে।

সুদাস মনে-মনে তার শিক্ষিত নাগরিক সত্তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দেয়ঃ তোমাকে ত অনেক সময় দিচ্ছি—তার মানে জীবনের অনেকখানি। রক্তমাংসের মানুষ হয়ে থাকতে দাও আমায় খানিকক্ষণ, যখন আমি আমার শরীরকে খুঁজে পাব, পাব মনের আর হৃদয়ের ধ্বনি শুন্‌তে। বুদ্ধির আর মননের ছায়াবাজি নিয়েইত আছি—আমি বলে যে একটা পদার্থ আছি, তখনত তা ভুলেই থাকি—একবার সেই পদার্থটাকে স্মরণ করতে দাও, তার পাওনা চুকিয়ে দিই তাকে!

কিন্তু কোথায়—সুদাস কোলের উপর রাখা 'শেষের কবিতা'র দিকে তাকাল—ভালোবাসাটাকেও আমরা প্রসাধিত করে তুল্‌ছি। নিছক কবিতায় মোড়া অমিত রায়ের ভালোবাসাকে গ্রহণ করবারও পাত্রী জোটে! লাবণ্যের এই সৌখীনতা রোগ-বীজাণুর মতো বাংলাদেশের মেয়েদের মনে ছড়িয়ে পড়ছে। হয়ত শ্যামলীও এ রোগেই আক্রান্ত। 'হে বন্ধু বিদায়!' অনিচ্ছাসত্ত্বেও কথাটা মনে পড়ল সুদাসের—ইচ্ছার বিরোধিতা করে মন ভাবতে সুরু করল যদি শ্যামলীও কোনোদিন বলে তাকে—'হে বন্ধু বিদায়!' 'অসম্ভব'—সুদাসের ইচ্ছা মনকে দিয়ে জোর করে বলিয়ে নিলে। এককাপ চা দরকার। "সীধু—চা দিয়ে যা এককাপ—" চেঁচিয়েই যেন উঠ্‌ল সুদাস। কিন্তু এতে চল্‌বেনা, এইটুকু শব্দে মনের সঙ্গে

এতক্ষণ কথা বলার স্মৃতি মুছে দেওয়া যাবেনা। আরো কথা চাই : "এতক্ষণ বসে আছি—একটু চা-ও দিলিনে !"

"এই দিচ্ছি বাবু—তুমি পড়ছিলে কি না।" চায়ের বাসন-কোসন অনাবশ্যকভাবে সশব্দে নাড়াচাড়া করে সীধু তার কর্ম্ম-তৎপরতার সংবাদ দিলে।

চা আর সিগারেটেও সুদাস যথেষ্ট স্বাভাবিক হতে পারলনা। ভেতর থেকে একটা অস্থিরতা ফুঁসেফুঁসে উঠছে যেন তার সমস্ত শরীরে। পাঞ্জাবীতে মাথা গলিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। লেকটা ঘুরে আসা যাক খানিকক্ষণ, ক্লান্ত করে তুল্‌তে হবে শরীর, নইলে হয়ত ঘুমও হবেনা।

লেকে হাওয়া আছে, জলের আর গাছের পরিবেশে ইলেক্ট্রিকের আলোও ঠাণ্ডা, বিনম্র দেখায়। আর সব চেয়ে ভালো আবহাওয়াটা নিঝুম নয়, ঝিমিয়ে-ঝিমিয়ে হাঁটলেও মানুষ হাঁট্‌ছে—মাঝে মাঝে ছু'একটা মোটর পিছলে যাচ্ছে রাস্তায়। খুসী হয়ে উঠল সুদাস। প্রকৃতির আর মানুষের শিল্প সুস্থ মেলামেশায় বসবাস করুক, সুদাসের মন তাই চায়—ভারসাম্য নষ্ট করোনা। খুসী হয়ে সুদাস হাঁটতে সুরু করল। 'বিয়ের পর রোজ সন্ধ্যায় আমরা লেকে বেড়াব, না ? মোটরে নয় কিন্তু।'—মনের উপর শ্যামলীর কণ্ঠ শুনছে সুদাস। মনকে উত্তর দিল সে : 'নিশ্চয় !' পুলের উপর এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল সুদাস।

বালিগঞ্জ ষ্টেশন থেকে একটা ট্রেন ছুটে বেরিয়ে এলো—তার শব্দের বীভৎসতায় বিশ্রীভাবে কেঁপে উঠেছে লেকের আবহাওয়া। মোটরের গতিবিধি অনায়াসে সহ্য করতে পারে লেক—কিন্তু ট্রেনকে যেন বরদাস্ত করা যায়না। এখানে এটা সত্যিকারের জবরদস্তি। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সুদাস ট্রেনের উপরই চিন্তাটাকে জড়াতে সুরু করল। পুলের উপর যে একটা ছায়া এগিয়ে আসছে ততটা যেন খেয়াল ছিলনা তার। ছায়াটা সামনাসামনি হতেই চমকে গেল

সুদাস। একটি মেয়ে—একা একটি মেয়ে! রাত দশটা হবে এখন—একা একটি মেয়ে। শাড়িটার চেহারায় ভদ্রত্ব নেই কিন্তু পরবার ভঙ্গীটা ভদ্র। সুদাসের দিকে তাকিয়ে থামবার একটা ভঙ্গী করে আবার ধীরে ধীরে এগোতে সুরু করল মেয়েটি—কয়েক পা' এগিয়ে ফিরে তাকাল আবার সুদাসের দিকে। অবাক চোখে তাকিয়ে সুদাস ভাবতে লেগে গেল—মেয়েটিকে কোথাও দেখেছে কি সে আগে? ছাখেনি। তবে? পুলের প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াল মেয়েটি—দাঁড়াবে বলেই রেলিং-এ পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

খানিকক্ষণ আগে দেখা একটা দৃশ্য হঠাৎ মনে পড়ে গেল সুদাসের। লেকের আনাচেকানাচের গলিতে, ঝোপঝাড়ের আড়ালে কচ্ছপের মতো হু'একটা মোটরকে থেমে থাকতে দেখে এসেছে সে। মোটরগুলো আসে হয়ত এ ধরণের মেয়েদেরই খোঁজে অথবা হয়ত এ-ধরণের মেয়েরা আসে এ-ধরণের মোটরেরই খোঁজে। হ'তে পারে মেয়েটি ভদ্র ঘরের নয় কিন্তু তার চেয়ে বেশি সম্ভব, মেয়েটি হয়ত একদিন ভদ্রঘরেরই ছিল!

মেয়েটিকে পেছনে রেখে পুল থেকে নেমে এল সুদাস। রাস্তায় নেমে একটু জোরেই হাঁটতে সুরু করল সে। খানিকক্ষণ হেঁটে বুঝতে পারল ভয়টা তার অনর্থক—তার পেছু নেয়নি মেয়েটি। হয়ত এখনো পুলের উপরই দাঁড়িয়ে আছে—হয়ত এরি মধ্যে দেখা পেয়ে গেছে এমন কারো মেয়েটিকে দিয়ে যার প্রয়োজন আছে।

মেয়েটি কি একদিন ভদ্র ছিল? অভদ্র নয় চেহারা—চোখের কোলে শুধু একটু ক্লান্তির কালিমা যেন লক্ষ্য করেছে সুদাস। মেয়েটি হয়ত ভদ্রপরিবারেরই মেয়ে অথবা বোন ছিল একদিন। এখন মনে হ'ল সুদাসের ইতিহাসটা জেনে এলে ক্ষতি ছিলনা কিছু। কিন্তু ইতিহাস ত কল্পনাই করে নিতে পারে সে। হয়ত কোনো গরীব মধ্যবিত্তের মেয়ে, বাপের ত্রিশ টাকা বেতনে পরিবারের আটদশটি মুখে একবেলাও ভাত পড়েনা—নিঃস্ব কোনো বিধবা মায়ের মেয়েও

হতে পারে, ছোট ছোট ভাইবোনের ভাতের জোগাড় যে-করেই হোক তাকে করতে হয়। তাছাড়া আর যা হতে পারে সুদাসের কল্পনায় সেটা ভয়ঙ্কর মনে হয়। হয়ত স্বামী আছে মেয়েটির, পঙ্গু—স্বামীর সম্মতিতেই হয়ত এ-ধরণের কাজ করতে হচ্ছে তাকে।

বাড়ির সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে ভাবছিল সুদাস মেয়েটির হাত থেকে পালিয়ে বাঁচেনি সে, পালিয়ে এল দারিদ্র্যের বীভৎসতা থেকে। মেয়েটির নাম অন্তত সে জিজ্ঞেস করতে পারত! মন থেকে একটু স্নেহ, একটু সহানুভূতি কি দেওয়া যেতনা ওকে? সুদাস ভেবেছে তাতে তার পরিশীলিত সত্তার ক্ষতি হবে। আসলে হয়ত সে-ও 'শেষের কবিতা'রই মানুষ, রক্তমাংসে সাধারণ মানুষ হয়ে বাঁচবার ইচ্ছা তার একটা মানসিক বিলাস মাত্র। নিজেকেই বিদ্রূপ করবার জন্যে সুদাসের ঠোঁটে একটা বাঁকা হাসি ফুটে উঠল।

তিন

ভারি ভালো লাগছিল অনুর সুপ্রভার সঙ্গে আলাপ করে এসে। সেই ভালো লাগাটাকে জীইয়ে রাখবার জন্যে সুবীর ছাড়া বাড়িতে আর এমন একটি প্রাণীও নেই যার সঙ্গে সুপ্রভাকে নিয়ে খানিকক্ষণ কথা বলা যায়। বেরোবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করছিল সুবীর, কিন্তু একপশলা খোসামোদের পর শেষটায় একরকম জবরদস্তি করেই নীচের ঘরে তাকে বসিয়ে দিয়ে বললে অনু: "আমরা যদি বৌদিকে এখানে আস্‌তে বলি, বৌদি কি আস্‌বেন, ছোড়দা?"

"আমরা—কারা?" সুবীর বিরক্ত হয়েই বললে।

"আমি আর তুমি?"

"আমরা কে?"

"আমরা ত মা বাবাকেও বলতে পারি!"

"আমি কাউকে কিছু বলতে পারবনা।"

"বা রে, বড়দা চিরকাল ঐ একটা বাড়িতে থাকবেন ?"

"বাড়িটা ত খারাপ নয়, কম্যুনিষ্টদের পক্ষে ত স্বর্গই বলা যায় !"

"বড়দা কি কম্যুনিষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়, বড়দা নয় ?"

"কিন্তু বৌদিত কম্যুনিষ্ট ছাড়া আর কিছু নয়, বৌদি আসবে কেন ?"

"বৌদি কম্যুনিষ্ট ছাড়াও বৌদি—তা নইলে তুমি কি করে আলাপ করতে যাও—কম্যুনিষ্টরাত কেটে পড়েছে তোমাদের দল থেকে !"

"থাক্, ওসব কথায় আর মাথা দিয়ে কাজ নেই—" বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক দলের লোক মেয়েদের সঙ্গে রাজনীতির চর্চ্চা করতে পারে না! সুবীর নাক উঁচু করে উপরের দিকে তাকিয়ে রইল।

"ওসব কথায় মাথা না-ই দিলাম" সুবীরের মিলিটারি উত্তাপটাকে নামিয়ে আন্‌বার চেষ্টায় অনর্থক হাসতে সুরু করল অনু: "কিন্তু বলো তুমি বৌদিকে বলবে কি না!"

"পাগল না মাথাখারাপ, আমি বললেই বৌদি আসবে নাকি ?" একটু ঠাণ্ডা হতে সুরু করে সুবীরের মেজাজ আবার খানিকটা চড়ে গেল: "তাছাড়া এসব পারিবারিক ব্যাপারে আমি নেই !"

হাসির সুর টেনেই বল্‌লে অনু: "তুমি এতে পারিবারিক ব্যাপার দেখছ কোথায়—সবটাই ত পরিবারের বিরোধী !"

"যা-যা, তোর বক্‌বক্ শোনবার আমার সময় নেই—" সুবীর এবার বেরোবে বলেই বেরুতে চাইল। কিন্তু দুয়ার থেকেই ফিরে আসতে হল তাকে। শমীন তাকে এগিয়ে দিলে:

"ঘড়ি ধরে কে পলিটিক্স করে—খানিকক্ষণ বসে যাও !"

"বসলেও ঘড়ি ধরে বস্‌তে হবে শমীনদা,—পাঁচমিনিট !" ফিরে আস্‌তে আস্‌তে বল্‌লে সুবীর।

"পাঁচমিনিট সাধুসঙ্গই বা কম কি ?" যেন অনুকেই জিজ্ঞেস করল শমীন।

"আজ একটা অদ্ভুত খবর আছে, শমীনদা—" অনুকে খানিকটা উচ্ছল মনে হল।

"ফরোয়ার্ড ব্লকের ব্যাপারে নয়ত?"

"ফরোয়ার্ড ব্লকের ব্যাপারটা ত তোমাদের পক্ষে অদ্ভুত নয়, মর্ম্মান্তিক!" ছুরির ফলার মতো একটা হাসি ছুঁড়ে দিল সুবীর।

"তোমরা বলতে তুমি যাদের বোঝাতে চাও, তারা ত দল নয়, দেশের মুক্তিকামী একটা সত্তা। সমস্ত দল-উপদলের মুক্তি-কামনা কি তাদের ভেতর বেঁচে নেই? তোমাদের কাজ যদি কাজ হয় তা তাঁদের পক্ষে মর্ম্মান্তিক হবে কেন?"

"এতো ভালোমানুষ সাজতে চাইলেই কি সাজতে পারবে শমীনদা—না কেউ স্বীকার করবে তোমাদের ভালোমানুষ বলে?" সুবীর রাগ চেপে-চেপে ক্রমশই লাল হয়ে উঠছিল: "আনক-স্প্রোমাইজিং বলে আজ আর বাঙালীকেই দোষ দিতে পারবেনা। তোমার 'মুক্তিকামী সত্তা'র বিরুদ্ধে সারা ভারতবর্ষেই আজ আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে!"

"তাঁদের চেয়ে সার্থক মুক্তিকামী সত্তার যদি জন্ম হয় ত ভালো।" মহাপুরুষের কণ্ঠে নয় একটু বিদ্রূপের সুরেই বললে শমীন।

"শুনে দুঃখিত হবে যে আমাদের সার্কুলেশন 'হরিজনে'র চারডবল!"

"ভারতবর্ষের লিটারেসি বাড়ছে শুনলে ভারতবাসী দুঃখিত হয়না!"

"রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা বাড়ছে শুনলে মুক্তিকামনার সোল্-প্রোপ্রাইটার কি সুখী হন?"

শমীন চুপ করে গেল। সুবীরের চড়া সুরের কথাগুলো হজম ক'রে নিতেই যেন তাকে একটু একটু হাসতে হচ্ছিল। কিন্তু চড়া সুর ভেজেও সুবীর ক্লান্ত হয়ে পড়েনি, উঠে সটান দাঁড়িয়ে বললে সে: "চলি আজ শমীনদা, কিছু মনে করোনা!"

"মনে করবার কি আছে বলো—তোমার ধারণার সঙ্গে আমার ধারণাটা মিলছে না।" শমীন ঠাণ্ডা চোখে তাকাল সুবীরের দিকে।

"ধারণাটা তোমার বাঙালীর নয়, সেই ত দুঃখ!"

"আমার কি দুঃখ জানো, বাংলা দেশে কংগ্রেসের ভাব আর রূপ কোনোটাই প্রকাশ পেলনা!"

"কংগ্রেসের আদর্শের চেয়ে ঢের পুরাণো বাংলাদেশের রাজনীতির আদর্শ, কাজেই আমরা যদি কংগ্রেসকে গ্রহণ করতে না পারি তাতে দোষত নেই!"

"দোষ নেই সত্যি কথা, কিন্তু কংগ্রেসকে ঠেকিয়ে রেখে দেশের মানুষগুলোর জন্যে এমন কিছু ত আমরা করতে পারলুম না যাতে তাদের সত্যিকারের উপকার হয়। ধরা ছোঁওয়া যায় এমন কিছু কাজ তোমরা করছ কি?"

"দলসংগঠনের সময় তুমি কাজ আশা করতে পারো না!"

"এখনকার কথা নয় যখন কংগ্রেসে ছিলে তখন? কর্পোরেশনের পলিটিক্স ছাড়া বাংলাদেশের পলিটিক্স আর কিছু করতে পারে বলে ত আমার মনে হয়না!"

"কাজ তখন কেন হলনা সে-প্রশ্নের কেঁচো খুড়তে গেলে সাপ উঠবে শমীনদা, কাজেই থাক।"

"আবার যদি সে-তর্কেই ফিরতে হয় সুরুতে যা ছিল তাহলে থাক—"শমীন হেসে উঠল।

সুবীর মুক্তি পেয়ে দ্বিরুক্তি না করে পালিয়ে বাঁচল।

এম্নি বসেছিল এতক্ষণ অনু যেন ঘরে সে নেই। সেই পাথরের মূর্ত্তিতে এখন প্রাণস্পন্দন দেখা গেল। সুবীরের সামনে অনুর অস্তিত্ব অনায়াসে পুরোপুরি স্বীকার করে নিতে এখনো কেমন একটু সঙ্কোচ আছে শমীনের। সে-সঙ্কোচটা শ্রদ্ধা করে চলে অনু!

"ছোড়দার সঙ্গে কেন মিছিমিছি তুমি তর্ক কর?" ঘরের উত্তাপের উপর খানিকটা স্নিগ্ধতা পড়ল।

"সুবীর কি রাগ করে?" অনুকে ভুল বুঝল শমীন।

"তা নয়। পার্টি নিয়ে ক্ষেপে আছে ও। যারা ওরকম ক্ষেপে থাকে তাদের কাছে যুক্তি দিয়ে কি লাভ?"

"ও—"হাসিতে একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠল শমীন: "সুবীরের পলিটিক্সে মাতামাতি দেখে তোমার বাবা কিছু বলেন না? প্রবীরের ও-ঘটনার পর ত তোমাদের বাড়িতে পলিটিক্স-চর্চ্চাই বন্ধ হওয়া উচিত ছিল!"

"বাবা ঠিক তার উল্টো হয়ে গেছেন। আগে যদি বা দু-এক কথা বল্‌তেন এখন একদম চুপচাপ! আমি চরকা কাটছি বাবার তাতে বরং খানিকটা উৎসাহই দেখা যাচ্ছে!"

"বাবা হয়ত গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা করেন!"

"আজীবন চাকরি করে এসে গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা!"

"ওটা বরং স্বাভাবিক—কিন্তু আজীবন কংগ্রেস করে গান্ধীজিকে অশ্রদ্ধা করছেন যে দলে দলে লোক। চরকার উপর বিশ্বাস ক'জন কংগ্রেসীর আছে? চরকা দিয়ে গান্ধীজি কি বল্‌তে চান তা-ই বা ক'জন কংগ্রেসী ভালো করে বুঝতে পেরেছেন?

"তুমি ভীষণ গান্ধীভক্ত!"

"অকর্ম্মণ্য ভক্ত—তোমার মতো কাজ করে ভক্ত নই!"

"চরকা কাটা ত ভারি একটা কাজ!"

"বিরাট ধৈর্য্যের কাজ! গান্ধীজি আমাদের চরিত্রের ভিত্তিটাকে দৃঢ় করে তুলতে চান। তাঁর এই আদর্শটাই আমার কাছে ভারি ভালো লাগে। নিজে আমি দুর্ব্বল চরিত্রের লোক বলেই হয়ত ভালো লাগে।"

"দুর্ব্বল চরিত্রের কে নয়?"

"আমি হয়ত একটু বেশি!" শমীন অন্যমনস্ক হয়ে গেল। জীবনের

দুর্ব্বলতাগুলো স্মরণ করবার জন্যেই যেন মনকে এখান থেকে তুলে পেছনে নিয়ে যেতে চাইল সে।

"দুর্ব্বলতা মেপে নেবার নিক্তি ত নেই—" সহানুভূতিতে গভীর শোনাল অনুর গলা।

"তুমি অনেক দৃঢ়—" অন্যমনস্কতায় ডুবে থেকেই বল্‌লে শমীন ঃ "প্রবীরের খবর জানো কিছু ?"

"বা রে বললুমনা তোমাকে তখন, একটা অদ্ভুত খবর আছে। বৌদিকে দেখে এলুম আজ !"

"ভালো আছে ওরা ?" অনুর উৎসাহে উৎসাহিত না হয়ে প্রবীরের কুশল জিজ্ঞাসাই করলে শমীন।

"বড়দার সঙ্গে দেখা হয়নি—বৌদির সঙ্গেই গল্প করে এলুম ! জানো শমীনদা, খুব ভালো লাগ্‌ল বৌদিকে আমার !"

"তোমাদের উচিত ওদের বাড়িতে নিয়ে আসা।"

"আমার ইচ্ছায় ত তা হবেনা—মাবাবা যেদিন ইচ্ছা করবেন সেদিন হবে !"

"তুমি যে বল্‌লে তাঁরা বদ্‌লে গেছেন !"

"বদ্‌লে গেলেও কি আর ততটুকু ? আমাদের কিছু আর ওরা বল্‌বে না এই পর্য্যন্ত—নন্‌কোঅপারেশনও বল্‌তে পারো !"

"তাহলে তা বিরোধিতারই ওপিঠ !"

"মা-সম্বন্ধে অনেকটা তাই বলা যায়। মা হয়ত জানেন, তোমার সঙ্গে বসে বসে আমি গল্প করছি—জেনে নিয়েই তিনি চুপ, এ নিয়ে আমাকে একটি কথাও বলবেন না—আগে অনেক রকম কথাই বল্‌তেন !" অতীত স্মৃতির ছায়া পড়ে অনুকে অনেকটা ম্লান দেখাল।

সঙ্গে সঙ্গে শমীনও একটা অলক্ষ্য বৈরিতার ছোঁয়ায় কেমন যেন নিস্প্রভ হয়ে গেল। এক অনুর কাছে ছাড়া এ-বাড়ির সবার কাছেই হয়ত সে অবাঞ্ছিত। প্রবীরকেও সে সন্দেহ করেছিল

একসময়, হতে পারে তা মিথ্যা সন্দেহ—অন্তত মিথ্যা বলেই ভেবে নিতে হয়েছে শেষটায় তাকে। আর মিথ্যা ভাব্‌তে পেরেছে বলেই এখনও এখানে আসে শমীন। তা না হলে হয়ত অনুর ভালোবাসাকেও সে ভুলে যেতে পারত। আত্মসম্মানের চেয়ে ভালবাসাকে বড় করে দেখ্‌বার দুর্ব্বলতা তখন তার ছিলনা। কিন্তু দুর্ব্বল সে হয়ে পড়ছে। ইদানীং নিজেকে শমীন ব্যার্ণার্ডশ'র নাটকে শেষ দৃশ্যের নায়কের মতো অসহায় বলেই মনে করে।

"তোমার পরিবারের উপর আমি জবরদস্তি করছি!" শমীনের বিজিত আত্মসম্মান আত্মগঞ্জনায় রূপ নিল।

"কেন?"

"পরিবারের কাছে তোমাকে পর করে তুলছি না কি আমি?"

"পরিবার ত আমার সবটুকু নয়, আমার আমি বলেও ত একটা কিছু আছে।"

"প্রবীরের পর আবার তুমিও আঘাত দিতে চাও মাবাবাকে?"

"আঘাত তাদের পাওয়া উচিত নয়, তবু যদি পান আমি কি কর্‌ব বল!" অনু মুহূর্ত্তের জন্যে ঢেউ-এর চূড়ার মতো তীক্ষ্ণ আলোতে চিক্‌চিক্ করে উঠ্‌ল তারপরই আবার ছায়ায় নেমে এলো তার সমস্ত শরীর: "কিন্তু একটা কথা রাখতে হবে তোমায়—বল, রাখবে?"

"কি কথা?" অসহায় শমীন জানে সাধারণ-অসাধারণ যেরকমই হোক এ অনুরোধ রক্ষা না করে তার উপায় নেই। মুখে একটা দুর্ব্বল হাসি নিয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগল কথাটা।

"বলো রাগ করবেনা—"

"কেন রাগ করব?"

"একদিন আমাদের বিয়ে হবে—এমন কোনো বাধা নেই যা আমাকে আটকায়!"—শপথে আরক্ত হয়ে উঠল অনুর মুখ তারপরই অনুনয়ে সে ভেঙে পড়ল: "কিন্তু আমাকে সময় দিতে হবে—তুমি

যদি পীড়াপীড়ি কর কিছুতেই আমি থাকৃতে পারব না—বলো পীড়াপীড়ি করবে না !"

"তুমি না বল্‌লেও করতুমনা।"

"আমি তা জানি—তা-ই এ-কথা বলবার সাহস হ'ল আমার !"

"আমিও তোমাকে জানি, তাই সময় দিতে সাহস হয় আমার !"

ছোট্ট একটু হাসিতে অনু অনেকখানি সুন্দর হয়ে উঠল : "সময় আমার ওঁদেরই জন্যে—হয়ত ওঁরা আমায় বুঝতে পারেননি—বুঝতে পারার জন্যেই ওদের সময় দিতে চাই।"

"ক'বছরে ওঁরা তোমায় বুঝতে পারবেন ?" হাল্কা হয়ে এলো শমীনের গলা।

"বেশিপক্ষে দু'বছর—যখন আমার এম্-এ পড়া শেষ হয়ে যাবে।"

"যুদ্ধের সময়কার দুবছর ত দুই যুগ—কারণ প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত এখন অনিশ্চিত !" শমীন হাসতে সুরু করলে।

"তুমি কি ভেবেছ হিটলার এসে ভারতবর্ষে উঠবে না কি ?" অনু প্রাণপণে হাসতে লাগল।

কোনোদিন এমন একটা ভয় সত্যি ছিল শমীনের। ভয়টা যে আজও নেই এমন নয়। কিন্তু সেই ভয়ের সঙ্গে সেই বিশ্রী দিনটাকে স্মরণ করতে হল বলে হাসবার উৎসাহও যেন নিভে গেল তার। নিজেকে আর অনুকে কেন সে এমন শাস্তি দিতে গিয়েছিল ভাবতে গেলে আজ আর তার কোনো মানেই খুঁজে পাওয়া যায়না।

"নিশ্চয় তুমি তা-ই ভাবছ—" আঙুল উঁচিয়ে শাসাতে সুরু করলে অনু।

শমীন অনুর দিকে এম্নি ভাবে তাকিয়ে রইল যেন অনু যে-ভাষায় কথা বল্‌ছে তার একটি শব্দও তার পরিচিত নয়।

পরিপূর্ণ প্রসন্নতার হাল্কা হয়ে বাড়ি ফিরে এলো শমীন। রাত্রি

আটটাও হয়নি, এখুনি বাড়ি ফেরার দরকার ছিলনা। তবু বাইরে ঘোরাফেরা করতে ইচ্ছা করছিলনা শমীনের। অনুর কাছ থেকে যে মনোরম অনুভূতি নিয়ে এসেছে শমীন, বাইরের পরিচিতদের সঙ্গে মনের ব্র্যবহারে তা হারিয়ে খুইয়ে ফেল্‌তে চায়না। তাছাড়া অনেকদিন পর একটা ভয়ও ফিরে এসেছিল যেন তার। আশঙ্কা হয়েছিল যদি মহীতোষের সঙ্গে আজও আবার তেম্নি দেখা হয়ে যায়! মহীতোষের স্মৃতিজড়িত সেই কুৎসিত রাত্রিটার তাড়া খেয়েই তাড়াতাড়ি পা চালাল শমীন খানিকক্ষণ। কালিঘাট পার্কের কাছে এসে আপনা থেকেই পায়ের গতি কমে এলো—ওলিম্পিক দৌড়-বাজদের আগুনের মতো মনটাকে রক্ষা করতে পেরেছে বলে আবার সে খুসী হয়ে উঠ্‌তে লাগল। বাড়ির গেটে এসে ঢুকছে যখন শমীন, তখন সে গুণগুণ করে একটা সুর-ভাঁজতেও সুরু করেছে: 'সেদিন দুজনে দুলেছিনু বনে ফুলডোরে বাঁধা ঝুলনা··· ·'

বাবা বাড়ি নেই। এ সময়ে বাড়ি থাকেন অথচ আজ নেই। হয়ত কোন মক্কেলের সঙ্গে বেরিয়েছেন—এসেমব্লির মেম্বারগিরিটাকে বাবা ওকালতি-ব্যবসার মতোই করে তুললেন! এঁদের মতো লোকের হাতেই বাংলাদেশে কংগ্রেস অপদস্ত হচ্ছে! কংগ্রেস এদের কাছে ছিল জীবিকা তৈরী করবার সিঁড়ি আর কিছু নয়!

'কংগ্রেস মিনষ্ট্রি ছেড়ে দিলে—আর তোমরা দিব্যি কাউন্সিল-এসেম্‌ব্লি করছ।' একদিন জিজ্ঞেস করেছিল শমীন।

'বাংলাদেশে ত কংগ্রেস মিনষ্ট্রি নয়—আমাদের ছাড়া-নাছাড়াতে কংগ্রেসের কিছু যায় আসেনা! এ-আই-সি-সি আমাদের কোয়ালিশনেও যেতে দিলেনা, আজ তা-ই আমাদের উপর কোন হুকুমও তার নেই!' শরৎবাবু শমীনের ছেলেমান্‌ষিতে মিহি-মোলায়েম হাসি হাসলেন।

'কোয়ালিশনে গিয়ে কোনদিন কেউ নিজের কাজ করতে পারে?'

'কংগ্রেসই যদি রাজনীতিক দলগুলোর সঙ্গে মিলেমিশে কাজ করতে না পারে, তাহলে কি সেটা পরিতাপের ব্যাপার হয় না?' চোখ বুঁজে ধ্যানস্থ হলেন না শরৎবাবু, স্মৃতিতে ডুব দিয়ে নিজেদের কার্য্যকলাপের ত্রুটী আবিষ্কার করতে চেষ্টা করলেন: 'তবু ত আমরা সবদলের সঙ্গে সম্প্রীতি বজায় রেখে কংগ্রেসের আদর্শটাকে বাঁচিয়ে রাখছি! আমাদের মতো ডিফিকাল্টি অন্যপ্রদেশের কংগ্রেসীদের নেই!'

'দলাদলি করে তোমরা কংগ্রেসকে কুৎসিত করে তুললে, এখানে, আবার কি না বলো কংগ্রেসের আদর্শ বাঁচিয়ে রেখেছ!' বিতৃষ্ণায় চোখগুলো ছোট হয়ে গেল শমীনের।

'দলাদলি আছে!'—মনে হ'ল শরৎবাবু আত্মসমর্পণ করলেন: 'এ-দলাদলির উপরে উঠবার ক্ষমতাও আর আমাদের নেই। ক্লান্ত হয়ে পড়েছি, আর উৎসাহ পাইনে। ভবিষ্যতে যারা আসবে কংগ্রেসে, তারা হয়ত মিটিয়ে দিতে পারবে দলাদলি। আমাদের কাছে আর কিছু আশা করোনা!'

এঁদের কাছে শমীন সত্যি কিছু আশা করে না। তাই শরৎবাবুর স্বীকারোক্তিতে তার মন একটুও নরম হয়ে ওঠেনি বরং অতি বেশি জানা একটা সত্যের প্রতিধ্বনি শুনে খানিকটা বিরক্তই হয়ে উঠেছিল সে।

বাবার ঘরের বা বাইরের কাজের সমালোচনা করে মন আর তিক্ত করে তোলেনা শমীন। এমনকি বাবার উপস্থিতিটাকেই ভুলে থাকতে চায় সে সবসময়। বাড়িতে যতক্ষণ থাকে ল-রিপোর্টের নজিরে চোখ বুলোয়—আলিপুরে বারলাইব্রেরীতে বসে হাই তুলে মুন্সেফির জন্যে দিনগত পাপক্ষয় করে আসেনা—উকীল হবে বলেই কোর্টে যায় শমীন।

তাড়াতাড়িই যখন বাড়ি ফেরা গেল, ভাবছিল নূতন মহাজনী আইনটা খুঁটিয়ে পড়ে ফেলবে। কিন্তু অবাক হল শমীন অমিতা-

মাসী এসে তার মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। যে-মানুষটার সঙ্গে তার সপ্তাহ-অন্তে একবার দেখা হয় কিনা সন্দেহ তার সঙ্গে মুখোমুখি হয়ে হঠাৎ কেমন ভয় পেয়ে গেল সে।

"তোমার একটা চিঠি আছে।" অমিতা অন্যমনস্ক থেকে বললে।

"আমার চিঠি কে দিয়েছে ?"

"এক ভদ্রলোক এসেছিলেন।"

অমিতার হাত থেকে চিঠিটা তুলে নিয়ে শমীন হাঁপ ছেড়ে যেন বললে : "ও, রঞ্জন !"

"অনেকক্ষণ বসেছিলেন তোমার জন্যে—বাড়িতে কেউ নেই—বললেন তবু অপেক্ষা করবেন।"

"তোমাকেও বসে থাক্‌তে হয়েছিল তাহলে !" চিঠির উপর চোখ রেখেই বললে শমীন : "আমি দুঃখিত !"

অমিতা চুপ করে গেল। নিঃশব্দে তারপর বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। শমীন চিঠিতে ডুবে আছে—কয়েকছত্র মাত্র চিঠি, তাতেই ডুবে থাকার খবর আছে। খবরটা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে হঠাৎ উত্তেজিত গলায় বলে উঠল শমীন : "তুমি পড়নি ত চিঠি ?" কিন্তু অমিতা মাসী কোথায় !

চিঠি যদি অমিতা পড়েও থাকে তাতে শমীনের বিচলিত হবার কিছু নেই। যাদের কথা চিঠিতে লেখা—প্রবীর আর তার স্ত্রী—তাদের সে চেনেনা। অনর্থক উত্তেজনায় শমীন একটু লজ্জিত হয়ে পড়ল।

কিন্তু খবরটা অদ্ভুত। দিল্লী চলে যাচ্ছে রঞ্জন, কি এক জরুরী কাজে—খবর তা নয় আর তাতে আশ্চর্য্য হবারও কিছু নেই, সামান্য কাজের ছুতো নিয়ে রঞ্জন বিলেতও যেতে পারে। খবর হল—প্রবীর তার স্ত্রীকে নিয়ে বিপদে আছে, টাকার খুবই দরকার, রঞ্জন যে-কয়দিন থাকবেনা শমীন যেন প্রবীরের খোঁজখবর নেয়। সুদাসের

কাছে অনুরোধ জানাতে চায়না রঞ্জন, কারণ সুদাস নাকি বড়লোক হয়ে উঠেছে।

প্রবীরের ঠিকানাটার উপর চোখ রেখে বাড়ির নম্বর আর গলির নাম মুখস্থ করতে লেগে গেল শমীন। প্রবীরকে সাহায্য করতে পারে শমীন কিন্তু সুদাসের টাকা নিতে যদি আপত্তি থাকে তার, শমীনও বা টাকা নিয়ে এগোবার দুঃসাহস কি করে করবে? কিন্তু দুঃসাহস হলেও তা তাকে করতে হবে। প্রবীরের দরকার নয়, দরকার তারই। প্রবীরের দরকারটা শমীনের দরকার পূরণ করবার একটা সুযোগ মাত্র। অহেতুক একটা অন্যায় করেছিল সে প্রবীরের উপর, সেই অন্যায়টাকে হৃদয়ের একটু স্পর্শ দিয়ে মুছে ফেলবার সুযোগ এসেছে। রঞ্জন এ সুযোগ এনে দিয়েছে বলে রঞ্জনের উপর কৃতজ্ঞ হয়ে উঠল শমীন। বিকেল থেকে সুরু করে এখন পর্য্যন্ত সময়টাকে শমীনের অত্যন্ত সুন্দর মনে হল। সমস্ত শরীরে যেন সমুদ্রের হাওয়া এসে লাগছে। কেবল অমিতা-মাসীর সঙ্গে দেখা হওয়াটাই যা একটু ছন্দপতন। হয়ত দেখা হওয়াটা ঠিক নয়, ছন্দ থেকে মন তার সরে গেছে নিজেরই রূঢ় কথায়: "আমি দুঃখিত।" এই রূঢ়তার দরকার ছিলনা! অমিতা-মাসী তার উপর কোনো অবিচার ত করে নি—কারো উপরই কোনো অবিচার করেনি। বরং অবিচার হচ্ছে তারই উপর। সে কথা আর কেউ না বুঝুক শমীনের ত বোঝা উচিত! বয়েসে অনুর চেয়ে বড় হবেনা অমিতা-মাসী! আরো কয়েকবারের মতো আজও মনে মনে একটা শপথ উচ্চারণ করল শমীন, অমিতার সঙ্গে ব্যবহারটা সে সহজ, স্বাভাবিক করে আনবে।

মনের সঙ্গে দেনাপাওনা চুকিয়ে শমীন ভাবছিল, এবার খানিকটা মগজের চর্চ্চা করা যাক। মহাজনী বিলের মারফৎ দেশের অবস্থাটার সঙ্গেও নিখুঁতভাবে পরিচিত হওয়া যাবে আর সে-সঙ্গে জীবিকার চর্চ্চাও হয়ে যাবে খানিকটা। যেসব বিল তৈরী হয়ে চলেছে তাতে

শমীনের শ্রেণীস্বার্থ মানে উকিলদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয়ে উঠবে। কিন্তু এ সত্য-টাও মনে মনে স্বীকার করতে হয় যে লক্ষ লক্ষ চাষী যদি একটা দুর্ব্বহ ঋণের বোঝা মাথায় নিয়ে জীবনকে মৃত্যুর সামিল মনে করে তাহলে দেশের অর্থনীতির ভিত বলে কিছু আর রইলনা। এসব আইন দেশের সেই বিরাট দারিদ্র্যের বিপুল ক্ষতের উপর কতটুকুই বা প্রলেপ দিতে পারে? গাঁয়ের চেহারা শমীনের ভালো মনে পড়েনা, গাঁয়ের সঙ্গে তার জীবনের পরিচয় সাতদিনেরও হবে কিনা সন্দেহ, তা-ও আবার সে-পরিচয় হয়েছে ছেলেবেলাকার নির্ব্বোধ মনের সঙ্গে। গাঁয়ের সবটুকুই কল্পনা করে নিতে হয় শমীনকে। ধোঁয়াটে স্মৃতিতে সেখানকার যে-লোকগুলোকে মনে পড়ে কাল্পনিক দুঃখদারিদ্র্যের সঙ্গে তাদের জড়িয়ে নিয়ে অনেক সময় বুকটা যেন তার ব্যথায় ভারি হয়ে আসে। কল্পনায় মিথ্যার খাদ থাক্‌লেও অনুভূতিটা তার ভেজাল নয়।

চুলের ফাঁকে ফাঁকে আঙুল চালিয়ে গাঁয়ের একটা দুঃস্থ ছবিই মনে মনে খাড়া করবার চেষ্টা করছিল শমীন। হঠাৎ ভারি জুতোর শব্দে বারান্দার দিকের দরজায় চোখ ফিরাতে হল। চোখ ফিরিয়েই বললে: "বাঃ—"

"অবাক হবার কিছু নেই—আগে একবার এসেছিলুম—সময় করতে পারবনা ভেবে তাড়াতাড়ি চলে যেতে হয়েছিল—" রঞ্জন এগিয়ে এসে একটা চেয়ার দখল করলে: "দেখা গেল হাতে খানিকটা সময় আছে—কাজেই আরেকটা চান্স্ নেবার ইচ্ছা হল!"

"তোর চিঠি এইমাত্র পেলুম!"

"সেটা চিঠির দোষ নয়, তোর নিশাচরতার দোষ!"

"এ বয়সে ওটাকে দোষ বলেনা!" শমীন হাস্‌তে লাগল।

"গুড! এইত গুডবয়ের ষোলকলা পূর্ণ হচ্ছে!"

"কিন্তু তোর ত কোন কলাই বাকি নেই, আবার দিল্লী কেন?"

"একটা জায়গায় বেশিদিন থাকতে ভালো লাগেনা স্রেফ তাই। চাকরিটা ভালো লাগছেনা—কাঁহাতক আর যুদ্ধের খবর গেলা যায়, তারচেয়ে বোমা গেলা বরং ভালো!"

"প্রবীরকে বিপদে ফেলে অনর্থক দিল্লী যাবার সখ হ'ল কেন তোর?"

"প্রবীরের বন্ধু কি আমি একা, তোরা আছিস কি করতে?"

"কিন্তু এতদিন ত একাই আগলে ছিলি ওকে!"

"কি আর করা যায়, কম্যুনিষ্ট হয়ে বেচারি তোদের কাছে হরিজন হয়ে উঠেছে—বাবার বাড়ির দোর বন্ধ—"

"তাহলে প্রবীরই তোকে তাড়াচ্ছে বল্!" শমীন সশব্দে অনেকক্ষণ ধরে হাসতে লাগল।

ট্রাউজারের পকেট হাতড়ে চ্যাপ্টা একটা সিগারেট বার করে ঠোঁটে গুঁজে দিল রঞ্জন—বোঝা গেল খানিকক্ষণ সে কথা বলবেনা। শমীনের দোয়াতদানির উপর থেকে দেশলাই কুড়িয়ে নিয়ে কষ্টদায়ক সিগারেটটাকেই উপভোগ করবার চেষ্টা করলে। তারপর শমীনের হাসি থেমে এলে বললেঃ "ঠিক তা নয়, বরং বলতে পারিস, আমিই ভেগে যাচ্ছি!" বলেই রঞ্জন সিগারেট-টা নিয়ে খানিকক্ষণ কসরৎ চালালে।

শমীন ড্রয়ার খুলে সিগারেটের একটা বাক্স তুলে আন্‌তে আন্‌তে রঞ্জনের কথার উপর উৎসুক হয়ে তাকিয়ে রইল।

"সত্যি তাই।" সিগারেটের বাক্সটা শমীনের হাত থেকে তুলে নিয়ে আবারও বললে রঞ্জন।

"কারণ জানতে চাইলে হয়ত বল্‌বি পয়সার অভাবে। কিন্তু সত্যি কারণ হয়ত তা নয়।"

"আমি কি ভারতবাসী নই?—পয়সার অভাব আমাদের কখনো কোনো কিছুর কারণ হয়?"

"কারণ যা-ই হোক, তুই যাচ্ছিস এটা ত সত্যি?"

"নির্ঘাৎ সত্যি। আরো থাকা যায় বাংলাদেশে? যে-নরম মাটি, তুমিনিটে শিকড় বসে যেতে চায়!"

"মাটি ছেড়ে গেলেই কি আর ভুলতে পারবি যে তুই বাংলা-দেশের ছেলে!"

"মাটি ছেড়ে গেলেই বেশ থাকি আমি! মাটি আর জোলো হাওয়া মিশে যদি মন ভিজিয়ে না তোলে তাহলে ডেরাইসমাইলখার যাযাবরের সঙ্গে আমার একতিলও অমিল থাক্‌বেনা।"

"কিন্তু এ যাযাবরীটা কেন?"

"আর সব ঝুট হ্যায়, তাই।"

"কথাটা হয়ত সত্যি নয়।"

"কোন্ কথাটা?"

"শঙ্করাচার্য্যের ভাষাটা।"

বিরাট হাসিতে ফেটে পড়ল রঞ্জন: "তুই কি আমায় শঙ্কর-বুদ্ধের চেলা ঠাওরালি? ওঁদের মনে ভোগের এম্নি বিপুল আকাঙ্ক্ষা ছিল যে পৃথিবীর ভোগটা তার কাছে কিছুই নয়। আমি কি তাই বলতে চাই?"

"হয়ত নতুন কিছুই বলতে চাস কিন্তু অর্থটা গিয়ে দাঁড়ায় ওঁদেরই পাশ ঘেঁসে।"

"ওঁদের সঙ্গে আমার মেরুর ব্যবধান! অল্প খানিকটা সুখ পেলেই আমি খুসী কিন্তু আজকের দিনে তা পাওয়া যেতে পারেনা। দুঃখের একটা অদৃশ্য হাত আমাদের সবকিছু ভেঙে দিতে চায়, অতি বিনীত কামনাকেও রেহাই দেয় না! অনর্থক সুখের নীড় রচনা করতে যাওয়া—শুধু পণ্ডশ্রম! সমাজ, রাষ্ট্র, পৃথিবী সব মিলে মানুষের ছোট ছোট আশাআকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধে চক্রান্ত করছে। তার কবলে না গিয়ে এই কি ভালো নয়?" রঞ্জনের ভেতরের চেহারাটা যেন আজ হঠাৎ ফুটে উঠল তার মুখে, উজ্জ্বল চোখ-মুখ দপ করে নিভে গিয়ে ছায়াচ্ছন্ন, রহস্যময় হয়ে উঠল।

শমীন তক্ষুণি কিছু বলতে পারলনা এবং যখন সে কিছু বলবে ভাবলে তখন দেখা গেল গলাটা বসে গেছে। গলা পরিষ্কারের চেষ্টায় লেগে গেল শমীন। রঞ্জন সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে বললে: "পারিবারিক বন্ধন ত' দূরের কথা, কোনো পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হতেই ভয় করে আমার। সুখের চেয়ে দুঃখের ভাগটাই যখন বেশি গিল্‌তে হবে—কি দরকার ও হ্যাঙ্গামায় জড়িয়ে!"

"প্রায় এস্কেপিষ্টদের মতো কথাবার্ত্তা বল্‌ছিস রঞ্জন—" শমীন গলার স্বাস্থ্য খুঁজে পেল।

"উঁহু। এস্কেপিষ্টরা ব্যক্তিগত সুখের ধাঁধাঁয় ঘোরে, আমি স্বস্তি খুঁজি।"

"ব্যাপারটা অসামাজিক।"

"হয়ত। সমাজ বলে যদি কিছু থাকত তাহলে হয়ত অসামাজিক হতুম না।"

"সমাজ না থাকলেও মানুষ ত আছে আর মানুষ হিসেবে মানুষের কিছু করবারও আছে।"

"আমিও ত অলস হয়ে বসে নেই—কাজ ত আমি করি!"

"প্রবীরের জন্যে বিবাগী হওয়াটা কাজ নয়, অকাজ।"

"'প্রবীরের জন্যে', 'বিবাগী', এসব কি বলছিস তুই?"

"তাহলে তুই-ই বল, আমি শুনি।"

"কি আর বলব—প্রবীর ভাল ছেলে, তার স্ত্রী আরো ভালো!" একটু চুপ করে থেকে রঞ্জন আবার বললে: "বাংলাদেশের মেয়েরাই সাংঘাতিক—এতো ভালো ওরা যে মনে নেশা লাগায়!"

"ওটা মেয়েমাত্রেরই গুণ।" শমীন রঞ্জনের মনকে উস্কে দিতে চাইল।

"তা নয়। পদ্মিনীর আর সংযুক্তার দেশের মেয়েদের দেখেছি, বিখ্যাত কাশ্মিরীদের দেখতেও বাকি নেই, ওরা মেয়ে—নেহাৎই জৈবভাবে মেয়ে, পুরুষালি করতে গিয়ে ওদের জৈব মেয়েত্বটা

আরো কুৎসিত দেখায়। বাংলা দেশের মেয়েরা মেয়েই কিন্তু তাসত্ত্বেও জৈব ধর্ম্মের একটু উপরে ; তাতেই তারা মোহ তৈরী করে আমাদের অনুভূতিগুলোকে গাঢ় করে দেয় !"

"বেশত ! তাদের ভয় পাবার কি আছে ?"

"আমি ভয় পাই। ভালোবাসতে হবে, ভালোবাসার পাত্রীটিকে সহধর্ম্মিণী করতে হবে এবং তারপর ভালোবাসাটাকে নষ্ট করে ফেলতে হবে—এত সব প্রক্রিয়াতে আমি নেই।"

"সংযুক্তার দেশেও ত মেয়ে আছে, শুধু জৈব মেয়েই নয়, বাংলাদেশের নেশালাগানো মেয়ে !"

"বাংলার বাইরে গেলে আমার ইমিউনিটি বেড়ে যায়, তাছাড়া বাংলার বাইরে প্রেমের জলবায়ু কোথায় ? পাহাড় আর হ্রদের জলবায়ুতে স্বাস্থ্য তৈরী হতে পারে প্রেম তৈরী হয়না !" রঞ্জন হঠাৎ ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে বল্‌লে : "তাহলে উঠি—কেমন ?"

"সে কি চা খেয়ে যা—" শমীন ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌ল।

"চা ত খেয়ে গেছি একবার······চলি······বেঁচে থাক্‌লে দেখা হবে আবার !"

"তুই কি যুদ্ধে চল্‌লি না কি ?"

"পাগল ! যাযাবর বলে কি আমার প্রাণের মায়া নেই ? মনটা ভিজে স্যাঁৎসেঁতে হয়ে আছে—কদিন ওদিককার কড়া রোদ লাগিয়ে খরখরে করে আনি !"

"তুই যে চলে যাচ্ছিস প্রবীর তা জানে ?"

"জানে।"

"কিছু বল্‌লে না ?"

"কি বল্‌বে ? বরং আমিই বল্‌লুম যে ওদের কাছ থেকে না পালালে আমার উপায় নেই ! স্নেহ পেতে বা স্নেহ করতে আমি ভয় পাই, তাই পালাচ্ছি !"

"কিন্তু স্নেহের ইন্‌ফেক্‌শ্যন থেকে ত মুক্ত হতে পারিসনি—তার প্রমাণ এই চিঠি !"

"মুক্ত হয়েছি এ কথা কি বলেছি কখনো—মুক্তির চেষ্টা করছি মাত্র—নাঃ, এবার উঠ্‌তে হয় !" রঞ্জন উঠে দাঁড়াল।

শমীনও দাঁড়িয়ে গেল সঙ্গে-সঙ্গে। রঞ্জনকে অদ্ভুতই মনে হয় তার সব সময়। স্নায়ুতে কি রকম যেন একটা অদৃশ্য ক্ষত আছে তার, যার জন্যে স্থির হয়ে থাকার উপায় নেই। মন তার পছন্দ করতে পারেনা কিছু—সবই ঠেলে-ঠেলে ফেলে দেয় ! শমীন নিঃশব্দে রঞ্জনের পাশে পাশে চল্‌ল।

গেটের কাছে এসে রঞ্জন বল্‌লেঃ "বোম্বে গিয়েও কাটাতে পারি কয়েকদিন, ওরা জীবনের বাইরের পালিশটাকেই জীবন বলে মনে করে, তাতে আর কিছু না থাকুক ঝঞ্ঝাট বড় কম। তোরা জীবনকে বড় গভীর করে ভাবিস্‌—এবার এসে তোদের কাউকেই উপরে দেখতে পেলুমনা, সবাই জীবনের ভেতরে ডুবে গেছিস্‌ !"

সিগারেটের বাক্সটা হাতে করে নিয়ে এসেছিল রঞ্জন। একটা সিগারেট খুলে নিয়ে বাক্সটা শমীনের মুঠোতে ঢুকিয়ে দিলে।

শমীনের যেন কোন কথা বলবার নেই এম্নি অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইল। রঞ্জন আর দাঁড়ালনা।

গেট থেকে বারান্দায় এসে উঠ্‌বার মুখে শমীন দেখ্‌তে পেল উপরের পোর্টিকোতে দাঁড়িয়ে আছে অমিতা-মাসী। বাবার জন্যেই হয়ত অপেক্ষা করছে। 'ওরা এতো ভালো যে নেশা লাগায়'—রঞ্জনের কথাটা মনেমনে উচ্চারণ করে তার ভুল সংশোধন করতে চেষ্টা করল শমীনঃ 'ওরা এতো ভালো যে ব্যথা দেবার নেশা জাগে আমাদের !'

অমিতা তার ঘরে এলো ; বুড়ো ঝি দুয়োরে বসে ঝিমুচ্ছে। ওদিককার ঘরটা এখনও অন্ধকার, শরৎবাবু ফিরে আসেন নি।

আলো জ্বাল্‌লনা অমিতা। অন্ধকারেই বিছানায় গা এলিয়ে দিল। ক্লান্তি নয়, বরং একটা অদৃশ্য বেগের আবেগ থরথর করে কাঁপিয়ে তুল্‌ছিল তার সমস্ত শরীর। শরীর ছাপিয়ে অশান্ত কান্নায় রূপ নিল সেই থরথর আবেগ। এতো ভালো লাগ্‌ছিল কাঁদতে অমিতার, বুকের ভেতরটা এতো হাল্কা হয়ে উঠ্‌ছিল যে মনে হল সারারাতই বুঝি ও এভাবে কাঁদতে পারবে।

কিন্তু একসময় কান্না ফুরিয়ে এল। তারপর অমিতা বুঝ্‌তে চাইল তার কান্নার মানে। এবাড়িতে এসে অবধিইত সে কাঁদতে পারত—প্রত্যেক মুহূর্ত্তেইত নিজেকে হারিয়ে হারিয়ে চলতে হচ্ছে—কিন্তু একদিনও ত সে কাঁদতে পারেনি। কেন পারেনি? অবাক হয়ে ভাবতে সুরু করল অমিতা। হয়ত নিজেকে কোনো সময়ই মনে করে নিতে পারেনি সে। কিন্তু তা বলে যে নিজেকে হারানোর ব্যথা হৃদয় ভুলে গেছে তা-ত নয়। তার অলক্ষ্যে হয়ত জড় হয়ে উঠ্‌ছিল তা হৃদয়ের উপর। কান্নায় আজ তা-ই ফুটে উঠেছে। আজই প্রথম। আজ কি অমিতা নিজেকে চিনে নিতে পেরেছে? বুঝতে কি পেরেছে নিজের ক্ষয় আর ক্ষতির কথা? তার দেহের, মনের, হৃদয়ের যা সহজ, স্বাভাবিক পাওনা ছিল তার কথা কি গুঞ্জন করে উঠল তার সমস্ত রক্তকণিকা? আজই হঠাৎ? সুদাসবাবুর সঙ্গে যেদিন দেখা হয়েছিল সেদিন নয়, আজই হঠাৎ!

'আপনি শমীনের মাসী! এ বয়েসে এমন গম্ভীর পদবী নিয়ে বসে আছেন!' উনি বললেন। উত্তরে অমিতা কিছু বলতে পেরেছিল কি? উত্তর দেবার মতো কোনো কথা ত ছিলনা; একটি বিষণ্ন, করুণ হাসিই ছিল সবটুকু উত্তর। এ-উত্তরে ওঁর চোখগুলোও ছায়াঘনতায় কেমন যেন গভীর হয়ে উঠল। কতক্ষণ ছিল ওঁর চোখ ওরকম? অনেকক্ষণ। আর তাই অনেকদিন তা মনে থাক্‌বে অমিতার।

'অপরিচিতকে চা দিতে নেই!' এ কথাও যেন বলেছিলেন একবার।

'অপরিচিত হওয়া এমন কি অপরাধ?' এবার আর বিষণ্ণতা নয়, উৎসাহের আতিশয্যেই অমিতা উত্তর দিয়েছিল। তাতে ওঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল, সেই উজ্জ্বলতাও অনেকক্ষণ ছিল ওঁর মুখে। কিন্তু সেই উজ্জ্বলতা মনে রেখে অমিতার কি লাভ? কি লাভ উজ্জ্বল মুহূর্ত্তগুলোর স্বপ্ন দেখে? তার একটু স্পর্শওত অমিতার ভবিষ্যতের গায়ে লেগে নেই—বরং সেই ছায়াঘন করুণতাকেই খুঁজে পাবে সে ভবিষ্যতে। হয়ত আজকের কান্নাকেই স্মরণ করবে তখন অমিতা—একটু আনন্দ, একটু সুখ যদি পায়, পাবে এ কান্নার স্মৃতি থেকেই। আর কিছু না থাকে অমিতার—রাত্রির একটু নিঃশব্দ অন্ধকার, একটু অন্ধকার নির্জ্জনতা ত খুঁজে নিতে পারবে সে নিজের জন্যে!

১৯৪১

এক

সুদাসের বিছানায় অকাতরে ঘুমুচ্ছিল প্রবীর। অপরিমেয় ক্লান্তিতে নিঃসাড় সে-ঘুম। একটু শব্দ নেই যাতে ঘরটা সজীব মনে হতে পারে। এই নিঃশব্দতায় ঘরের দামী আসবাবগুলোরও যেন আর কোনো মানে নেই—মনে হয় সবই যেন মুছে গিয়ে দেয়ালের শাদার সঙ্গে একাকার হয়ে গেছে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ একা বসে থেকে তা-ই মনে হয়েছিল শমীনের। তাই বসে থাকতে কেমন যেন অসহ্য লাগছিল তার। উঠে চলে এলো সে সুদাসের বসবার ঘরে। একটা সাময়িক পত্রিকার রবীন্দ্রস্মৃতিসংখ্যার পাতা উল্টোচ্ছিল সুদাস। গাম্ভীর্য্যের উপর একটু মসৃণতা এনে শমীনের দিকে তাকাল সে।

"ঘুমুচ্ছে—" শমীন স্বগতোক্তির মতো কথাটা বলে ইজিচেয়ারে গা এলিয়ে দিলে।

"ঘুমোক—ঘুমোনোই বোধ হয় একমাত্র দরকার!" সুদাস কাগজটার পাতা উল্টিয়ে চলল।

"ব্যাঙ্কে তোর কাজ থাকলে যেতে পারিস, আমিই ত আছি।" গাম্ভীর্য্যে শমীন বেশ দৃঢ়, কঠিন।

"কামাই করবার ত সুযোগ হয়না, একটা সুযোগ পাওয়া গেল। রবীন্দ্রনাথও ব্যাঙ্ক-কামাই-এর সুযোগ দিলেন না—এমন কি শেষ যাত্রা দেখবারও সুযোগ হলনা; একটা সুযোগ মিল্‌ল তবু প্রবীরের স্ত্রী-বিয়োগে!" অনেকগুলো কথাই বলে গেল সুদাস কিন্তু এতো আস্তে, এতো থেমে থেমে যে মনে হল সে চুপ করেই আছে।

"স্বপ্নেরও বাইরে ব্যাপারটা। পর্শু হাসপাতালে যখন যায় আমি ছিলুম—হাসিখুসী, বেশ সুস্থ মানুষ!"

"আগে কেয়ার নেয়নি প্রবীর—বেশি বয়সে এ সব যে ফেটাল হয়ে দাঁড়াতে পারে ওটা ওর জানা উচিত ছিল।"

"টাকায় যতটা কুলোয় তা করেছে প্রবীর, বরং আপত্তি ছিল ওরই।"

টাকায় কুলোয়নি প্রবীরের! কেমন একটা যেন ধাক্কা খেয়ে উঠল সুদাস। মনে পড়ল কয়েকমাস আগে প্রবীর তার কাছ থেকে কয়েকটা টাকা নিয়েছিল—তারপর আর আসে নি। আসেনি বলে কি সুদাস জানতনা যে প্রবীরের টাকার দরকার আছে? নিজে গিয়েও ত টাকা দিয়ে আসতে পারত সে! টাকা আছে সুদাসের কিন্তু খরচ করবার সুযোগ নেই। পরীক্ষার পর মার কাছে পিরোজপুর চলে গেছে শ্যামলী—সাধাসাধি করেও তাকে দশটা টাকা গছিয়ে দিতে পারেনি—শুধু ভাড়ার টাকা-টা নিয়েছে। জঞ্জালের মতোই সুদাসের হাতে জমে উঠছে টাকা, যা দরকারে আসেনা, যার থাকার কোনো মানে নেই। একটা জীবন বাঁচাবার সুযোগ ছিল হয়ত তার, সে-সুযোগও হারিয়ে গেল! সত্যি কি টাকার অভাবে মরে গেল প্রবীরের স্ত্রী? হয়ত। তার মা-ও কি টাকার অভাবেই মরেন নি? মরেই যেতেন হয়ত তিনি তবুও একথা সত্যি টাকার অভাবেই তাঁর চিকিৎসা করাতে পারেনি সুদাস। টাকার অভাবের সময়কার ট্র্যাজেডি এখনো সুদাসকে তাড়া করে চলেছে! প্রবীরের স্ত্রী টাকার অভাবে মরে গেল!

সিলিং-এর দিকে মুখ তুলে অপলক তাকিয়ে রইল সুদাস।

"মেয়েটির জন্যে এতোটা অবধি গেল প্রবীর আর—" শমীনের শেষদিককার শব্দগুলো গলার ভেতরে মিলিয়ে গেল।

"কি জানিস্, কোনোকিছুরই কোনো মানে নেই!" গলায় সাবেকী সিনিসিজম্ ফুটিয়ে তুলল সুদাস।

"হয়ত—" জোরে একটা নিশ্বাস টেনে শমীন জোর করেই যেন উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াল : "দেখে আসি ওকে আবার।"

শমীন চলে গিয়ে ঘরটাকে নির্জ্জন করে তুললে নির্জ্জনতাটাকে ভালো লাগ্‌ছিল সুদাসের। সেই পুরোণো দিনের স্বাদ যেন খানিকটা ফিরে পাওয়া যায়—পুরোণো দিন,—পঙ্গু মা, সে আর সীধুকে নিয়ে তখন দৃশ্য তৈরী ছিল, ব্যবসাও ছিল ভাঙা এঞ্জিন নিয়ে একা পরিশ্রম করার মতো। তখন এতো লোকসমাগম কই? এখানে দাঁড়িয়ে সেদিনগুলোকে স্মরণ করতে ভালোই লাগে। এখান থেকে সেদিনের স্বাদে ভরা একটু আবহাওয়া তৈরী করে নিতেও মন্দ লাগেনা।

কিন্তু, কেন? পুরোণো অনুভবগুলো খুঁজে বেড়াচ্ছে কেন সুদাস? এমন কি মনের পুরোণো বাঁকগুলোও আঁকড়ে ধরতে চায় মন। সিনিসিজ্‌মের একটা সরু স্রোত তার মাথায় এসে ঢুকে পড়ছে। কিছুরই কিছু মানে নেই—এধারণায় মন তার সায় দিতে সুরু করেছে আবার। শ্যামলীর বাড়ি চলে যাওয়াতেই কি মনের এমন মেটামরফসিস্ হয়ে গেল? পরীক্ষার শেষে মার সঙ্গে দেখা মাত্র করতে গেছে শ্যামলী। অত্যন্ত সাধারণ এ ঘটনা-টা মনের ধাত বদলে দেয় কি করে? শ্যামলীর একটা নগণ্য অনুপস্থিতিকে বিরাট শূণ্যতার আকার দিয়ে বসে আছে কেন তার মন! কিন্তু শ্যামলীর অনুপস্থিতিই কি শুধু মনের ধাতস্থতা নষ্ট করে দিয়েছে তার? সুদাস মনের কাছেই উত্তর খুঁজতে থাকে। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে কি বল্‌বে তুমি? সমস্ত বাংলাদেশের হৃদয়কে কি দুর্ব্বল করে দিয়ে যায়নি এ-মৃত্যু? আশ্রয়হীন, ভিত্তিহীন পিতৃহীন কি মনে হচ্ছেনা নিজেদের এখন? বাংলাদেশ যাঁকে দেখাবে, বাংলাদেশকে যিনি দেখবেন কোথায় আর তেমন কেউ? হৃদয় হাত্‌ড়ে সুদাস রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুকে খুঁজে পায়, অদৃশ্য একটা ক্ষত—উপরে হাত পড়লেই ব্যথায় টন্‌টন্ করে ওঠে। তারপরও আরো আছে। সুপ্রভার মৃত্যু।

এ যেন ভালোবাসারই অপঘাত। ওরা একে অপরকে ভালোবাস্‌তে চেয়েছিল ; দারিদ্র্যকে উড়িয়ে দিয়েছে, সমাজের প্রাচীর ভেঙেছে ভালোবাসার জন্যেই, কিন্তু মৃত্যুকে ঠেকাতে পারেনি—ওদের পরাজয় হল মৃত্যুর অস্ত্রে! মৃত্যুর কাছে সবারই পরাজয়, এতো বড়ো যে সভ্যতা তারও! মৃত্যুকে জয় না করতে পারলে কি মানে আছে জীবনের, কি মানে হয় চেষ্টার আর সভ্যতার?

সুদাস বুঝতে পারে এ ঘটনাগুলোর আবহাওয়াতেই সিনিসিজমের জীবাণু তার মনের উপর বংশবৃদ্ধি করে চলেছে। এ থেকে মনকে বাঁচিয়ে আনা অসম্ভব। ঘটনাগুলোকে পাল্টে দিতে সে পারে না। মাথা নেড়ে মৃত্যুকে অস্বীকার করা যায়না! যা অস্বীকার করা যেত তা-ও সে চুপকরে স্বীকার করে নিয়েছে। বাধা দিতে পারেনি শ্যামলীর যাওয়ায়।

"একটা বছর মার সঙ্গে আমায় থাক্‌তে দেবেনা, হয়ত একবছরও বাঁচবেন না তিনি—" চোখে করুণ প্রার্থনা নিয়ে বলেছিল শ্যামলী।

"ও নিশ্চয়—" উৎসাহিত হয়ে অনুমতি দিতে হয়েছে সুদাসকে কিন্তু পরের মুহূর্তেই একটু নিস্তেজ গলায় ছুটির সীমা এঁকে দিয়েছে : "কিন্তু একবছর, তার বেশি নয়।"

"তার বেশি আমিও থাকতে পারব বলে কি তোমার মনে হয়—" শ্যামলী একটা কঠোর প্রতিজ্ঞায় নিজেকে যেন দৃঢ় করে তুল্‌ছিল : "মাকে আমি নিজের সবটুকু জীবন দিতে পারিনে, নিজের জন্যেও নিজেকে আমার রাখতে হবে!"

"তখনও তোমার মা যদি বেঁচে থাকেন?"

"একা থেকে বাঁচতে চাইলে দুঃখ পাবেন।"

"তাঁকে দুঃখ দেওয়া তুমি এড়াতে পারবেনা।"

"তাই একবছর তাঁকে শান্তি দিয়ে আস্‌তে চাই।"

"ঋণশোধ?" ম্লান হাসি ফুটে উঠেছিল সুদাসের মুখে।

"কলকাতায় আসতে দেওয়ার ঋণ শোধ!"

"কলকাতায় আসা-টা ত সত্যি তোমার জীবনের একটা বড়ো অধ্যায় !"

শ্যামলী কথা বলতে পারেনি। সুদাসের মুখের দিকে নিবিড় চোখে তাকিয়ে থেকে হয়ত খুঁজতে সুরু করেছিল জীবনের গোড়ার-দিককার পৃষ্ঠাগুলো। সেখানে স্নিগ্ধতার একটু বাষ্পও খুঁজে পাওয়া যায়না—মার স্নেহ দুশ্চিন্তায় ঢাকা পড়ে গেছে, দাদার স্নেহ পড়ার খরচ যোগাবার চেষ্টায় নিশ্চিহ্ন, গাঁয়ের মেয়ে বৌদি—তার পড়া আর বয়েস কোনোটাই সহ্য করতে পারেন নি। তার আগে, বয়েসটা যখন কারো উদ্বেগের কারণ হয়ে ওঠেনি, পরিবারের কারো সঙ্গে সম্বন্ধই ছিলনা তার, একা-একা বই নিয়ে বসে থাকা—ইস্কুলে যাওয়া—আর বিকেলবেলা পড়ার দু-একটি সঙ্গীর সঙ্গে ছুটোপুটি করে আসা। জীবন বলতে এই দৃশ্যগুলোই ত মনে পড়ে শ্যামলীর! কলেজে পড়বার সময় কেবল পরিবারে একটু চাঞ্চল্য দেখা গিয়েছিল—বিয়ের একটা কথা নিয়ে মা আর বৌদির মুখ লোফালুফি করত দিনকতক, পকেটের শূন্যতা জানিয়ে দিয়ে দাদা তাঁদের নিরস্ত করে দিলেন দুদিন পরেই। তারপর কলেজ-জীবনে হয়ত মনে করবার মতো একটা অধ্যায় তৈরী হতে পারত, ওটা বিয়ের বাজার নয় মেয়েদের রং ময়লাতে কিছু যায় আসেনা। কিন্তু ওটা বাংলাদেশের মফঃস্বল কলেজ—মাষ্টারদের মুখে সেখানে গার্গী-মৈত্রেয়ীর কথা অহরহ শুন্‌তে হয়, বাস করতে হয় গার্গী-মৈত্রেয়ীর একটা কাল্পনিক যুগে। পড়া ছাড়া সে-জীবন থেকে পালিয়ে বাঁচবার আর কিছু ছিলনা শ্যামলীর। পড়ার ইচ্ছাটাই তাই আর সমস্ত ইচ্ছাকে সরিয়ে দিয়ে তার মনের উপর জাঁকিয়ে বসেছিল। তা-ই ছিল তার মুক্তির পাখা—এ পাখাতেই ভেসে আস্‌তে পেরেছিল সে কলকাতায়। কলকাতার জীবন তার সত্যি অন্যরকম। মামীমার আশ্রয়টা দাদার আশ্রয়ের চেয়ে খুব বেশি গুরুতর নয়, তাতে নূতনত্ব কিছু ছিলনা। নূতন একটা আকাশ তার চোখের উপর ভুলে

ধরেছিল মহীতোষ। অস্পষ্ট হলেও জীবনের নূতন একটা স্বাদ সমস্ত শরীর দিয়ে অনুভব করতে সুরু করেছিল শ্যামলী তখনই। সিনেমা দেখে একদিন বাড়ি-ফেরার পথে মহীতোষ বলেছিল: "একটা রাশিয়ান গানের কথা শুনবে মলি, শোনো—

They say my heart is like the wind
That no one maid I can't be true ;
But why do I forget the rest
And still remember only you !"

জোরে-জোরে হেসে উঠেছিল মহীতোষ। শ্যামলী হাসতে পারেনি। মহীতোষ ভেবেছিল বুঝিবা শ্যামলী রাগ করেছে! সমস্ত শরীরে অনুভব করছিল শ্যামলী সেই নূতন স্বাদ—তাই হাসতে পারেনি, এমন কি একটি কথাও বলতে পারে নি। তারপর পড়ার ইচ্ছার শাসানি দিয়ে এই নূতন স্বাদকে স্তব্ধ করে দিতে চেয়েছে শ্যামলী। মহীতোষের হাসির সঙ্গে ধীরে-ধীরে হেসে উঠতে শিখেছে শ্যামলী—দীর্ঘ, সশব্দ হাসি—দু'জনের মন থেকেই মেঘের গোপন স্নিগ্ধতা বৃষ্টির ধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়েছে চারদিকে। শ্যামলী নিজেকে বাঁচিয়ে এনেছে।

কিন্তু সেই নূতন স্বাদের সঙ্গে শ্যামলী তার হৃদয়ের পরিচয় মুছে ফেলতে পারে নি। হৃদয়কে বাঁচিয়ে আনতে পারেনি সুদাসের কাছ থেকে। সেই নূতনকে যেভাবে যতটুকু তার হৃদয় পেতে চেয়েছে সে-মন্ত্র যেন সুদাসের কিছুই অজানা ছিলনা। তার কাছে সুদাস লাবণ্যের শোভনলালের মতোই এসে উপস্থিত হয়েছে! সোনার কাঠির স্পর্শে অমিত শুধু জাগাতেই জানে, জেগে উঠে লাবণ্য তাকে খুঁজে পায়না, খুঁজে পায় শোভনলালকে।

অনেকক্ষণ চুপ করে থেকেও সুদাসের কথার উত্তর দেয়নি শ্যামলী, আপনমনেই যেন বলেছিল:

"এবার আর রবীন্দ্রনাথ বাঁচবেন না, না?"

"হয়ত বাঁচবেন না!"

"রবীন্দ্রনাথ নেই, ভাবা যায়না সে দিনগুলো!"

"আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছেন তিনি, হয়ত তাই এমন মনে হয়!"

"হয়ত আমার জীবনকে অনেক বেশি!" বিষণ্ণতায় ভরে উঠেছিল শ্যামলী।

রবীন্দ্রনাথ বাঁচেন নি—৭ই আগষ্ট অফিসে তাঁর মৃত্যুর খবরটা পেয়ে সুদাস শ্যামলীর সেই বিষণ্ণ মুখকেই স্মরণ করেছে বারবার। অফিস ছুটি হয়ে গেলেও নিজের কামরায় একা চুপচাপ বসে সে শ্যামলীকে চিঠি লিখেছে। তার প্রত্যেক ছত্রে আত্মীয় বিয়োগের ব্যথা জড়ানো। সান্ত্বনা দেবার চেষ্টাও তাতে ছিল—সান্ত্বনার দরকার আছে শ্যামলীর, সুদাসের কাছ থেকে সে-সান্ত্বনা পাওয়া দরকার, সুদাসের দেখানো দরকার শ্যামলীর আদর্শকে সে শ্রদ্ধা করে।

যে-মেয়েকে স্ত্রী বলে জানা যায় তার আবেগ আর অনুভূতিকে শ্রদ্ধা না করলে চলেনা, স্বামীর আবেগ-অনুভূতির বেলায় মেয়েকেও ঠিক তা-ই করতে হয়। বিয়ের সম্পর্কটা কদর্য্য হয়ে ওঠে হয়ত এর ব্যতিক্রম হলে—অথবা হয়ত স্বামীস্ত্রীর আবেগ-অনুভূতিগুলো যখন নীচু স্তর থেকে উপরে উঠে আসতে পারে না। অনুভূতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকা চাই একটা মহৎ আদর্শ—দেশ, সমাজ, কম্যুনিজম্, রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজি, এদের কোনো একটিকে আঁকড়ে ধরতে না পারলে যৌনতার সম্বন্ধেও ক্ষয় ধরে যায়। প্রবীরের কম্যুনিজম্ ছিল, শমীনের আছে গান্ধীজি। সুদাসের সিনিসিজম্ ছাড়া আর কিছুই ছিলনা, শ্যামলীকে পেয়ে মন থেকে পরিচ্ছন্ন করে তুলে এনেছিল সে রবীন্দ্রনাথকে, জৈব রাজ্য থেকে মুক্তি নিয়ে বাঁচবার একটা আশ্রয় জুটেছিল, অন্তত শ্যামলীকে অনুসরণ করে সেখানে গিয়ে পৌঁছুতে কোনো আপত্তি ছিলনা সুদাসের—কিন্তু রবীন্দ্রনাথ

মারা গেলেন। ব্যথার চেয়ে আশঙ্কাই যেন তার স্নায়ুগুলোকে থরথর করে কাঁপিয়ে তুলছিল—সেই আশঙ্কা জয় করবার জন্যেই লিখতে হয়েছিল তাকেঃ "রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে রক্তমাংসের একটি মানুষ নন—আমাদের মনে তিনি এমন কিছু, যার মৃত্যু নেই।"

কিন্তু মৃত্যু নেই বলে শ্যামলীকে যত সান্ত্বনাই দিয়ে থাকুক সুদাস, এ বিশ্বাসে সে নিজেকে সুরক্ষিত করে তুলতে পারেনি—অনুভব করে চলেছে সে, তার মনে ধীরে-ধীরে মরে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ—মরে যাচ্ছেন হয়ত সমস্ত বাংলাদেশেরই মনে। রবীন্দ্র-কৃত্যের আস্ফালনগুলো বক্তাদের ব্যক্তিগত আস্ফালনে এমনই নির্লজ্জ দেখাচ্ছে যে তা থেকে আর রবীন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধা আবিষ্কার করা যায় না। অনেকদিন ধরে রবীন্দ্রনাথকে মনে ধরে রাখবার মতো গভীর ব্যথার পরিচয় এ নয়। অথচ রবীন্দ্রনাথকে হারানোর মানে যে কতো অরক্ষিত হয়ে পড়া বাংলাদেশ তা না বুঝলেও সুদাস তা বুঝতে পারছে! বুঝতে পেরেও কি সুদাস বলিষ্ঠতায় সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারল? শ্যামলীর সাধারণ একটা অনুপস্থিতিকে জীবনের মস্ত বড়ো ঘটনা করে তুলছে সে দিনের পর দিন, মনের শান্তি আর অশান্তির হাজার খুঁটিনাটি নিয়ে সে ব্যস্ত—তার বাইরে একইঞ্চি সরে দাঁড়াতে চায়না মন। বাঙালী আর বাংলাদেশ ত তার মতো লোক নিয়েই গড়া—নিজেদের জীবনের ছোট ছোট গণ্ডীতেই তাদের আকাঙ্ক্ষার পরম তৃপ্তি—ব্যক্তিগত-ভাবে সবাই বাঁচার প্রয়াসে উৎকণ্ঠ, কে দেখতে চায় সমবেতভাবে তারা মৃত্যুর মুখে এগিয়ে যাচ্ছে কি না? কে মনে রাখে, দেশের জীবনকে রবীন্দ্রনাথ কিছু দিয়ে গেলেন কি না, রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সবাই নিজেদের সম্বন্ধ প্রচারেই ব্যস্ত! বড়োর দিকে তাকাবার দৃষ্টিও আমাদের এতো ছোট হয়ে গেছে! এ-ধরণের দেশের জীবন কোথায় গিয়ে পৌঁছুবে? কবে, কোন্ মৃত্যুস্নানের শেষে শুচিশুভ্রতায় জেগে উঠবে নূতন জীবনের অঙ্কুর?

হাতের উপর চোখ বুঁজে সুদাস চোখের অন্ধকারে সেই মৃত্যু-স্নানের ছবি আঁকতে চেষ্টা করল। কি করে যে এই পঙ্গু জীবনের অবসান হবে তার স্পষ্ট কোনো ছবি তার কল্পনা ফুটিয়ে তুলতে পারলনা। সুভাষ বোসের মতো জাত-কে জাত সন্নেসী হয়ে হিমালয় যেতে পারবেনা—সেই হতাশাবোধও কারো মনে উতল হয়ে ওঠেনি—আশাহীনের হতাশা-বোধ উতল হয়ে ওঠেনা কখনো—যারা কাজ করতে চায়না কাজ থেকে মুক্তির প্রশ্ন তাদের নেই! কি করে শুদ্ধি হবে বাঙালীর? মৃত্যু-গর্ভ যুদ্ধের ছোঁওয়ায়? মৃত্যুর যজ্ঞ কি সুরু করবে জাপান?

আবারও এসে উপস্থিত হল শমীন: "চোখ মেলে চেয়ে আছে প্রবীর, কথা বলছেনা!"

"আমি আস্‌ব?" শুধু চিন্তা নয়, ঘরের নির্জ্জনতাটাকেই ছেড়ে যাবার জন্যে এখন ব্যস্ত হয়ে উঠল সুদাস। উঠে সে দাঁড়িয়ে গেল যেন বিদ্যুতের ছোঁওয়ায়।

"আয়—" শমীন খানিকটা সবল হয়ে উঠল।

শমীনকে আরো সবল করে তুলবার জন্যেই সুখী গৃহস্থের ভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে গেল সুদাস।

প্রবীর তাকিয়ে আছে সত্যি কিন্তু চোখে তার দৃষ্টি নেই। সুদাস তার গা ঘেঁসে বিছানায় গিয়ে বসল। "ঘুম হল খানিকটা?"—জিজ্ঞাসা করলে সে।

প্রবীরের মাথা নড়ে উঠ্‌ল। সুদাস কি বলে শোনবার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে ছিল শমীন। নিজে সে ভেবে দেখেছে, প্রবীরকে বলবার মতো কোনো কথাই খুঁজে পাওয়া যায়না। প্রবীরের প্রিয় বা অপ্রিয় কোনো প্রসঙ্গই যেন এখন প্রাসঙ্গিক হবেনা।

"ঘুম আর হবেনা এখন—কাজেই খুব ক্লান্ত মনে না হলে উঠে বস্‌তে পারিস।" সুদাস প্রবীরের চোখের উপর থেকে কয়েকটা চুল সরিয়ে দিলে।

কথার সঙ্গে সঙ্গেই উঠে বসল প্রবীর, তার মুখে শমীন একটা সরু হাসিও যেন দেখ্‌তে পেল একবার।

"জানিস্‌ শমীন—" সুদাস শমীনের উপর চোখ বুলিয়ে আন্‌লে : নিজেকে মার্কসিস্ট্‌-ফার্কসিস্ট যাই বলুক প্রবীর, আসলে ও কিছুই নয়!" শমীনকে সঙ্গে নিয়ে হাস্‌তে চেষ্টা করল সুদাস।

"একটা সিগারেট দিবি?" প্রবীর ওদের হাসির উপর হাত বাড়িয়ে দিল।

"ও, সিওর—" সুদাস উঠে গিয়ে টেবিলের উপর থেকে দেশলাই শুদ্ধ্‌ সিগারেটের টিনটা তুলে এনে প্রবীরের সামনে রাখল, বিছানার উপর অ্যাশ্‌-পট্‌টাও বসিয়ে দিতে ভুললনা। তারপর শমীনের পাশ থেকে একটা চেয়ার টেনে বসে বল্‌ল : "রূর দেশের ষ্টিল দিয়ে তৈরী মানুষের পক্ষে মার্কসিস্ট হওয়া হয়ত সম্ভব—গঙ্গামৃত্তিকায় গদ্‌গদে বৈষ্ণব তৈরী হতে পারে, মার্কসিস্ট নৈব-নৈবচ!"

"মার্ক্সের ফিলসফি মাফিক জীবনকে কঠোর কঠিন করে তোলা অসম্ভবই যেন মনে হচ্ছে—" কথাটা না বলে কাঁদতেও পারত প্রবীর কারণ কান্নার মতোই শোনাল তার কথাগুলো।

"সম্ভব নয়—" সুদাস বিজয়ী পণ্ডিতের মতো থুতনীটা উঁচু করে বল্‌লে : "চেষ্টা করেও আমি মনকে ডায়লেকটিক্যাল মেটিরিয়্যালিজ্‌ম্‌-এর উপদেশ শোনাতে পারিনি। শুন্‌তে গেলে কি যে এক অশান্তির রাজ্যে গিয়ে মন পৌঁছয়, রক্তমাংসের মানুষ তার চোট সইতে পারেনা!"

"সায়েন্টিফিক আউটলুকের বিপদ ওখানেই—আদ্ধেক পথে এসে থেমে পড়েছে সায়ান্স—" সিগারেটের ধোঁয়ার সঙ্গে কথাগুলো গড়িয়ে গড়িয়ে দিতে লাগল প্রবীর : "ইন্‌ডিটারমিনিজমের গোলক ধাঁধাঁয় ঘুরপাক খেতে আমরা রাজী নই বলেই বিপদ। সবটুকু হাতের মুঠোয় আন্‌তে না পারলে শান্তি পাইনে আমরা

আইডিয়্যালিষ্ট ফিলসফি সবটুকু হাতের মুঠোতে পাওয়ার দাবী জানায় বলেই ওকে সত্য ভেবে আমরা খুসী হই।”

“ও বুজরুকিতেও মন আমার রাজি নয়—” সুদাস শমীনের দিকে তাকিয়ে বললেঃ “এক্সকিউজ মি, শমীন, আইডিয়্যালিষ্ট ফিলসফিটাকে বুজরুকিই বললুম—”

“ফিলসফি নিয়ে মাথা ঘামাইনে—যা খুসী বলতে পারিস—” তর্কে এগোতে চাইলনা এখন শমীন। মূককে যে বাচাল করে তুলছে সুদাস তাতেই সে খুসী হয়ে চুপচাপ বসে থাকতে পারে।

“মাথা না ঘামিয়ে যে ভালো কাজ করছিস তা মনে করিসনে। ব্যাঙ্কের পেছনে ফিলসফির মুরুব্বিআনা না থাকলেও চলে কিন্তু তোদের ল' দাঁড়িয়ে আছে ফিলসফির উপর।”

“স্বাধীনদেশের ল'।” শমীন আর কিছু বললে না। সুদাসের প্রগলভতা থামিয়ে দিতে ওইটুকুই যথেষ্ট।

অন্যসময় হলে সুদাস থামতনা, আজ থেমে গেল। পরাজয়ের হাসি নিয়েই বললে সেঃ “খুব মিথ্যে নয়।”

“সুবীর চলে গেছেরে, শমীন?” ফিলসফি থেকে বাস্তবজীবনে ফিরে এলো প্রবীর। ঘুম থেকে জেগে অবধি বাস্তব-জীবনের রূঢ় অলিগলিতেই ঘুরে চলছিল প্রবীরের মন—সুদাসের সঙ্গে মনন-শীলতার চর্চ্চায় মন ছিলনা খুব—কথা বলতে হবে বলে শুধু কথা বলা। এখনও দু কানে তার গুঞ্জন তুলছে সুপ্রভার কণ্ঠস্বর—চোখ থেকে মুছে যায়নি তার রক্তমাংসের চেহারা, মন ভরে আছে সুপ্রভার মনের অগাধ গভীর স্পর্শে। সেই চমৎকার চোখ আর মনের উপর অত্যাচার সুরু করবে এখন রূঢ়, কুৎসিত বাস্তবতা। সুরু হয়ে গেছে সে-অত্যাচার—সুদাসের কাছ থেকেই তার সুরু।

“একটু আগেও ছিল, আমিই পাঠিয়ে দিলাম অমুকে আনতে—” ব্যস্ত হয়ে বললে শমীন।

"আজই বাড়িতে খবরটা পাঠাবার কি দরকার ছিল—" মনে-মনেই যেন বলে গেল প্রবীর।

"একদিন ত জানবেই—আজ জানলেও ক্ষতি নেই—" সুদাসও আপন মনেই বল্ল কথাগুলো।

"তোর হয়ত আমার দু' বছরের জীবনকে একদিনেই ধুয়েমুছে পরিষ্কার করে আবার আগেকার জীবনের সঙ্গে জুড়ে দিতে চাস—" প্রবীরের গলা ব্যথায় ভারি হয়ে এল। মনে হচ্ছিল বেশিক্ষণ সে কথা বলতে পারবেনা—কিন্তু সে গলাতেই কথা বলে চলল সে: "হয়ত আগেকার জীবনকে খুঁজে নিতে হবে আবার কিন্তু কবে যে তা পারব জানিনে।"

শমীন মাথানীচু করে রইল, একটু হুঁ-হাঁ শব্দ করবারও যেন সাহস ছিলনা তার। কিন্তু সুদাস দুই বন্ধুর এই দুর্ব্বল মুহূর্ত্তগুলোতে নিজেকে দুর্ব্বল করে ফেলতে পারেনা। একটু জবরদস্তি করেই যেন গলাটাকে পরুষ করে নিলে সে: "কিছুদিন পরে যে-জীবনে স্বাভাবিকভাবে যেতেই হবে, নিজের চেষ্টায় সে জীবনটাকে কাছে এগিয়ে আনাইত মার্কসিস্টের লক্ষণ!

"হয়ত তাই—" দুর্ব্বলভাবে হাসতে চেষ্টা করল প্রবীর: "কিন্তু কি জানিস, কারো মৃত্যুর জন্য মন আমাদের তৈরী থাকেনা—তাই তা এসে গেলে দু'একদিনেই তার সঙ্গে বোঝাপড়া করে ফেলা মুস্কিল।"

সুদাসের পরুষও যেন খানিকটা মিইয়ে এলো অন্তত দেখা গেল প্রবীরের কথার উপর সে আর কথা বলতে পারছেনা—ভীষণ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছে যেন হঠাৎ।

"তা-ই হয়ত শোক করবার একটা রীতিই তৈরী হয়ে গিয়েছিল আমাদের সমাজে এগারো দিন থেকে সুরু করে একমাস পর্য্যন্ত। মননশীল শ্রেণী বলে হয়ত মৃত্যুকে ভুলতে এগারো দিনের বেশি লাগতনা ব্রাহ্মণদের—সাধারণ শ্রেণীর লাগত হয়ত একমাস।" মনে

হচ্ছিল প্রবীর গভীর শ্রদ্ধায় ভারতবর্ষের অতীত ইতিহাসের একটি পৃষ্ঠা পড়ে যাচ্ছে।

অন্যমনস্কতা ভেঙে গেল সুদাসের: "ও-ব্যাপারটার আর মহৎ ব্যাখ্যা দিতে যাসনে প্রবীর—" অনুরোধ নয়, বিদ্রূপের একটা শাণিত-রেখা ফুটে উঠ্‌ল সুদাসের ঠোঁটে!

"মহৎ ব্যাখ্যা নয়, মনে হল তাই বললুম। তাছাড়া আরেকটা অদ্ভুত কথাও মনে হয়, পরলোকের আবিষ্কারক কোনো দার্শনিক নন হয়ত কোনো অখ্যাত প্রেমিক। যাকে এতো ভালোবাসি মৃত্যুর কাছে নিঃশেষে তাকে তুলে দিয়ে নিশ্চিহ্ন করে ফেলতে মন চায়না, জীবনটাকে এতো মিথ্যে বলে হৃদয় কিছুতেই মানতে চায়না, তাই হয়ত পরলোকের দরকার ছিল!"

শমীন চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ল, মার্কসিস্ট না হলেও পরলোকতত্ত্বের গাম্ভীর্য্যে সে যেতে রাজি নয়। কাজেই সুদাসকে প্রতিবাদ করবার সুযোগও দিতে চাইল না সে: "এতক্ষণে কিন্তু সুবীরের আসা উচিত ছিল, আমি কি যাবো একবার ওদের খোঁজে?

"বেশত—" সুদাস শমীনের দিকে তাকালোনা পাছে তার মুখে আগ্রহ দেখা যায় যা সুবীর বা প্রবীরের জন্যে নয় শুধু অনুর জন্যে।

এক মূহূর্ত্তও আর দাঁড়ালনা শমীন, আগ্রহটা তার অনুর জন্যে না হয়ে মুক্ত আলোবাতাসের জন্যও হতে পারে, হতে পারে স্নায়ুর স্বাস্থ্যের জন্যে। মর্গের গুমোটে দাঁড়িয়ে থাকারও একটা রোমাঞ্চ আছে। কিন্তু শোকসন্তপ্তের সঙ্গ সমস্ত মন থিঁতিয়ে দেয়, একটা নিস্তেজ ঠাণ্ডা বিষের ক্রিয়া সুরু হয় সমস্ত রক্তে।

প্রবীরকে একা পেয়ে সুদাস আগেকার দিনগুলোতে ফিরে যেতে চেষ্টা করল—যে তার্কিক সত্তা তার যবনিকার আড়ালে চলে যাচ্ছিল, অনেকদিন পর তাই এসে পাদপ্রদীপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠ্‌তে চাইল।

"অতীতের প্রয়োজনগুলোকে বর্ত্তমানে স্বীকার করতে হলে আমরা তার একটা আধুনিক ব্যাখ্যা দিয়ে নিতে চাই—একে মার্ক্সের

ভাষায় দুর্ব্বলতা ছাড়া আর কিছুই বলা যায়না প্রবীর—" সুদাস নন্-স্টপ ভঙ্গীতে বলতে সুরু করলে : "নূতন যুগের জন্যে নূতন জীবন তৈরী করতে হলে শরীর-মনের আর চিন্তাশক্তির উপর দারুণ চাপ আসে, সে চাপ আমাদের সহ্য করতে হয় যদি সত্যি-সত্যি নূতন জীবন আমরা পেতে চাই। অতীত হাতড়ে বেড়ালে অনেক ধনরত্ন পাওয়া যাবে, তা দিয়ে জীবন সাজিয়ে তুলে আমরা তৃপ্তি পেতে পারি, শান্তিশৃঙ্খলাও হয়ত খানিকটা আসতে পারে—কিন্তু আমাদের জীবনে নূতন যুগের আলো-বাতাসের আর কোনো মানে থাকে না।"

"অতীতকে কি গলা টিপে মেরে ফেলা যায়, দাসু?" অতীতের কোনো একটা স্মৃতির উপর চোখ রেখে যেন বললে প্রবীর: "শরীরে যে রক্ত বয়ে নিয়ে এসেছি তার উৎস অনেক অতীতে!"

"তার মানে মার্ক্সবাদের বীজাণুগুলো রক্ত থেকে ধুয়ে-মুছে গেছে—" সুদাস জোরে জোরে হাসতে লাগল : "সেখানে নাৎসী-বাদের পুরোপুরি রাজত্ব এখন? তা আর কি করা যায়, দুবছরের নাৎসী-বন্ধুত্ব সোভিয়েট রাশ্যার শরীরে যে-পরিমাণ ইন্‌ফেক্‌শ্যন ঢুকিয়েছে এখন লড়াই করেও সে-রোগ আর ঘুচবেনা!"

প্রবীর রোগীর মতো একটু হেসে বললে : "ওসব বড়ো বিষয়ে না গিয়ে বলা যায় আমরা অত্যন্ত সাধারণ মানুষ—চোখে হয়ত স্বপ্ন আছে কিন্তু তার সঙ্গে মনের দুর্ব্বলতার বনিবনাও হয়না!"

প্রবীরের বিনয়ে খুসী হয়ে উঠ্‌লেও পলিটিক্স-টা জমছেনা বলে সুদাস কিছুতেই শান্তি পাচ্ছিলনা—নিজের তৃপ্তির জন্যেও খানিকটা আর তাছাড়া প্রবীরের মনের মোড় ফেরাবার জন্যেও পলিটিক্সই এখন দরকার।

"সাধারণ মানুষ—" প্রায় নাটকীয় হয়ে উঠ্‌ল সুদাস : "শুধু তুই আর আমিই সাধারণ মানুষ নই—যাদের আমরা বড়ো নেতা বলি তাঁরা সবাই। নিজেরা তাঁরা সবাই দুর্ব্বল, তাই আমাদের দুর্ব্বলতা লুণ্ঠন করে নেতা হয়ে ওঠেন তাঁরা। যতো আওয়াজই

আজ হিটলার দিক, জার্ম্মেণীর দুর্ব্বলতার সুযোগেই তিনি দাঁড়িয়ে গেছেন—মার্শ্যাল ষ্টালিনও তাই, রাশ্যার মানুষগুলোর দুর্ব্বল দিকটার উপরেই তাঁর সিংহাসন। আর আর পুরাণো বলশেভিকদের রাশ্যা নেতার আসন দিতে পারেনি কারণ তাঁদের সুর ছিল বলিষ্ঠ—কেমন বলিষ্ঠ শুনবি?"—সুদাস টেবিলের উপর থেকে সগু-কেনা The Mind and Face of Bolshevism বইটা টেনে নিয়ে ২১৩ পৃষ্ঠা খুলে পড়তে সুরু করলে:

"It will be the highest task of humanity to learn to control its own feelings, to illuminate the instincts with consciousness, and make them transparent and clear, to bring the areas below the threshold of consciousness under the direction of the will, and thus to make itself into a higher biological type, or, if you like, to form a race of superman,........The average man will rise to the level of an Aristotle, a Gœthe, or a Marx, and behind this ridge new and loftier peaks will shine."—এ স্বপ্ন নিয়ে যাঁরা রাশ্যায় বিপ্লব করেছিলেন তাঁরা আজ কেউ সেখানে বেঁচে নেই, চিরকালের চাষীর দেশ রাশ্যা, কৃষক-সংস্কৃতির দুর্ব্বলতায়ই ডুবে গেছে!

"হতে পারে।" তার বেশি কিছু আর বলবার রুচি ছিলনা প্রবীরের।

"হতে পারে নয়, তা-ই হয়। কোটি-কোটি চাষী নিয়ে ভারতবর্ষেরও তাই হবে। ওটা কম্যুনিজম্ নয়: মার্ক্সের negation of negation ও নয়, ও হ'ল re-arrangement of negation!"

"তবু ত তা একটা কিছু—এই একটা কিছুর মধ্য দিয়ে ত রাশ্যার

সমস্ত মানুষ রাশ্যাকে আপন মনে করে!” অসতর্কতায় প্রবীর পলিটিক্সে ঝুঁকে পড়ছিল।

“তেমন একটা কিছু ত হিটলারের দেশেও হয়েছে—সমস্ত জার্ম্মাণই প্রায় নাৎসীদের মতো উগ্র স্বাদেশিকতায় আর স্বাজাত্য-প্রীতিতে পাগল! তা'বলে সে হওয়াটাকে কি কম্যুনিজম্ বলব?”

প্রবীর হঠাৎ মিইয়ে গেল, যুক্তির অভাবে নয়—হঠাৎ প্রত্যক্ষ বাস্তবে ফিরে এলো তার মন। সুপ্রভা নেই—এই কঠোর সত্যে বিস্বাদ হয়ে উঠল যেন আবহাওয়া—দরিদ্র আর দুর্ব্বল মনে হল নিজেকে। এতক্ষণ নিজেকে ভুলে কি সব বকে চলেছিল সে? এর চেয়ে সুপ্রভার আর কি অপমান হতে পারে, নিজেও সে এর চেয়ে আর কি বেশি অকৃতজ্ঞ হতে পারে?

প্রবীরের দিকে তাকিয়ে সুদাসের তর্কের মেজাজ ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটু উদ্বিগ্ন হয়েই বললে সে: “কি রে, শরীর ভালো লাগছেনা?”

মৌনতা ভাঙতে ইচ্ছা করছিলনা প্রবীরের, মুখে একটু অস্পষ্ট আওয়াজ করেই আবার অন্যমনস্ক হয়ে গেল সে।

“এতক্ষণে ত সুবীরের আসা উচিত ছিল।” সুদাস খুঁজে খুঁজে সুবীরের না-আসার ব্যাপারটাকেই সময়োপযোগী বিষয় বলে ভেবে নিলে।

কিন্তু সুবীরের জন্যেও প্রবীরকে উৎসুক দেখা গেলনা। অগত্যা অন্যদিকে তাকিয়ে চুপ করে থাকতে হল সুদাসকে। কয়েক সেকেণ্ড পর প্রবীরের একটা দীর্ঘনিশ্বাসে বোঝা গেল স্মৃতির একটা অধ্যায়ের উপর যবনিকা পড়ল, এবার হয়ত কিছু শুনবার বা বলবার সময় হবে ওর। কিন্তু দরজায় তখন একটি মেয়ে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়েছে—একটা অদ্ভুত অনুভূতিতে আচ্ছন্ন হবার মুখে সুদাস দেখতে পেল মেয়েটির পেছনে সুবীরের মুখ।

"ওঃ" অনেকরকম দুশ্চিন্তা থেকে যেন মুক্তি পেয়ে সুদাস উঠে দাঁড়াল: "এসো—"

অনু ঘরের ভেতর এগিয়ে এল। সুদাস বাইরে গিয়ে হিস্-হিস্ করে সুবীরকে বললে: "অনু ওখানে থাক—আমরা আমাদের ঘরে। খানিকটা কান্নাকাটি হয়ে গেলে ভালো!"

সুবীরকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছিল, সুদাসের পেছনে-পেছনে বসবার ঘরে হাজির হয়েও তার অন্যমনস্কতা গেলনা।

"শমীনের সঙ্গে দেখা হলনা তোমাদের? তোমাদের খোঁজেই ত গেল ও?" সুদাস আড্ডার ভঙ্গীতে আঁটসাঁট হয়ে বসল।

"শমীনদার সঙ্গে দেখা হয়নি ত!" সুবীর একটা সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে চোখ বুঁজে রইল।

"বাড়ির সবাইকে বলেছ?"

"সিনেমায় যাচ্ছি বলে অনুকে নিয়ে বেরিয়ে এলুম।"

"খবরটা ত দেওয়া উচিত।"

"শমীনদা-ই দেবেন এখন। এ খবরটা নিয়ে ওঁদের কাছে দাঁড়াতে ইচ্ছে হলনা।"

"যেদিনই হোক ওকে বাড়ি নিয়ে যেতে হবে ত—তোমার এতটা বৈরাগ্য থাকলে চলবে কেন?"

"সে অনুই সব করবে।"

"তোমার অ্যাটিচ্যুডটা ঠিক বোঝা গেলনা।"

সুবীর চোখ মেলে তাকিয়ে একটু হাস্‌লে তারপর কপাল কুঁচকে বললে: "ভারি বিশ্রী লাগছে!"

"ঘটনাটা না জীবনটাই!" সুদাসও হাসতে লাগল।

"বৌদির মৃত্যুতে বাবা-মা একটুও দুঃখিত হবেন না—এর চেয়ে বিশ্রী ব্যাপার ভাব্‌তে পারেন? অথচ আমি জানি ওরকম ভালো মেয়ে দুর্লভ!" গলাটা যেন একটু কেঁপে উঠ্‌ল সুবীরের।

"ভালো মেয়েদের দুর্ভাগ্য, ভাই, যে বাংলাদেশে এরা অনেক

আছে, তাই এদের উপর অত্যাচার করতে বাংলাদেশের মায়া হয়না, এরা মরে গেলেও দুঃখ হয়না!" হতাশার হাওয়ায় সুদাসের গলাটাও অন্যরকম শোনাল।

"যাক্—আমি চলি সুদাসদা—শমীনদার সঙ্গেই অনু বাড়ি যাবে—" সুবীর ছটফট করে উঠল।

"কোথায় যাবে—বোসো—" সুদাস হাত বাড়িয়ে প্রায় ধরতে গেল সুবীরকে।

"ভালো লাগছেনা—"

"রাস্তায় ঘোরাঘুরি করলেই কি ভালো লাগবে?"

"তা নয়—"

"তা নইলে যাবে কোথায়! পার্টি ত তোমাদের ছত্রখান হয়ে গেল। না পারলে হলওয়েল মনুমেণ্ট ভাঙতে, না পারলে সিরাজউদ্দৌল্লার নামে দেশকে জাগাতে—" সুদাস হাস্‌তে লাগল, সে জানে এ অষুধ ছাড়া সুবীরকে বসিয়ে রাখা যাবে না। সুদাসের নিজের জন্যেই সুবীরের বসে থাকা দরকার, ওঘরে কখন কি দৃশ্য উপস্থিত হয় বলা যায়না। একা প্রবীরকে নিয়ে সাম্‌লে উঠতে হয়ত সে পারে, কিন্তু প্রায় অপরিচিতা অনুকে নিয়ে কি উপায় হবে?

"আপনি কি মনে করেন দেনাপাওনা চুকিয়ে নেবার দিন এগিয়ে আসেনি?" সুবীর জ্বলে উঠ্‌তে লাগল:

"এ যুদ্ধটা কি? সমস্ত নির্য্যাতিত জাত তাদের পাওনাগণ্ডা বুঝে নিতে চাচ্ছে। আর এই সুযোগেও আমরা আমাদের প্রাপ্যের জন্যে চেষ্টা করবনা, করব একক সত্যাগ্রহ? গান্ধীজি মহাপুরুষ হতে পারেন—স্বাধীনতার জন্যে হাত পাততে পারেন—কিন্তু নেতা তিনি নন, স্বাধীনতার নেতা স্বাধীনতার জন্যে দরবার করেন না।" সুবীর জ্বলে উঠল।

"যুদ্ধের ভয়ে যে-জাত জবুথবু হয়ে গেছে তাদের নিয়ে কোনো

নেতা স্বাধীনতা আন্‌তে পারেননা, সুবীর ?" সুবীরের যাওয়া সম্বন্ধে নির্ভয় হয়ে সুদাস খুব ঠাণ্ডা গলায় জিজ্ঞেস করল।

"যিনি নেতা তিনি সুযোগকে অবহেলা করতে পারেন না,—সুযোগকে অবহেলা করছে সমস্ত দেশ, করছেন গান্ধীজি আর কংগ্রেস—সমস্ত দেশের অবহেলাতেই আমাদের নেতা আজ নিরুদ্দেশ !"—কাপড়ের খুঁটে নির্দ্দয়ভাবে মুখ মুছতে লাগল সুবীর।

"সমস্ত দেশ না-হয় চোরই হল, এই চোরের উপর রাগ করে মাটিতে ভাত খাওয়া কি নেতার কাজ ?"

"তিনি একা কি করতে পারেন ? জেলে যেতে পারেন, তা গিয়েছিলেন। মনে-মনে যা তিনি সত্য বলে বুঝতে পারছেন, দেশ তা বুঝতে চাচ্ছেনা—তখন নিজেকে কতো অসহায় মনে হয় ভাবতে পারেন ? কি আর তিনি করতে পারেন সন্ন্যাসী হওয়া ছাড়া ?" সুবীরের মুখ বিষণ্ণতায় করুণ দেখাল।

"এবার তাহলে তোমরা জোরসে আনন্দমঠ পড়তে সুরু করে দাও !" সশব্দে হেসে উঠল সুদাস।

সুবীর কয়েক সেকেণ্ড গম্ভীর হয়ে থেকে উঠে পড়ল : "নাঃ, আমি যাই সুদাসদা—"

"রাগ করে চলে যাচ্ছ না কি ?"

"রাগ করবার কি আছে ?—অনুকে বলবেন শমীনদার সঙ্গে চলে যেতে।" সুবীর আর দাঁড়ালনা।

সুদাস ওর যাওয়ার ভঙ্গীতে কেমন যেন একটু বিবর্ণ হয়ে গেল। হয়ত অনুভব করল নিজের মনের বিবর্ণতা। কোনো রং-ই নেই তার। ওদের দু'ভাই-এর দুটো গভীর রং আছে মনে—আর তা জীবনের উপর ভেসে উঠে সতেজ সুন্দর দেখাচ্ছে ওদের। অনেকগুলো চঞ্চল, উত্তপ্ত মুহূর্ত্তের স্পর্শ পেয়ে চলেছে ওদের জীবন—যা সুদাসের জীবনে নেই। সুদাসের মনে ভালো-বাসার একটা রোগ-পাণ্ডুরতা লেপ্‌টে আছে, ভালোবাসার অবাধ,

অগাধ উদ্দামতা থাকলেও হয়ত জীবনের গায়ে খানিকটা রং লাগত। কিন্তু শালীনতা, ভদ্রতা, যুক্তিবিচার দিয়ে মনকে মুড়ে রেখেছে সুদাস—শ্যামলীও তা-ই। কোনো নির্জ্জন সমুদ্র-তীরে সুইমিং কষ্ট্যুমে দাঁড়িয়ে আছে সে আর শ্যামলী—উত্তাল হাওয়ায় কালোহাওয়ার গুঁড়োর মতো উড়ছে শ্যামলীর চুল—ক্ষ্যাপা ঢেউ-এর উপর সশব্দ হাসিতে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওরা দুজন, একের শরীর অপরের শরীরে পিছলে যাচ্ছে বারবার—ওদের ভালোবাসায় এ দৃশ্যর ঠাঁই কোথায়? ইচ্ছাকে শাসন করে করে প্রেমকে মুমূর্ষু করে তোলাই ওদের প্রেম। হয়ত প্রবীরের প্রেম এরকম ছিলনা—অন্তত ইচ্ছাকে শাসন করে সে-প্রেমের বাঁচতে হয়নি। সমাজকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে যার প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কোনো শাসন বা অনুশাসন নিশ্চয়ই তা মেনে চলেনি, নিজেকে লুকোবার, আড়াল করে রাখবার দরকার ছিলনা সে-প্রেমের। স্পষ্টতায় উজ্জ্বল ছিল তার চেহারা। রং ধরবার ক্ষমতা আছে যে-মনের প্রেমও সেখানে স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে ওঠে—সুদাসের মনের সে-ক্ষমতা নেই, প্রেম সেখানে বাঁচবে কি না কে জানে? রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, বাণিজ্য নিয়ে অনেক সময় খরচ করেছে সে জীবনে, কিন্তু কোনো একটা বিষয় তার মনের বিষয় হয়ে উঠলনা—প্রেম কি করতে পারবে সে-অসাধ্যসাধন? ভয় হয় সুদাসের, আশঙ্কা হয় শ্যামলীকে ভুলে যাবার ভূমিকা হয়ত সুরু হয়ে গেছে তার জীবনে।

"ছোড়দা, কি সব অদ্ভুত কথা যে বলছে বড়দা শুনে যা—" অনু প্রায় ঘরে এসে উপস্থিত হয়েছিল, সুবীরকে না দেখে হঠাৎ থেমে গেল।

"সুবীর ত চলে গেছে—"একটু ভেবে নিয়ে শেষে অনুর দিকে তাকাল সুদাস।

"আপনি একটু আসুন না ওঘরে—"

"কি হয়েছে?"

"বড়দার মুখেই শুন্‌বেন, চলুন।" অনু দাঁড়ালনা, সুদাস আস্‌ছে কিনা সে-টুকু দেখবারও যেন দরকার ছিলনা তার।

সুদাস উঠে যাবার জন্যে তৈরী হয়েও ভাবছিল, কি করে অনু ভাবতে পারল যে তার আদেশের উপরই সুদাস ও-ঘরে গিয়ে হাজির হবে! সে যে না-ও যেতে পারে, এ-কথা কি মনে হলনা একবারও অনুর?

কথাটা অনুর মনে হয়েছিল কিনা জানবার উপায় ছিলনা কিন্তু সুদাস ও-ঘরে গেল।

নিবিষ্টমনে একটা সিগারেট টেনে চলেছে প্রবীর—সুদাস তার পাশে গিয়ে বসল। ওদের মুখোমুখি চেয়ারটায় অনু গম্ভীর হয়ে বসে হাতের চুড়িগুলো নাড়াচাড়া করতে সুরু করলে।

"কি রে?" সুদাস তাকাল প্রবীরের দিকে।

"কিছুনা।" প্রবীর আর কিছু বললে না।

"বড়দা বল্‌ছেন আমরা না কি ওঁর কেউ নই, বাড়ি যাবেন না, কোনদিন—হোলটাইম্‌ পার্টির কাজ করবেন।" অনু হাসতে লাগল।

"স্নেহের সম্বন্ধকে অস্বীকার করে পার্টির কাজ হয়না। ভাই-এর মৃত্যুর প্রতিহিংসাতেই লেনিন তৈরী হয়েছিল—" অনুর হাসির উত্তরে অনুকেই যেন মিষ্টি করে বোঝাতে চাইল সুদাস।

পাথরের মতো নিরুৎসুক হয়ে আছে প্রবীর। অনু বল্‌লে: "শুনছো, বড়দা?"

"বাড়ি ফিরে যাওয়াটা আমার পক্ষে খুব গৌরবের মনে করছিস না কি তুই?" খানিকটা শাসনের সুরেই বললে প্রবীর।

"বাবা অনেক বদ্‌লে গেছেন, মা-ও আশ্চর্য্য চুপচাপ থাকেন এখন—দেখলে তুমি অবাক হয়ে যাবে।" প্রবীরের শাসনকে আমলই দিলেনা অনু।

"মানুষ-যে বদ্‌লে যেতে পারে এ ঘোরতর সত্যে কম্যুনিষ্টদের

অনাস্থা থাকা উচিত নয়!” প্রবীরের দিকেই তাকাল সুদাস কিন্তু অত্যন্ত মোলায়েম চোখে, লক্ষ্য করলে প্রবীর দেখতে পেত সুদাসের কাছ থেকে জীবনে তার এ ধরণের দৃষ্টিলাভ হয়নি।

“সুপ্রভার অপমান আমি করতে পারবনা—” দুরন্ত একটা আবেগ চেপে রেখে মুখে বিরক্তি ফুটিয়ে তুললে প্রবীর। সুদাস অপ্রতিভ হয়ে অন্যমনস্ক হতে চেষ্টা করল। অনু ভারি চোখে তাকিয়ে রইল প্রবীরের দিকে খানিকক্ষণ তারপর মুখ নীচু করে বললে ঃ “বৌদিকে কি আমি শ্রদ্ধা করিনে বড়দা?”

মনে-মনে চমকে উঠল প্রবীর অনুর কথায়—অনুর গলার স্বরে। আবেগের ছোঁওয়া লাগলে সব মেয়ের গলার স্বরই কি একরকম হয়ে ওঠে? অনুর এ-স্বর অনেক শুনতে পেয়েছে প্রবীর সুপ্রভার গলায়। একটু মনে করতে চাইলেই কানে এসে পৌঁছয় সে-স্বরগুলো। খানিকক্ষণ ধরে সুপ্রভার কণ্ঠ শুনে যেতে লাগল প্রবীর তন্ময় হয়ে। যখন তা অস্পষ্ট হয়ে এলো ভিখিরি-চোখে তাকাল সে অনুর দিকে—কিছু আর বলবে কি অনু?

“বেঁচে থাকলেও তোমার বাড়ি যাওয়াকে তিনি তাঁর অপমান বলে মনে করতেন না!”

কথা বলল অনু কিন্তু সে-স্বর আর তার গলায় নেই! হতাশ বিষণ্ণতায় চুপ করে রইল প্রবীর। সুদাস হঠাৎ যেন আবিষ্কার করল আবেগের জোয়ারের মুখে ভেসে চলেছে ওরা দুজন— ব্যাপারটাকে বেশিক্ষণ চলতে দেওয়া উচিত নয়।

“প্রবীর—” সুদাস গলায় তার সমস্তটা ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে চাইল ঃ “মানতে কোনো বাধা নেই যে জীবনে আমাদের সুখের ভাগ খুবই কম, তাই সুখের স্মৃতিটাকে পরিচ্ছন্ন রাখবার চেষ্টা করি, ধুলোবালি পড়ে যাতে তা নষ্ট না হয়! হতে পারে এটা খুবই মহৎ মনের লক্ষণ। যারা নিষ্ঠার সঙ্গে এই ছায়া-পূজো

করতে পারে তাদের আমি প্রশংসাই করি। কিন্তু জীবনের বেশির ভাগ দুঃখকে যে সহজ ভাবে গ্রহণ করতে পারে তার মহত্ত্ব একটুও অপ্রশংসার নয়—তাকে আমি প্রণাম করি। আমাদের যুগ, আমাদের সমাজ আর জীবন বেশি করে দুঃখটাকে আমাদের হাতে তুলে দেয়, সেই দুঃখের মড়কে অনেকেই আমরা মরে যাব—এ মড়ককে উপেক্ষা করবার মতো রক্তের জোর যাদের আছে তারাই হবে ভবিষ্যতের স্রষ্টা। তারা আছে, প্রত্যেক যুগেই তারা থাকে—রবীন্দ্রনাথ তাদেরই ডাক দিয়ে গেছেন, মার্ক্সও হয়ত তাদের দিকে চোখ রেখেই শোষণহীন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেছিলেন।”

কথা শেষ করে সুদাস তৃপ্তিতে ভরে উঠল—এতো নিরুত্তাপ অথচ দৃঢ় ভঙ্গী কোনোদিন তার কথায় ছিলনা, মন্ত্রের মতো গম্ভীর একটা সুরের ছোঁওয়া-ও যেন এসে লেগেছিল কথাগুলোতে। অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে অনু—প্রবীর মাথা গুঁজে মেঝেতে তাকিয়ে আছে। আশাতীত ফললাভ করে সুদাস অনুর চোখের উপর ম্লান হাসির একটা হাল্কা তুলি বুলিয়ে নিলে। এক ঝলক স্নিগ্ধতা ছিটিয়ে অনুও ম্লান হাসিতেই জবাব দিল তার।

“বাঙালার সেন্টিমেন্টালিটির অপবাদ তোরা কম্যুনিষ্ট হয়েও যদি না ঘোচাতে পারিস, প্রবীর,” আগেকার সুরই অনুসরণ করে চলল সুদাস: “তাহলে কার কাছে কি আশা করব বল! চারদিকের রূঢ় বাস্তবতার সংঘাতে সেন্টিমেন্টালিটির সম্বল নিয়ে বাঁচা যায় না। বাংলাদেশের আশ্রয় রবীন্দ্রনাথ আজ বেঁচে নেই—বাংলাদেশের নেতা সেন্টিমেন্টালিটির তাড়নায় সংসার ত্যাগ করেছেন—আজ-না-হয় কাল জাপান হয়ত যুদ্ধ ঘোষণা করবে, বাংলাদেশ দাঁড়াবে কোথায়? নিজেকে সত্যি-সত্যি কম্যুনিষ্ট বলে যদি মনে করিস, তাহলে নিজের সেন্টিমেন্ট থেকে সমাজের বিপদটাকেই বড় মনে করতে হবে!”

অন্নুর চোখ যে সুদাসের মুখের উপর চেয়ে আছে তা বুঝতে পেরেও সুদাস মুখ না তুলে প্রবীরের দিকে তাকিয়ে রইল ; প্রবীর আর চুপ করে থাকতে পারেনা তা জানে সুদাস, এক্ষুণি হয়ত সে মুখ তুলবে। মুখ তুলে যে দেখতে পাবে অন্নুর দিকে তাকিয়ে আছে সুদাস—সুদাস ততটা অসংযমের পরিচয় দিতে চায়না।

"এ সাধারণ কথাগুলো নিশ্চয়ই আমি বুঝতে পারি।" প্রবীর সত্যিসত্যি মুখ তুলল।

"অসাধারণ কথা ত আমি বলিনি—" সুদাস নিঃশব্দে সহিষ্ণুতার হাসি হাসতে লাগল।

"আমাকে তোরা কি করতে বলিস্?" অসহায়ের মতো অঞ্জনার দিকেই তাকাল প্রবীর।

"পেছনের অধ্যায়গুলো ঘষে তুলে ফেল্‌তে বলি।"

"রক্ত-মাংসের মানুষকে তুই স্বীকার করিসনে?"

"রক্ত-মাংসের মানুষকেই আমি স্বীকার করি, তার সঙ্গে ছায়া-উপাসকের মিল নেই।"

"যারা ছায়া হয়ে চলে গেছে তাদের কোনো দাবীই কি আমাদের উপর নেই?"

"মনের কাছে দাবী জানাক তারা মাঝে-মাঝে, আমাদের রক্ত-মাংসের জীবনের কাছে তাদের আর কিছু পাওনা নেই।"

অন্নুর যেন শ্বাসরোধ হয়ে আসছিল—এতক্ষণে একটা নিশ্বাস ফেলতে পেরে সে বেঁচে গেল। নখ খুঁটতে সুরু করল প্রবীর—কথা বলতে আর যেন ইচ্ছা করছিলনা তার।

"যাক্ অনেক কথাই হল—" সুদাস দাঁড়িয়ে গেল : "এখন চা খাও তোমরা—সীধুর আবির্ভাব হয়েছে বোধহয় এতক্ষণে—"

সুদাস ঘর থেকে বেরোতে যাবে এম্নি সময় আবির্ভাব হল শমীনের! ঘর্ম্মাক্ত। পায়ে হাঁটার যতটুকু পথ তা প্রায় দৌড়ে এসেছে বোঝা গেল।

"ভেবেছি এখানেই এসেছ—মা যখন বললেন সুবীরের সঙ্গে সিনেমায় গেছ—" সুদাস আর প্রবীরের দিকে মনোযোগ দিতে পারলনা শমীন।

"কিন্তু তোর এতো দেরি হল কেন?" সুদাস হাস্তে লাগল।

"মার সঙ্গে গল্প করতে হল খানিকক্ষণ—" রুমালে মুখ ঘষ্তে সুরু করলে শমীন এবং তদবস্থায় থেকেই বললে: "মাকে জানাতে হ'ল, প্রবীর, ঘটনাটা। শুনে কেমন যেন হয়ে গেলেন তিনি, বল্লেন, আমার সঙ্গেই তোকে দেখ্তে আসবেন।" মুখ থেকে রুমালের যবনিকা সরিয়ে নিলে শমীন।

প্রবীর জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইল—বোঝা গেলনা কি তার মনে হচ্ছে, কি সে বল্তে পারে।

"শমীনদা, আমায় বাড়ি পৌঁছে দেবে?—এক্ষুণি।" অনু ব্যস্ত হয়ে শমীনের কাছে এগিয়ে গেল।

"সে কি, চা খেয়ে যাও।" সুদাস গম্ভীর হাসিতে নির্দ্দোষ হয়ে তাকালে অনুর দিকে।

"চা? দিতে বলুন।" হাসির একটা চঞ্চল রেখা দেখা গেল অনুর ঠোঁটেও।

দুই

মহিমবাবুকে দেখ্লে মনে হয় বহুদিন তপশ্চর্য্যার পর বুদ্ধত্ব-প্রাপ্তির উজ্জ্বলতা নিয়ে তিনি লোকালয়ে ফিরে এসেছেন। চেহারায় আভিজাত্যের একটু জৌলুস লেগেছে—সাদা লংক্লথের গলাবন্ধ কোটের নিভাঁজ ধবধবে পারিপাট্য আর চিনেবাড়ির ফিতেহীন জুতো বার্দ্ধক্যের রং-টাকে পালিশ করে তুলেছে খানিকটা। পুরোণো বন্ধুবান্ধব পরিচিতদের বাড়িতে প্রায়ই তাঁকে দেখা যায় এখন।

দু'একটা গভীর কথা বলেন, পরিমিতভাবে হাসেন আর ধ্যানস্থ হয়ে থাকেন। বুঝিয়ে দিতে চান তাঁর বিচরণ এখন অনেক উঁচু স্তরে, সাধারণের ধরাছোঁয়ার বাইরে—তবু যে তিনি সাধারণের মধ্যে নেমে আসেন তা তাঁর হৃদয়েরই মাহাত্ম্যে। মোটরের পেছনের সীটে একটা কোণ নিয়ে বসে থাকেন তিনি এম্নি প্রসন্নতায় যেন মন তাঁর কোনো লোকোত্তর চিন্তার রোমন্থনে ব্যস্ত।

প্রসন্নতার কারণ আছে। দুশ্চিন্তার বহু দুর্যোগ পার হয়ে খানিকটা উজ্জ্বল আবহাওয়ায় আসতে পেরেছেন মহিমবাবু। নিশ্চিন্ত, নির্ভরশীল জায়গায় এসে যে পৌঁছুতে পেরেছেন তা নয়, তবে মনে হয় হয়তবা দুর্যোগ আর আস্‌বে না—হয়ত সুদিনের সুরু হল এখন থেকে। তাতেই তিনি খুসী। অর্থাভাব তাঁর বার্দ্ধক্যকে দুঃসহ করে তুল্‌বেনা তাতেই খুসী। অপরিমেয় প্রয়োজন নেই তাঁর—নিজের যতটুকু প্রয়োজন একশো তাঁতের কারখানার লাভ থেকে ততটুকু তুলে নেওয়া যাবে। মহীতোষের হয়ত প্রয়োজন বেশি—তেম্নি তার বয়েসও আছে, চেষ্টা করলে একদিন ভালো ইকনমিক ইউনিট গড়ে তুল্‌তে পারবে সে কারখানায়। ভাবতে ভাবতে মহিমবাবু ঈশ্বরের অপার অনুগ্রহ প্রত্যক্ষ করতে সুরু করেন—কৃতজ্ঞতায় চোখের কোটরগুলো তাঁর আর্দ্র হয়ে ওঠে! জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার মুখে কাপড়ের কলটি দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল! অবশ্যি তার জন্যে অক্লান্ত, অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করতে হয়েছে মহীতোষকে। অনেক অপমানও সইতে হয়েছে। তাঁত কেনবার মতো শেয়ারের টাকা তুল্‌তে কি অমানুষিক খাটুনি যে গেছে মহীতোষের অসহায়ের মতো চোখ মেলে তিনি তা শুধু দেখেছেন কিছু করতে পারেন নি। এখন যখন তাঁত বসে গেছে—উঁচুতে উঠ্‌তে সুরু করেছে কাপড়ের বাজার, শেয়ারের জন্যে মহিমবাবুর একটি কথাই যথেষ্ট। কথারও দরকার নেই—পুরোণো শেয়ারহোল্ডাররা চিঠির পর চিঠি দিয়ে নূতন শেয়ারের খবর নিচ্ছেন এখন। তাঁদের কাউকে অসন্তুষ্ট করেন নি

মহিমবাবু—দুঃসময়ে কেউ তাঁরা বিশেষ উৎপাত করেন নি, সে-কৃতজ্ঞতাবোধ মহিমবাবুর আছে।

পুরোণো বন্ধু কেশববাবুর একখানা চিঠি হাতে করে মহিমবাবু মহীতোষের ঘরে এসে ঢোকেন। প্রণবের সদ্য-প্রকাশিত একটা উপন্যাস হাত থেকে কোলের উপর ছেড়ে দিয়ে ইজিচেয়ারে একটু নড়ে-চড়ে ওঠে মহীতোষ, চোখে মোলায়েম প্রশ্ন নিয়ে বাবার দিকে তাকায়।

"কেশব কি লিখ্ছে শোনো—" মহিমবাবু হাতের উপর চিঠিটা একটু কাঁপিয়ে তোলেন: "কোন্ দোকানে নাকি দেখেছে সে 'সোনার বাংলা'র কাপড়—তাই লিখছে, মিল থেকে প্রথম কাপড় বেরোল—আমরা পুরোণো শেয়ারহোল্ডাররাত একজোড়া করে প্রেজেণ্ট পেতে পারি!

"মিল থেকে এখনো কাপড় কোথায় বেরোল?" মহীতোষ সূক্ষ্ম হাসিতে সমস্ত চেহারাটাই ধারাল করে তুল্‌লে: "আন্-মার্কড কিছু কাপড় জোগাড় করে 'সোনার বাংলা'র ছাপ দিয়ে বাজারে ছেড়েছিলুম—তাই দেখে থাক্‌বেন কেশববাবু!"

"কয়েকমাসের মধ্যেই কাপড় যখন বেরিয়ে যাচ্ছে, ওটা না-করলেও পারতে!" মহিমবাবু খানিকটা ক্ষুণ্ণ হলেন।

"শেয়ারবিক্রির জন্যে ওটা করতে হল। হাওয়ার উপর মানুষ কি করে শেয়ার কিন্‌বে বলুন!"

"যাক্—তৈরী সুরু হলে কেশববাবুদের ইচ্ছা পূরণ করতে হবে মনে রেখো—" যুক্তির কাছে নীতিকে নতিস্বীকার করালেন মহিমবাবু: "হ্যাঁ, তোমার সেই উইভিং মাষ্টারের খবর কি?"

"ওর নামে তিনশ' টাকার ড্র্যাফট্ চলে গেছে—এ হপ্তায় এসে পৌঁছুবে নিশ্চয়!"

"ওর মারফৎ বোম্বের সূতোর মার্কেটের সঙ্গেও আমাদের একটা ঘনিষ্ঠতা করবার সুযোগ হল।" ছেলের সিদ্ধান্তকে নিজের যুক্তিতে

নির্দ্দোষ করে নিয়ে মহিমবাবু সর্ব্বদাই নিশ্চিন্ত থাকতে চান। মহীতোষের উপর নির্ভর করতে না পারলে কার উপর আর নির্ভর করবেন তিনি ?

"প্রোডাক্‌শন ভীষণ বেড়ে চলেছে না কি ওখানে।"

"বাড়বেই!" চোখের উজ্জ্বলতায় কোটরের ভেতরটা চক্‌চক্ করে উঠল মহিমবাবুর ঃ "য়ুরোপের রপ্তানি বন্ধ—বাজার লুটছিল জাপান, জাপানের দোরও বন্ধ হল—ইণ্ডিয়ান কটনমিলগুলোর এরচেয়ে আর বড়ো সুযোগ নেই।—মনে আছে, তোমায় আমি বলেছিলুম—"

মহীতোষের হঠাৎ মনে হ'ল তখন থেকে মহিমবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। বেশিরকম নড়ে চড়ে উঠে বল্‌লে সে ঃ "বস্‌বেন নাকি ?"

"না না—কেশবের চিঠির একটা জবাব লিখতে হবে এক্ষুণি। বিকেলে যাব ওর এক ভাগ্নের সঙ্গে দেখা করতে—ঠিকানা দিয়ে অনুরোধ জানিয়েছে—এম-বি ডাক্তার, ক্যাপ্টেন হয়ে মিডল-ইষ্টে চলে যাচ্ছে। কেশব লিখছে—আমাদের প্রোস্‌পেক্টিভ্ শেয়ার-হোল্ডার না কি!" খোলাখুলি সাধাসিধে ভাবে হেসে উঠলেন মহিমবাবু—যত্নে তৈরী, স্বর্গীয় নির্লিপ্ত হাসি নয়।

"আপনি যাবেন কেন ? আমিই না হয় গিয়ে আপনার কথা বলব—"

"আমাকেই যেতে হবে। ওর বাবার সঙ্গে আমার খুবই ঘনিষ্ঠতা ছিল—আমার যাওয়ার মূল্য আরেক রকম—" মহিমবাবু ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ; সাধারণ সুস্থ একজন মানুষ যেভাবে যেতে পারে ঠিক তেমনি স্বাস্থ্য তার যাওয়ার ভঙ্গীতে, বাইরের চলাফেরার যে রকম দার্শনিক ভঙ্গী থাকে তেমন নয়।

মহীতোষ উপন্যাসটা আর হাতে তুলে নিলেনা—আদ্ধেকেরও বেশি পড়া হয়ে গেছে—প্রণব মতামত শুনতে চাইলে, ওটুকু পড়া থেকেই বলা যাবে। মনটাকে অন্যদিকে টেনে নিয়ে গেছেন

মহিমবাবু, পড়তে গেলেও পড়া আর হবেনা এখন। তাছাড়া এমন কিছু ঘটনা জমিয়ে বসেনি প্রণব, যার শেষ পর্য্যন্ত না দেখলে প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে উঠবে। যৌনইচ্ছা অবদমনের একটা নগ্ন কাহিনী। দুজন ছেলে-মেয়ের বিকৃত মনের ইতিহাস। বাঁকা দৃষ্টি নিয়ে মানুষের জীবনকে দেখা—একটু স্বাস্থ্য, একটু উজ্জ্বলতা নেই যেন মানুষের জীবনে। ক্রমেই কেমন যেন দূষিত হয়ে উঠছে প্রণবের দৃষ্টি! বলবার ভঙ্গী অপূর্ব্ব, বিশ্লেষণের ক্ষমতা অদ্ভুত কিন্তু ঘুণধরা দৃষ্টি। কেন এ ধরণের বিশ্বাস তৈরী হয়ে উঠছে প্রণবের মনে? কেন তার তৈরী চরিত্রগুলো বিরাট যৌন অতৃপ্তি নিয়ে প্রেতের মতো ঘুরে বেড়াচ্ছে? চরিত্রগুলো কি তার নিজের মনেরই ছায়া না কি বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরাই তা-ই! পরিচিত কয়েকটি ছেলেমেয়েকে মনে করতে চাইল মহীতোষ, তারা ত কেউ এমন নয়। একবছর আগে হলে হয়ত সুদাসকে এদলে ভাবা যেত। কিন্তু সুদাসও এখন শ্যামলীকে নিয়ে বেপরোয়া মোটরে ঘোরাফেরা করে! অবশ্যি মহীতোষের পরিচিতদের নিয়েই বাংলাদেশ নয়—এমন ছেলেমেয়ে হয়ত অনেক আছে যৌনবোধ যাদের কাছে গুরুতর অপরাধ আর সেই অপরাধবোধ থেকে দিনরাত নিজেদের দেহ-মনের উপর অপরাধ করে চলেছে। তাদের জীবনের দিকে তাকালে সত্যি করুণা হয়, প্রণবের চরিত্রগুলোর কথা মনে করে মহীতোষের মন অনুকম্পায় ভরে উঠল। এই শোচনীয় ব্যাধি থেকে নিজে সে মুক্ত। কোনো ইচ্ছাকে চেপে মেরে ফেলতে চায়নি সে, তাই স্নায়ুগুলো তার সর্ব্বদা সতেজ। আর এ-ও হয়ত তার সৌভাগ্য যে জীবনে এমন কোনো মেয়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হয়নি ইচ্ছাকে দমন করা যার রোগ। এমনকি মফঃস্বলের মেয়ে শ্যামলীও ইচ্ছার মুখে মুখোস পরিয়ে চলে নি। দুদিনের পরিচয়ের পরই শ্যামলী বলেছিল: "তোমাকে ভালো লাগে বলেই ভয় করে, জানো মহীদা?"

"নিরাপদ ব্যবধানে রেখে ত ভয়ের প্রমাণ দাও, ভালো-লাগায়

প্রমাণটা কি ?” রেষ্টুরেন্টের খাবার টেবিলের বিপরীত দিকে বসে জিজ্ঞেস করেছিল মহীতোষ।

টেবিলের উপর হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল শ্যামলী, একটা ভীরু হাসি ছিল তার মুখে। মহীতোষ মুঠোর মধ্যে শ্যালীর হাতটা ধরে রেখেছিল খানিকক্ষণ। কতোক্ষণ যে শ্যামলী ওভাবে ছিল আজ এতোদিন পরে মহীতোষ তা মনে করতে পারেনা। শ্যামলীর দুর্ব্বলতা সেই প্রথম আর সেই শেষ। মহীতোষ অবশ্য তাকে দুর্ব্বলতা বলেনা—মনে করে দুর্ব্বলতা জানাবার সাহস। শ্যামলীর সে-সাহস ছিল। আর তারপর সাহসই ছিল, দুর্ব্বলতা ছিলনা। শুধু মাঝে-মাঝে মহীতোষ বিদেশী গানের প্রেম বর্ণনা করতে সুরু করলে অন্যমনস্ক হয়ে যেত শ্যামলী।

আজও বুঝতে পারেনা মহীতোষ শ্যামলীর উপর সে অবিচার করেছে কি না। সুদাসের সঙ্গে শ্যামলীর ঘনিষ্ঠতায় একটুও বাধা দিতে চায়নি সে—এ কি শ্যামলীর উপর অবিচার নয় ? শ্যামলীর ভালোবাসাকে সে অপমান করেছে—শ্যামলীকে পাবার জন্যে লুব্ধ হয়ে ওঠেনি যখন, সে-ইত ভালোবাসার অপমান !

যাক্-যাক্। মন থেকে কথাগুলো দুহাতে ঠেলে ফেলে দিতে চাইলে মহীতোষ। সুদাসের সঙ্গে পরিচিত হয়ে ভালোই হবে শ্যামলীর। ভালোই থাকবে। মহীতোষের মন গ্লানি থেকে মুক্ত হয়ে এল।

কিন্তু প্রণবের নায়ক-নায়িকারা ত এমন ভাবে গ্লানিমুক্ত হতে পারেনি কেউ ! প্রেমের অনুভূতিটা ওদের মনে বিষের মতো কাজ করে চলেছে—কেউ যেন তার ক্রিয়ায় স্থির, স্বাভাবিক থাকতে পারছেনা ; তাদের চোখের হল্‌দে লেগে সমস্ত পৃথিবীটাই হল্‌দে হয়ে গেছে—হল্‌দে পৃথিবীতে ছটফট করে মরছে তারা ! হতাশায় নষ্ট হয়ে গেছে হয়ত প্রণবের জীবন তাই হয়ত নষ্ট জীবনকেই সে রূপায়িত করে যাচ্ছে। হয়ত সত্যি-সত্যি আছে এমন ছেলেমেয়েও।

হয়ত এরচেয়েও ভীষণ, বীভৎস ছবি আছে বাংলাদেশের! মহীতোষ জানেনা বলেই কি তা নেই, তা হতে পারে না?

বইটা টেবিলের উপর ছুঁড়ে দিয়ে মহীতোষ উঠে দাঁড়াল। কোথাও বেরোয় নি সে আজ। ছুটির দিন। ঠাকুর-চাকরের পরিবারে ঘরে বসে থাকা আগেকার দিনের মহীতোষ দুঃস্বপ্নেও ভাবতে পারত না। কিন্তু আজ অনায়াসে সে ঘরে বসে কাটিয়ে দিল সমস্তটা দিন। বয়েস হয়ে যাচ্ছে না কি তার? মন নিস্তেজ হয়ে পড়ছে কি ক্রমশ?

তা নয়—আদ্দির পাঞ্জাবীটা গায়ে চড়াতে চড়াতে ভাবলে মহীতোষ। মনের সজীবতা একটুও নষ্ট হয়নি তার, একটা সৃষ্টিতে একাগ্র হয়ে আছে বলেই সহজে তা আর পাখা মেলতে চায়না। রত্নাকে কি ভালোবাসেনা মহীতোষ—আর মহীতোষের জন্যে রত্নার আগ্রহও কি কম? ভালোবাসে কিন্তু তাতে আর আবেগের দুরন্ততা নেই, ভালোবাসাকে নিয়ে ইচ্ছা তার কারুকার্য্য করতে চায় না আর।

রত্নার সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়েছিল মহীতোষের শান্তিনিকেতনে, কোনো এক পৌষ উৎসবে। শুধু মৌখিক পরিচয়! কল্‌কাতায় ফিরে এ পরিচয় অক্ষুন্ন রাখবার প্রতিশ্রুতি যদিও দু পক্ষেরই ছিল তবু প্রায় চার বছর কারো সঙ্গে কারো দেখা হয়নি। গত সাতুই আগষ্ট রবীন্দ্রনাথের জোড়াসাঁকোর বাড়িতে আবার দুজনের দেখা। দুজনেই রবীন্দ্রনাথকে শেষবারের মতো একবার দেখে নিতে উপস্থিত হয়েছিল বাইরের প্রাঙ্গনে—দুজনের হাতেই আনন্দবাজারে'র দুটো স্পেশ্যাল। তখনো জনসমুদ্রের জোয়ার এসে পৌঁছয়নি। একটু জনবিরল জায়গায় দাঁড়িয়ে ম্লানমুখে রত্না উপরের বারান্দার দিকে তাকাচ্ছিল বারবার: ভেতরে ঢুকবার ব্যর্থ চেষ্টার পর ফিরে এসে মহীতোষ থমকে দাঁড়িয়ে গেল রত্নার সাম্‌নে: 'রত্না—'

'ও আপনি—' রত্নার চোখ একটু উজ্জ্বল হয়ে উঠে আবার মেঘলা হয়ে এলো : "দেখ্‌তে পেলেন গুরুদেবকে ?"

'না—' মহীতোষ রুমাল দিয়ে কপালটা মুছে রত্নার মতোই দোতলার দিকে তাকিয়ে রইল।

চোখে একটা-কি-যেন-দেখবার উদগ্র আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সরু গলি দিয়ে লোকের বন্যা এসে জড় হচ্ছে অপরিসর প্রাঙ্গনে। বহুদূর হতে তীর্থযাত্রীরা যেন ছুটে এসেছে তাদের আজন্ম কামনার দেবতাকে দেখ্‌তে। কিন্তু প্রাঙ্গনে এসেই উদ্‌ভ্রান্ত তাদের দৃষ্টি—কোথায় তিনি ?

খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে মহীতোষ আর রত্নাও ভাবছিল, কোথায় তিনি ?

'প্রসেশনে যাবে ?' জিজ্ঞেস করল মহীতোষ।

'না।' একটু নড়ে-চড়ে দাঁড়াল রত্না।

'ক্রমেই ভীড় বাড়তে থাক্‌বে, প্রসেশনে না গেলে দাঁড়িয়ে থেকে কি লাভ ?'

'না, এক্ষুণি চলে যাব।'

'বাড়ি ?'

'ইস্কুলে—'

'মাষ্টারি করছ ?' রত্নার মুখের দিকে সম্পূর্ণভাবে তাকাল মহীতোষ : 'ইস্কুলেই তোমাকে পৌঁছে দিয়ে আস্‌ছি—চলো।' গাড়ির দিকে এগোলো মহীতোষ।

'চলুন—' অন্যমনস্কতায় আচ্ছন্ন হয়েই গাড়িতে গিয়ে উঠ্‌ল রত্না।

রত্না খুব নাটকীয় ঘটনার মধ্য দিয়েই তার জীবনে এসে উপস্থিত হল—বেরোবার মুখে ভাবছিল মহীতোষ। সাতুই আগষ্টের আগে রত্নার কথা কোনোদিন কল্পনায়ও আসেনি তার : ক্ষণিকাদের বিস্মৃত তালিকায়ই পড়ে ছিল তার নাম। গত চার বছরে বিয়ে না

করে যে মাষ্টার হয়ে উঠ্‌বে সে, একটা ছোট বাড়ি ভাড়া করে একা-একা থাক্‌তে সুরু করবে কলকাতায়, কোনোদিন রত্নাকে মনে করতে চাইলেও এ কথা মহীতোষ ভাবতে পারতনা। সাতুই আগষ্ট স্কুল পর্য্যন্ত গেল মহীতোষ, আট আগষ্ট রত্নার বাড়িতে। কোনোদিক থেকেই অস্বাভাবিকতার উত্তেজনা ছিলনা কিছু, অস্থিরতা বা চাঞ্চল্য লক্ষ্য করবার মতো।

ছুটির দিন! সম্পূর্ণ ছুটিই নিয়েছে রত্না। একবার ভেবেছিল ট্রামে খানিকটা বেড়িয়ে আসবে—কিন্তু ভীষণ আলস্য লাগতে লাগল। আলস্য উপভোগের ইচ্ছা থেকেই শেষে আবিষ্কার করে নিলে, বেরুলে তালাবন্ধ করেই বেরুতে হবে আর তার ফলে সদু এসে দাঁড়িয়ে থাকবে দরজায়, রাত্রির রান্না হতে দেরী হয়ে যাবে অনর্থক। ছুটির দিন বলে বেচারী সদুও একটু ছুটি পেয়েছে। ছুটির আনন্দ বিরক্তিতে ভরে উঠবে কেন শেষটায়? রান্না-বান্না করে ঘরদোর গুছিয়ে রেখে এতোটা সাহায্য করছে যে প্রাণী তার প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে থাকতে পারে কি রত্না? পয়সায় সেবা কেনা যায়, মমতা কেনা যায়না। মেয়েটির মমতা আছে, অন্ততঃ ওর কাজের ধরণ থেকে মমতা আবিষ্কার করা যায়। তা কি রত্নারই নম্রতা না কি সদুরই গুণ তা বিচার করে দেখতে চায় না সে!

সমস্ত দুপুর ঘুমিয়ে নিয়েছে রত্না। এখন বেতের দুটো চেয়ার মুখোমুখি টেনে নিয়ে যতোটা আরাম করে বসা যায় বসে রবীন্দ্রনাথের 'রাশিয়ার চিঠি'র পাতা উল্টোচ্ছিল। পড়বার মতো বই, পড়ে মুখস্ত করবার মতো। আশ্চর্য্য ছিল রবীন্দ্রনাথের মন, নতুনের বন্দনা-গান শেষ পর্য্যন্ত তিনি করে গেছেন! এ-বইটির পরও কেন সমস্ত বাংলাদেশ সেই অদ্ভুত দেশটি সম্বন্ধে উৎসাহী হয়ে উঠছে না? ভেবে অবাক হয়ে যায় রত্না। ভাবতে থাকে, ভারতবর্ষের মাটি ছেড়ে যাবার কোনোদিন যদি সুযোগ হয় তার,

প্রথমই যাবে সে রাশিয়ায়। মেয়েদের যারা অপদার্থ মনে করেনা, তাদের দেশটা দেখবার ইচ্ছা কোনদিন তার মন থেকে মুছে যাবেনা।

রাশিয়া সম্বন্ধে অনেক রকম কথাই শুনতে পায় রত্না—মহীতোষও অদ্ভুত-অদ্ভুত কথা বলে—যা প্রচারিত হচ্ছে তার আদ্ধেকও না কি সত্য নয়! রত্না বিশ্বাস করতে পারেনা—গুরুদেব মিথ্যা কথা লিখে যান নি নিশ্চয়। মিথ্যার প্রশ্রয় তাঁর মনে ছিল এমন একটা ধারণা করাও পাপ!

বইটাতে ডুবে যায় রত্না, সে যে ঘুমিয়ে পড়েনি চেয়ারের উপর পা-নাড়া দেখে মাত্র বোঝা যায়। দরজায় এসে মহীতোষ কখন দাঁড়িয়েছে, সে-শব্দেও তার মনোযোগ ভাঙলনা। ঘরের ভেতর অগত্যা স-রবে ঢুক্‌তে হ'ল মহীতোষকে: "কি বই পড়ছ ওটা?"

রত্না চম্‌কে উঠলনা, ছেলেমানুষের মতো হেসে বললে: "রাশিয়ার চিঠি।"

"ভালো।" চুপ করে হাসতে সুরু করল মহীতোষ।

রত্না উঠে গিয়ে আলনা থেকে একটা তোয়ালে এনে চেয়ারের উপর বিছিয়ে দিয়ে বললে: "বোসো।"

বসতে বসতে বললে মহীতোষ: "ওম্নি বসা যেতো, তোমার পায়ে ত ধুলো ছিলনা।"

"ধুলো চাপা ত দিইনি, পা-রাখার স্মৃতিটাকে চাপা দিলুম।" হাসতে লাগল রত্না।

"তোয়ালে দিয়ে কি স্মৃতির মতো অ্যাবষ্ট্রাক্ট একটা ব্যাপার চাপা দেওয়া যায়?"

"তাহলে মনে করে নাও অভদ্রতাকেই চাপা দিয়েছি!"

"তা নাহয় দিলে—কিন্তু আমার অভদ্রতা চাপা দিতে গেলে ত সোজাসুজি আমাকে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে হয়!"

"কেন?" মহীতোষ কি বলতে চায় ঠিক যেন বুঝতে পারলনা রত্না।

"তোমার পড়ায় ব্যাঘাত করলুম !"

"ও—" একটা ব্যঙ্গের সুরে সুরেলা হয়ে উঠল রত্নার গলা : "চা খাওয়া যাক্—কি বল ?"

"সন্থুকে দেখছি না ত !"

"সন্থু নেই, দেশেও মানুষ চা খায়।" রত্না ইলেক্ট্রিক ষ্টোভের প্লাগটা পয়েণ্টে জুড়ে দিয়ে জলের কেৎলী আন্‌তে চলে গেল।

চা তৈরীর অসুবিধার জন্যে নয়, সন্থুর অনুপস্থিতিটা কি ধরণের তা জানবার জন্যেই মহীতোষ কথাটা বলেছিল। যদি তা খানিকটা স্থায়ী হয় তা হলে নির্ভয়ে কথাবার্ত্তা বলা যায়, এমন কি খানিকটা অসংযমী হলেও দোষের হয়না। সন্থু সামনে না থাকলে রত্নাও কথাবার্ত্তায় নিঃসঙ্কোচ। আলাপের স্রোত সমাজ-বিজ্ঞান থেকে শরীর-বিজ্ঞানে অনায়াসে যাতায়াত করে। রত্নার এই সৎসাহসই মহীতোষকে মুগ্ধ করেছে সবচেয়ে বেশি।

কেৎলীর গায়ে-লাগা জলটা আঁচলে মুছতে মুছতে রত্না ঘরে ঢুকল।

"দেখা যাচ্ছে দিনকে দিন রীতিমতো কম্যুনিষ্ট হয়ে উঠছ তুমি, রাশ্যান মেয়ের ভূমিকায় গার্ব্বোর মতো প্রায় !" মহীতোষ নির্দ্দোষ ঠাট্টায় উস্কে দিতে চাইল রত্নাকে।

"তাহলে ত চায়ের সঙ্গে খাবার জন্যে পকেটে পুরে একটা ডিম নিয়ে আসতে হ'ত তোমাকে !" কেৎলীটা ষ্টোভের উপর চাপিয়ে দিয়ে রত্না মহীতোষের মুখোমুখি এসে বসল।

"মনে হয়, ভবিষ্যতে আন্‌তে হবে।"

"সে ভয় নেই, কারণ এমন ষ্টেট্ হয়নি যা আমাদের খাবার-দাবার according to need supply করবে। নিজের প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি আয়োজনই আমরা জড় করে তুলতে পারি পয়সা থাকলে।"

"ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই ভালো লাগেনা তোমার।"

"ব্যবস্থার চেয়ে আমাদের মানসিক অবস্থাটাই খারাপ লাগে বেশি।"

"Plain Living-এর নীতিটা ভালোই কিন্তু তার বাজার হলনা! তার মানেই এই, মানুষ অল্পে খুসী থাকতে পারে না।"

"কিন্তু কতো বেশি পেলে খুসী থাকতে পারে বলতে পারো?"

"ওটার সীমা টেনে দেওয়া আর সভ্যতাকে এগোতে না দেওয়া সমান কথা। পাবার লোভ থেকেই মানুষের সভ্যতা গড়ে উঠেছে। লোভের পঙ্ক থেকেই সভ্যতার পঙ্কজ পেয়েছি আমরা!"

"কিন্তু সভ্যতা এখন অন্যদিকে মোড় ফিরে দাঁড়াতে চায়—পঙ্কজ এখন আকাশের মুক্ত আলোর, পঙ্কের অন্ধকারের নয়!" রত্না 'রাশিয়ার চিঠি'-বইটি হাতে তুলে নিয়ে একটা জায়গা খুলে পড়তে সুরু করে দিল: '...সমস্ত মানবসাধারণের মধ্যে এরা একটি অদ্বিতীয় মানবসত্যকেই বড়ো বলে মানে—সেই একের যোগে উৎপন্ন যা কিছু এরা বলে তাকেই সকলে মিলে ভোগ করো—'মা গৃধঃ কস্যচিদ্ধনং'—কারো ধনে লোভ কোরোনা। কিন্তু ধনের ব্যক্তিগত বিভাগ থাকলেই ধনের লোভ আপনিই হয়। সেইটিকে ঘুচিয়ে দিয়ে এরা বলতে চায় 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'...' রত্না পড়ার শেষে চুপ করে হাসতে সুরু করল।

"তার মানে কি সভ্যতা উপনিষদের যুগে ফিরে যেতে চায়? মার্ক্সবাদকে উপনিষদের সঙ্গে জুড়ে দিলেন রবীন্দ্রনাথ?" অস্পষ্ট বিদ্রূপের রেখা ফুটে উঠল মহীতোষের ঠোঁটে।

"মানুষকে ভালো হবার পথ যে-'বাদ'-ই দেখিয়ে দিক—হোক তা ফিলজফি বা সায়ান্স—তাদের গিয়ে এক জায়গাতেই দাঁড়াতে হয়।" রত্না খানিকটা বিমর্ষ হয়ে গেল।

মহীতোষ তা লক্ষ্য করল—এক সেকেণ্ডেই ভেবে নিলে সে এ ধরণের একাডেমিক তর্কে রত্নাকে বিমর্ষ করে লাভ নেই—তাই এক

সেকেণ্ডের পর আর সময় নষ্ট না করে বললে : "দাঁড়াতে হোক—তুমি গিয়ে আপাতত কেৎলীর কাছে দাঁড়াও।"

রত্না উঠে গেল কিন্তু চুপ করে নয় : "মস্ত বড়ো ইণ্ডাষ্ট্রি গড়ে তুলতে চাও, তোমার কাছে ত ভালো লাগবেইনা এসব কথা—" তারপর চায়ের সরঞ্জামগুলো একে-একে জড়ো করতে করতে বলতে লাগল : "লোভীর সভ্যতাইত তোমার চাই, ক্যাপিটালিষ্ট হতে চলেছ যখন!"

"লোভীর সভ্যতাই আজ পর্য্যন্ত বাজারে চলতি—তার শেষ আজও চোখে দেখা যায়না। শেষ যদি দেখা যেত লোভীরা এতো বড় যুদ্ধে পা বাড়াতনা কোনোদিন—নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ চালিয়ে শক্তি ক্ষয় করবার সাহস করতনা!"

"যারা লোভী নয় এবার তারাও যুদ্ধে নেমেছে—নতুন সভ্যতা চুপ করে বসে নেই!"

"পেপার বেলুন নিয়ে বিশেষ কিছু করবারও উপায় নেই।"

"রাশিয়ার সব পেপার বেলুন?"

"তা নাহলে হিটলারের সঙ্গে মিতেলি করতে যায়? সব দেখে-শুনে নিশ্চিন্ত হয়ে তাই এখন হিট্‌লার মিতেলি ভেঙে দিয়ে আক্রমণ করেছে!"

"তুমি কি বলতে চাও রাশিয়া হেরে যাবে?"

"হয়ত।"

"তাহলে তা পৃথিবীর পক্ষে খুব সুদিন হবেনা!"

"তা না হতে পারে, কিন্তু তোমাদের মোহ ভাঙবে।"

রত্না চুপ করে চা তৈরীতে মন দিলে। কাপের গায়ে চামচের টুং-টুং শব্দ শুধু। শুন্‌তে ভালো লাগছিল মহীতোষের। এমনি কিছু মৃদু, সুরেলা শব্দই শুন্‌তে চায় মহীতোষের কান—যুদ্ধ নয়, তর্ক নয়, ব্যবসা বা মাষ্টারি নয়। স্নায়ুগুলোকে সহজ সচল রাখবার জন্যে মনে খানিকটা মৃদুতার প্রলেপ চাই মহীতোষের, রত্না তা দিতে

পারে। তার বেশি দরকার নেই তার ; বেশি পেলে সে ফিরিয়ে দেবেনা কিন্তু না পেলেও ক্ষতি নেই।

টি-পয়ের উপর ছু'কাপ চা রেখে রত্না এসে চেয়ারে বস্‌ল : "চা-টা ভালো হয়নি হয়ত !"

একটা কাপ হাতে তুলে নিয়ে মহীতোষ বল্‌লে : "কেন ? রাশিয়ার বিরুদ্ধ সমালোচনা করলুম বলে ?"

"খুব সমালোচনা কর, রাশিয়া আমার কে ?" ঠোঁটের পাতলা হাসির সঙ্গে রত্না চোখে তিরস্কার ফুটিয়ে তুল্‌লে।

চায়ে ঠোঁট ভিজিয়ে নিয়ে বললে মহীতোষ : "কম্যুনিষ্ট হতে চলেছ আর রাশিয়া তোমার কেউ নয় ? রাশিয়ার কথা হচ্ছিল বলেইত খুসী হয়ে চায়ে এতোটা চিনি দিয়ে ফেলেছ !"

"তুমি বললেনা কেন চায়ে কম চিনি খাও ?"

"আমি কি জানি মেয়েরা চায়ে বেশি চিনি খায় ?"

ছোট ছোট হাসির ঢেউ-এ রত্না ঘরের আবহাওয়াটাকে সাঙ্গীতিক করে তুলল। মহীতোষ চুপ করে চায়ে মনোযোগ দিলে, হয়ত মনকে ভরিয়ে তুলতে চাইল রত্নার হাসির ধ্বনিতে।

"সিগারেট খেতে পার চায়ের সঙ্গে—পুরুষরা যা খায়।" রত্না কাপের উপর থেকে উঁকি দিয়ে যেন টুপ করে কথাটা ফেলে দিল।

"পুরুষরা খায় তা আমি জানি আর আমিও খাই। কিন্তু এখন খাওয়া যায়না।"

"কারণ ?"

"কারণ এ-চায়ের স্বাদটা মিষ্টি থাক্‌বেনা—"

ঠোঁটের সহজ হাসিকে শাসন করে একটু গম্ভীর দেখাতে চাইল রত্না। মহীতোষও কেমন যেন নিরুপায় হয়ে গেল। তারপরই হঠাৎ মনে হল তার রত্নার গাম্ভীর্য্য গম্ভীর হয়ে থাকার অভ্যাসেরই দরুণ, তার কথার দরুণ নয়। তবু সে জিজ্ঞেস করল : "চুপ করে আছ যে ?"

"কথা বলতে থাকলে চা খাব কখন ?"

"কথা বলার জন্যেইত চা খাওয়া !"

"দুটো জিনিষ একসঙ্গে কখনো হয়না আমার। ছেলেবেলায় তাই গান শেখাই হলনা, হারমোনিয়মে একহাতে বেলো করতে গেলে, রীডের উপর আরেক হাতের আঙুল চালাতে ভুলে যেতুম !"

"বিশ্বাস হয়না—" চতুর হাসি ফুটে উঠ্‌ল মহীতোষের মুখে।

"সত্যি বলছি—" সরলভাবে বললে রত্না।

"তাহলে রবীন্দ্রনাথ আর কম্যুনিজন্‌ মানিয়ে চলছ কি করে ?"

"এক ঠাঁই-এ ত ওরা নেই—রবীন্দ্রনাথ আছেন মনের ক্ষেত্রে, কম্যুনিজম্‌ অর্থের ক্ষেত্রে। হতে পারেনা এমন ?"

"এমন কেন, আরো বিশ-পঁচিশ রকমই হ'তে পারে। তবে তার একমাত্র বিশুদ্ধ নাম জগাখিঁচুড়ি।"

"বেশ, তাহলে তা-ই।" চা শেষ করে রত্না কাপটা টিপয়ের উপর সশব্দে রেখে দিল।

রত্নার রাগ-করাটা উপভোগ করতে লাগল মহীতোষ। ঠোঁট চেপে রাখ্‌লেও মুখটা তখন একটু লাল্‌চে দেখায় রত্নার, ভালো লাগে। কিন্তু অনেকক্ষণ ভালো লাগতে দেয়না রত্না। হঠাৎ স্বাভাবিক হয়ে যায়, স্বাভাবিকভাবে কথা বলতে সুরু করে।

আজ মহীতোষই প্রথম কথা বললে : "তোমার মনে হয় কিনা জানিনে আমার কিন্তু একটা কথা প্রায়ই মনে হয়—"

"তোমার ত অনেক কথাই মনে হয় যার কোনো মানে নেই—"

"কথাটা শুনে মানে পাও কি না ত্যাখো—কথাটা হচ্ছে, কম্যুনিজম্‌ চাওয়ার কোনো মানে নেই—। শোনো, এক্সপ্লেন করতে দাও। চাওয়াটার পেছনে অকর্ম্মণ্যতা ছাড়া কোনো চেষ্টা প্রায়ই দেখা যায় না—তাই চাওয়ার মানেটা এমন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে যে কেউ আমাদের এনে কম্যুনিজম্‌ দিয়ে যাক্‌ পৈতৃক সম্পত্তির মতো তা আমরা ভোগ করতে থাকি !"

"তা নয়। অনেকে কাজ করছেন—"

"লালঝাণ্ডার মিছিলকে আমি কাজ মনে করিনে—"

"তুমি যাকে কাজ মনে কর তেমন কাজও অনেকে করেন—আমি একজনকে জানতুম তিনি করতেন—"

মহীতোষ মনে-মনে একটু অস্বস্তি বোধ করলে। কাকে জান্‌ত রত্না? এখনও কি তাকে জানে? মেলামেশা আছে কি তার সঙ্গে? অনেকের সঙ্গেই অবশ্যি রত্নার মেলামেশা থাকৃতে পারে—এমন কিছু কঠোর ব্রত গ্রহণ করবার তার কারণ নেই যাতে মহীতোষ ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সঙ্গে সে মেলামেশা করবেনা—একথা বুঝতে পারে মহীতোষ, তবু অস্বস্তির একটা কাঁটা মন থেকে সরিয়ে দিতে পারেনা। এমন কি সোজাসুজি রত্নাকে জিজ্ঞেসও করতে পারেনা কার সঙ্গে তার পরিচয় ছিল। ভয়ের মতোই খানিকটা দুর্ব্বলতা অনুভব করে। আর তাই চুপ করে থাকে।

"একটা ভালো আদর্শ নিয়ে যে যতটুকু করতে পারে তা-ই কি ভালো নয়?" রত্না আবারও বললে—মহীতোষের চুপ করে যাওয়াটায় তার লক্ষ্য ছিলনা।

মহীতোষ এবারও কথা বললেনা, শুধু ঠোঁটের প্রান্তগুলোতে কয়েকটা হাসির অস্পষ্ট রেখা ফুটিয়ে তুলল।

"দেখ্‌তাম প্রবীরবাবুর সে-আদর্শ আছে—মানুষের জন্যে সহানুভূতি, সে-মানুষ যতো ছোটই হোক!" রত্না সহজভঙ্গীতেই কথাগুলো বলে গেল, ওর কণ্ঠে আবেগ বা আবেগের কোনো স্মৃতি লেগে নেই। কিন্তু তাতেই মহীতোষ বিচলিত হয়ে উঠ্‌ল আর নিজেকে গোপন করবার চেষ্টায় প্রাণপণে হেসে বলে উঠ্‌ল: "প্রবীরকে তুমি চেনো না কি?"

"তুমিও চেনো?"

"একসঙ্গে পড়েছি স্কটিশে—আমি চিনিনে! তোমার চেনা-টাইত অদ্ভুত!"

"নাইট স্কুলে পড়িয়ে বেড়াতেন ভদ্রলোক, তখনই আলাপ হয়েছিল একবার!"

"আলাপেই কম্যুনিষ্ট হয়ে উঠ্‌লে, সহপাঠী হয়েও আমি যা হতে পারলুমনা!" অনেকটা সহজ হয়ে এল মহীতোষ।

"আমি কম্যুনিষ্ট হয়ে উঠেছি তোমায় কে বল্‌লে?"

"কে আবার বলবে! প্রবীরের কথাবার্ত্তা শুনেছি, তোমার কথাবার্ত্তাও শুন্‌ছি!"

"তোমার সহপাঠী প্রবীর ছাড়াও ত প্রবীর থাক্‌তে পারেন!"

"অজস্র প্রবীর আছেন! তবে মনে হয় তারা কেউ ঘরের খেয়ে বিদ্যাবিতরণ করে বেড়ান না আমাদের প্রবীরের মতো। তাছাড়া চায়ের সঙ্গে অনর্গল সিগারেট টান্‌তেও তার মতো তাঁরা কেউ পারেন না আশা করি!" মহীতোষ ঝরঝরে হাসিতে রত্নাকে বিব্রত করে তুলতে চাইল।

রত্না হাস্‌বার চেষ্টা করে বললেঃ "ভীষণ সিগারেট খেতেন ভদ্রলোক!"

"নিরুপদ্রব মাষ্টারি ছেড়ে তুমি বিপ্লবী মাষ্টারি করতে চেয়েছিলে না কি?" মহীতোষ থামলনা।

"সম্ভব হলে করতুম তাই।"

"এ কি খুব একটা অসম্ভব?"

"খাওয়াপরার চিন্তার দুর্ব্বলতা আছে বলেই সম্ভব হলনা!" রত্নার মুখে ছায়ার আভাস দেখা গেল। মহীতোষ নিজেকে সংযত করে নিলে—আর এগোনো হয়ত উচিত হবেনা। কিন্তু এগোতে সুরু করল রত্নাইঃ "নিজের উপর দুর্ব্বলতা থাক্‌লেও বাইরের দিকে চোখ বুঁজে হয়ত কেউ আজ থাকতে পারে না। আমরা খাই-দাই-ঘুমোই আগেরই মতো, কিন্তু পৃথিবীর অনেক দেশের মানুষই আজ ঘরবাড়ি ছাড়া, মৃত্যুর সঙ্গে লড়ছে। তাদের বাঁচাবার জন্যে আমরা কিছু না করতে পারি, তাদের জন্যে বুকে একটু ব্যথা অনুভব করতে

কি ক্ষতি? তা-ও ত আমরা করছিনে! আর কে বল্‌তে পারে আমাদের দেশের মানুষদেরও ও-দশা হবেনা—জাপান এগিয়ে আস্‌ছে। এদেশে যুদ্ধ হ'লে, তুমি আমি না হয় পালিয়ে বাঁচতে পারব—কিন্তু কোটি কোটি গরীব গাঁয়ের লোকের আর দিনমজুরের কি অবস্থা হবে ভাবতে পারো?" রত্না চুপ করে গেল। মহীতোষ কথাগুলোতে আবেগের স্বাদই খুঁজে পেলে, যুক্তির স্পর্শ আবিষ্কার করতে পারলেনা।

"ভেবে কিছু লাভ আছে, বলতে পারো?" মহীতোষের গলায় খানিকটা সহানুভূতি শোনা গেল।

"ভাবনাটাই লাভ। তাতে আমাদের মনের একটা ট্রেনিং হয় নাকি?"

"কিন্তু মন যখন উপায় খুঁজে পায়না তখন? তখন যে কি বিশ্রী হয়ে পড়ে মানুষের অবস্থা, স্নায়ুর যে কি দুর্দ্দশা হয় সে কথাটা ভাবতে পারো?" মহীতোষ একটু থেমে নিলে: "তার চেয়ে কি ভালো নয় যতটুকু নিরুপদ্রব সময় পাওয়া যায় তাকে উপভোগ করা? ফুটবলের মাঠ ছেড়ে পরের মুহূর্ত্তে ব্যাটল্‌ ফিল্ডে গিয়ে হাজির হওয়ার মতো মনের ট্রেনিং-কে নিশ্চয়ই তুমি ভালো বলবে।"

"ভালো বলব।"

মহীতোষ পকেট থেকে সিগারেটের বাক্স তুলে নিয়ে অত্যন্ত তৃপ্তিতে একটা সিগারেট খুঁটে নিলে। তারপর সিগারেটটা ঠোঁটে লাগিয়ে অস্পষ্ট স্বরে বলতে লাগল: "কাইজারলিং ইংরেজ সম্বন্ধে যে কথা বলেছেন আমি অনেকটা তা-ই। ইন্‌ষ্টিংক্টের তাড়নাতেই চলা অভ্যাস আমার। কবে কোন্‌ বিপদ আসবে না-আসবে তা নিয়ে আগে থেকে ভেবে হাত-পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসিনে।"

"কাঁদতে বসার কথা ত আমিও বলিনে, বিপদের সঙ্গে লড়াই করবার মতো সাহস আর শক্তি সঞ্চয়ের কথাই বলি।"

রত্নার কথায় মন দেবার দরকার ছিলনা মহীতোষের—নিজেকে

জাহির করবার পালাই চল্‌ছিল তার। এখন সে নিশ্চিত ভাবে বুঝ্‌তে পারছিল যে রত্নার মনের উপর নিজের ব্যক্তিত্বটাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা গেছে আর তাই প্রবীর সম্বন্ধে আশঙ্কাটা মনে তার ফিকে হয়ে উঠ্‌ছিল! সিগারেটের ধোঁয়ার ঝাঁজে চোখ সরু করে নিয়ে মহীতোষ বল্‌লে: "অনেকদিন প্রবীরের সঙ্গে দেখা নেই, প্রায় দুবছর—শেষ দেখা হয়েছিল লাইটহাউসে, একটি মেয়ে সঙ্গে ছিল তার!"

গলার স্বরে বন্ধুবাৎসল্য আন্‌তে চাইলেও মহীতোষের কথার উদ্দেশ্যটা রত্নার বুদ্ধিতে ধরা পড়ে গেল। ওর ঠোঁটের সূক্ষ্ম ও শুক্‌নো হাসিতেই মহীতোষ তা বুঝে নিলে। কিন্তু তাতে একটুও অপ্রতিভ হলনা মহীতোষ, রত্নার কাছে প্রবীরকে সে খুলে ধরতেই চায়: "শুনেছিলুম ও মেয়েটিকে পড়ায় প্রবীর, হয়ত নাইটস্কুলে!" হাস্‌তে লাগল মহীতোষ।

"বেশ ত, তাতে ক্ষতি কি?"

"ক্ষতির কথা ত আমি বল্‌ছিনে—এদিকটাতে বরং আমি প্রশংসাই করি প্রবীরকে, মেয়েদের সম্বন্ধে তার টাবু নেই।"

"প্রশংসার ভাষাটা তোমার গোলমেলে—" এবার রত্নাই হেসে উঠ্‌ল জোরে।

"কি করে?"

"এতক্ষণ যা বল্‌ছিলে মনে করে ছাখো, বুঝতে পারবে।"

রত্নার সামনে নিজেকে দুর্ব্বল মনে হতে লাগ্‌ল মহীতোষের। একটু আগে নিজের ব্যক্তিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে ভেবে যতোটা নিশ্চিন্ত হয়েছিল সে, তার স্নায়ুতে দুশ্চিন্তার ঠিক ততটা অস্থিরতাই চল্‌ছিল এবার। নিজেকে যতো ফাঁকিই দিক মহীতোষ, রত্নার সান্নিধ্য ছাড়া রত্নার কাছে যে সে আরো কিছু আশা করে প্রবীরের ব্যাপারটা উঁকি দিতেই যেন তা পরিচ্ছন্ন হয়ে উঠ্‌ল। এখন শুধু ভেবে চল্‌ছিল সে, এই 'আরো কিছু'র প্রশ্রয় কি রত্নার কাছে আছে?

"মনে পড়্‌ল ?" কয়েক মুহূর্তের অন্যমনস্কতা থেকে উঠে এসে রত্না হাসির একটা মৃদু প্রলেপ মেখে নিলে ঠোঁটে।

মহীতোষ কথা বল্‌লেনা, রত্নার দিকে একবার তাকিয়ে মনে-মনে যাচাই করতে স্বুরু করল রত্নাকে। সাতাশ বছর বয়েসের একটা ক্লান্তি আর একটু কঠোরতা আছে রত্নার চেহারায়, বাঙালী মেয়ের অগাধ স্নিগ্ধতার দরুণই তা বড়ো হয়ে ওঠেনি। তাছাড়া চোখ ওর স্বপ্ন দেখ্‌তে জানে, বয়েসের হল্‌দে হাত ছুঁয়ে যেতে পারেনি সে-চোখ। রত্না নেশা জমিয়ে তোলেনা শ্যামলীর মতো— ভালো লাগিয়ে তুল্‌তে পারে। ঠাণ্ডা, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল এক গ্লাস পানীয়ের মতো ওর ক্রিয়া। অনেক অস্থিরতার শেষে এম্নি একটা স্থির পরিবেশেরই যেন দরকার আছে মহীতোষের। ইচ্ছা করলেই এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারে সে—প্রবেশ আর প্রস্থানের পথ সম্পূর্ণ খোলা কিন্তু তেমন ইচ্ছা কি সে করতে পারে ? এ ধরণের ইচ্ছার ছায়া রত্নার মনে উঁকিই দেয়না কখনো—কিন্তু মহীতোষ তা এড়াতে পারেনি। তার মানেই এই যে-সম্বন্ধের স্রোতে ওরা তুজন চল্‌তে স্বুরু করেছে, মহীতোষ তা নিয়ে তৃপ্ত নয়। তার পুরোণো অস্থিরতার সম্পূর্ণ মৃত্যু হয়নি এখনও। মৃত্যু হয়েছে মনে করলেই তার মৃত্যু হয়না ; মনের বাইরে শরীরের রক্তবিন্দুতে তার অস্তিত্ব—মনের শাসন সবসময় চলেনা সেখানে।

"হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেলে যে ?" অনেকক্ষণ চুপ থেকে হঠাৎই যেন মনে পড়ল রত্নার।

"ভাবছিলুম কাল থেকে আবার অফিস—"

"তুমি না ইন্‌ষ্টিংক্টে চলো—তাহলে কালকের ভাবনা আজ কেন ?" হেসে উঠ্‌ল রত্না।

"আজের ভাবনায় যে তুমি যুদ্ধের ভাবনা এনে ফেল্‌তে চাও !"

"আর তা আন্‌বনা।" রত্না আবারও হাস্‌লে।

মহীতোষের মনে হ'ল অতীতের কোনো এক মুহূর্তে শ্যামলীর পাশেই যেন সে বসে আছে।

তিন

শমীন বাড়ী ছিলনা। অমিতা ওর ঘরে ঢুকে পুরোণো চিঠিপত্র-গুলো খুলে দেখছিল, কিছু পাওয়া যায় কিনা। কিছু মানে রঞ্জনের কোনো চিঠি আর তাতে অমিতা সম্বন্ধে দু' একটা কথা। বন্ধ ঘরে বহুদিন পরে কোন্ এক ছিদ্রপথে একটু আলো এসে উঁকি দিয়েছিল —এখন আর তা দেখা যায়না—তাই জান্তে চায় অমিতা, সে কি সত্যি আলো না কি তার চোখেরই ভুল। চোখের ভুল নয়—সমস্ত দেহে সে-আলোর উষ্ণ, উজ্জ্বল স্বাদ পেয়েছে অমিতা—আলো যে এসেছিল তাতে ভুল নেই। কিন্তু তা বলে সে-আলো যে আজও বেঁচে থাকবে—বেঁচে থাকবে অমিতারই জন্যে তার কি মানে আছে? এমন ত অনেক হয় অতীতের কয়েকটি আনন্দের মুহূর্ত্ত জীবনে কখনো এসে আর উঁকি দেয়না—ওরা বেঁচে থাকে আর মরে যায় অতীতেই। তাকে স্মরণ করে কেউ বা দীর্ঘনিশ্বাস টানে, কেউ বা তা নিঃশেষে ভুলে যায়। ভুলে যায় সে-আনন্দের চেয়ে গভীরতর আনন্দের স্বাদ পেয়ে—আর স্মরণ করে ততটুকু আনন্দের স্বাদও যখন আর জীবন এনে দিতে পারেনা। জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখতে পায় অমিতা সেখানে আনন্দের অবকাশ নেই কোথাও, কোনো কিছুর লুব্ধতায় হৃৎপিণ্ড তার সচকিত, সোচ্চার হয়ে ওঠেনা। শরৎবাবুর জীবনের সঙ্গে নিজেকে এক পা-ও চালিয়ে নিতে কেমন যেন এখন ভয় হয় তার। আগে ভয় হত না—হয়ত সে চিন্তাই করতে জানত না আগে—হয়ত তখন রঞ্জনের সঙ্গে দেখা হয়নি তার। ভয় না হলেও কি অমিতা আগে তার জীবনে শরৎ বাবুকে সহজভাবে

স্বীকার করে নিয়েছিল? একটু দ্বিধা একটু দ্বন্দ্ব কি ছিলনা তাতে? মধ্যপথে ছিল না কি কখনো সুদাসবাবু? কিন্তু অমিতার জীবনের জ্বরের উপর এক মুহূর্তের জন্যেও স্নিগ্ধ হাত বুলিয়ে দেননি তিনি—শুধু রঞ্জনের কাছ থেকেই সেই স্নিগ্ধতার স্পর্শ পেয়েছে সে। আর কেউ নয়। কাউকে আর স্মরণ করতে পারেনা অমিতা।

রঞ্জনের হাতের লেখা সে চেনে। খাম আর পোষ্টকার্ডে লেখা ঠিকানার উপর চোখ বুলিয়ে চল্‌ল সে। একেকবার অমিতার মনে হচ্ছিল, খুবই একটা সাধারণ ঘটনাকে কি সে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে তুল্‌ছেনা? রঞ্জনের চোখ-মুখের সামান্য একটু উজ্জ্বলতা সাধারণ ঘটনা ছাড়া কি? পথ চল্‌তে দুজন অপরিচিত ছেলে মেয়েও ত মুখোমুখি হয়ে কয়েকমুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল দেখাতে পারে। সেই উজ্জ্বল মুহূর্তগুলো জলের উপর দাগের মতো তখুনি আবার নিশ্চিহ্ন হয়ে মুছে যায়। চিঠির উপর অমিতার আঙুলগুলো আর চলতে চায়না,—হয়ত রঞ্জনের চিঠি নেই—চিঠি দেয়নি রঞ্জন।

কিন্তু মানুষের জীবনের অসাধারণ ঘটনাগুলো কি এম্নি একটা সাধারণ চেহারা নিয়েই সুরু হয়না? টেবিলের কাচটার উপর নখ ঘষে ঘষে ভাবতে লাগল অমিতা। যে-ভালোবাসা মানুষের জীবনে সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে সুরুর চেহারা দিয়ে কি তার পরিণতি কল্পনা করা যায়? সামান্য একটু পরিচয় সুযোগ আর সুবিধার আলোহাওয়ায় অগাধ ভালোবাসা হয়ে দাঁড়াতে পারে। ভালোবাসায় সার্থক হয়ে উঠেছে যাদের জীবন, কোনো বিরাট সাধনা তাদের নেই, সুযোগকেই সার্থকভাবে খুঁজে নিয়েছে তারা। কিন্তু সে-সুযোগই বা অমিতার কোথায়! সুযোগ তৈরী করে নেবার ক্ষমতা কি তার আছে? শমীনকে কি সে জিজ্ঞেস করতে পারবে, রঞ্জন কোথায় আছে? এই সাধারণ একটু সাহসের অভাবে কতো সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যায়।

কাচের নীচে—হঠাৎ চোখ পড়ল অমিতার—কাচের নীচে একটা ব্রাউন রঙের খাম। তাড়াতাড়িতে কাচ তুলে খামটা আন্‌তে গিয়ে

হাতের উপরে ছড়ে গেল খানিকটা। কিন্তু তা খেয়াল করবার সময় হলনা তার। খাম থেকে চিঠিটা খুলে নিয়ে একনিশ্বাসে পড়ে যেতে চেষ্টা করল আগাগোড়া।

বারান্দার দিককার দরজায় কড়া নড়ছে। অমিতার খেয়াল নেই। পড়ে যাচ্ছে সে চিঠি ঃ

'…ঝড়ো হাওয়ার মতো রাজপুতনা ঘুরে দেখছি। বলতে পারিস মরুভূমির দেশই আমার মতো লোকের উপযুক্ত ঠাঁই। কিন্তু মরুভূমিতেই ঘোরাফেরা করছিনা—আরাবল্লী দেখলুম—দিকচিহ্নহীন আরাবল্লী—ভালো লাগল। তাছাড়া ময় ভুঁখা হুঁ—কালীমূর্ত্তির দর্শন ঘটল। 'ময় ভুঁখা হুঁ'—কথাটা বেশ, মনে হয় সারা ভারতবর্ষেরই অন্তরের কথা এই। সারা ভারতবর্ষের না হোক, অন্তত আমার মতো অনেক মানুষই মনের উপর কান পেতে শুনতে পায়ঃ ময় ভুঁখা হুঁ। আশাকরি তোর এ মনের কান্না নেই। প্রবীর কেমন আছে আর সুপ্রভা? তোরা কেমন আছিস? তোর মাসীকে ধন্যবাদ জানাস—ওঁর চা-খাওয়ানোটা মনে পড়ে…'

ঠোঁট শুকিয়ে উঠল অমিতার, কেবল ঠোঁট নয়—বুক পর্য্যন্ত সমস্ত গলাটা। আর কিছু আছে কি তার কথা—আরো কিছু? নেই। ধন্যবাদ দেওয়া ছাড়া আর কিছু নেই। থাকলেও অমিতা এখন আর কিছু খুঁজে বার করতে পারছেনা।

অনর্গল কড়া নড়ে চল্‌ছিল—মাঝেমাঝে খুবই জোরে। হঠাৎ যেন খেয়াল হ'ল অমিতার। শমীন এলো না কি? তাড়াতাড়িতে ব্লাউজের ভেতর চিঠিটা লুকিয়ে ফেলে অমিতা দরজা খুলে দিল।

একটি মেয়ে। অমিতা বিরক্ত হয়ে উঠল। বিরক্তির আভাস কথায় ফুটলনা—ফুটল চোখে।

"শমীনদা বাড়ি নেই?" ম্লান একটু হেসে জিজ্ঞেস করল অনু।

"বেরিয়ে গেছেন খানিকক্ষণ আগে।"

"বেরিয়ে গেছেন—"

মনে পড়ল অমিতার রঞ্জনও এসে সেদিন এমনি জিজ্ঞেস করেছিল শমীনের কথা। আজও কি এই মেয়েটি না এসে হঠাৎ এসে উপস্থিত হতে পারতনা রঞ্জন—শমীন বাড়ি ছিলনা, শরৎবাবুও এক বন্ধুর সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছেন! অমিতা অনুর মতো করেই হেসে বললে: "ভেতরে এসে বসুন—হয়ত এখুনি আসবে।" কথাটা বলেই অমিতা অবাক হয়ে গেল, রঞ্জনকে ঠিক এ-কথাই সেদিন বলেছিল ও।

অনু ঘরের ভেতরে এলো।

"উপরে চলুন না—"

অনু চারদিকে তাকিয়ে বললে: "এখানেই ত বেশ!"

চেয়ারের একটা হাতল ধরে দাঁড়িয়ে অমিতা অনুর দিকে নিবিড়-ভাবে তাকিয়ে রইল।

"আপনি বোধ হয় শমীনদার মাসী—মনে পড়ে শমীনদা একদিন বলেছিলেন আপনার কথা!"

"কি বলেছিলেন?" অমিতার হাসিতে একটু সঙ্কোচ ফুটে উঠল।

"ওঁর যে একজন মাসী আছেন সে কথাই বলেছিলেন। আপনাকে দেখে তা-ই মনে হল!"

"দেখে তা মনে হয়?" হাসতে লাগল অমিতা ছেলেমানুষের মতো।

"তা নয়।" অনু অসহায় হয়ে থেমে গেল: "বয়েসে আপনি অনেক ছোট সে-কথাই বলেছিলেন শমীনদা!"

"আপনি এই প্রথম এলেন—না?" অমিতা চেয়ারে বসে জিজ্ঞেস করল।

"হাঁ। একটা জরুরী দরকারে আস্‌তে হল!"

"মামলা-মোকদ্দমা নয় ত?" সশব্দে হেসে উঠল অমিতা কিন্তু অনুর দিকে চোখ পড়তেই মনে হল কথাটা তার ভালো শোনায়নি, তাড়াতাড়ি তাই আবার সে বল্‌তে গেল: "উকিলের কাছে তাছাড়া আর কি জরুরী কাজ থাকতে পারে বলুন!"

"আমার দাদা শমীনদার বন্ধু—দাদারই একটা ব্যাপারে দরকার ছিল ওঁর সঙ্গে আলাপ করবার।" মুখে একটু গাম্ভীর্য্য নিয়ে এলো অনু।

"ও"—অমিতাও একটু গম্ভীর দেখালে। কয়েকটা মুহূর্ত্ত অস্বস্তিকর চুপচাপে কেটে গেল। তারপর অমিতাই আবিষ্কার করলে যে চুপ করে থাকাটা ভালো দেখাচ্ছেনা।

"আপনি নিশ্চয়ই কলেজে পড়েন?" জিজ্ঞেস করল অমিতা।

মুখে একটু আশঙ্কা নিয়েই অনু বললে: "কেন, বলুন ত!"

"আপনাদের দেখলে আমার হিংসে হয়—সত্যি—" অমিতা হাসতে লাগল।

"হিংসে হবার কি আছে—কলেজে পড়া এমন কি একটা সাংঘাতিক ব্যাপার?" অমিতার হাসিতে যোগ দিলে অনু।

"লেখাপড়া শেখার জন্যে বল্‌ছিনে—অবাধ চলাফেরা করতে পারেন বলেই হিংসে হয়।"

"সে কি কলেজে না পড়ে করা যায়না?"

"করা যায়—তার সঙ্গে অনেকখানি দুর্ণাম এসে ঘাড়ে চাপে!"

"দুর্ণামের আশঙ্কাত সবসময়ই আছে! আপনি কি মনে করেন সারাজীবন গীতাভাগবত নিয়ে থাকলেও আমাদের দুর্ণামের আশঙ্কা চলে যায়?"

অমিতা কিছু বললেনা—বিষণ্ণতায় গাঢ় হয়ে উঠল চোখ—ব্যথায় দুর্ব্বল হয়ে গেল ঠোঁটের রেখা—চুপকরে ও অনুর দিকে চেয়ে রইল।

কল্পনায় অমিতার একটা ব্যথার ইতিহাস আঁচ করে নিয়ে আবারও বললে অনু: "মেয়েদের মতো নয়, মানুষের মতো যদি বাঁচতে হয় তাহলে একটু সাহস দেখাতে হয় বৈ কি—অবশ্যি তাকে দুঃসাহসও বলতে পারেন!"

"সত্যি, আমরা তা দুঃসাহস মনে করেই ত ঘরের বাইরে পা

বাড়াইনে!" একটা ব্যথাকেই যেন ভাষা দিতে চাইল অমিতা।

"ঘরের বাইরে পা বাড়াতে পারলেই যে একটা মস্ত কাজ হয়ে গেল এ-কথা অবশ্যি আমি মনে করিনে—কিন্তু ঘরের বাইরে যাবার নিষেধাজ্ঞা আমাদের উপর জারী করা থাকবে এ অন্যায়কেও মানতে চাইনে। মনুষ্যত্বের অধিকার নিয়েই পুরুষের সঙ্গে বোঝাপড়া করতে চাই, অমানুষিকতা নিয়ে ওদেব সঙ্গে ভাগবাঁটোয়ারা নেই আমার!"

অমিতা ছোট্ট একটু হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে বললেঃ "তার মানে কি ওদের আপনি পুরোপুরি অমানুষিকতা ভোগ করতে দেবেন!"

"তাতে বা কি ক্ষতি? মানুষের সঙ্গে অমানুষের ত সম্বন্ধ নেই!"

"অমানুষ ত জবরদস্তি করতে পারে।"

"সত্যাগ্রহীর কাছে জবরদস্তির কোনো মানে নেই।"

"সত্যাগ্রহীর মতো শক্ত ক'জন হ'তে পারে?"

"লাখে লাখে হতে পারে কিন্তু একদিনে তা হয়না। আজ তার হার হলেও একদিন জিৎ হবেই।"

"হয়ত হবে।" অমিতা চুপ করে যায়। চুপ করে যায় বাইরে কিন্তু ভেতরের সমস্ত যন্ত্র যেন অনর্গল কথা বলতে স্বুরু করে দেয়। সত্যি হয়ত এমন একদিন আসবে যখন আজকের মতো অবহেলা, অপমান অসম্মান আর ভোগ করতে হবেনা মেয়েদের, হয়ত সে-দিনের চিহ্নও দেখা যায় এ-মেয়েটির মুখে—কিন্তু সে-দিন আসবার আগে যারা অপমান-অসম্মানকে অপমান-অসম্মান বলেই জেনে গেল, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবার শক্তি পেলনা, তাদের ব্যথাকে কি কেউ স্মরণ করবে সেদিন? স্মরণ করে যদি একটিও দীর্ঘনিশ্বাস পড়ে কারো, তবু যেন খানিকটা সান্ত্বনা আছে এ ধরণের বাঁচায়! সেই অনাগত সহানুভূতির স্বাদে সমস্ত শরীরে কেমন যেন একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে অমিতা, চারদিকের অন্ধকারটা সহনীয় মনে হয়। শুভদিনের উদ্দেশ্যে আজকের অন্ধকার থেকে প্রণাম পাঠাবার মতো

আদর্শবাদ নেই অমিতার—সেই শুভদিনের একটু স্নেহ পেলেই সে খুসী : খুসী হয়ে স্বীকার করে নেবে অন্ধকারকে। তার বেশি বুঝবার, জানবার বা পাবার শিক্ষা আর সাহস ত অমিতার নেই, যেমন এ-মেয়েটির আছে। কেন নেই সে-প্রশ্নই নিজেকে সে বার-বার করতে পারে, কিন্তু তার কোনো উত্তর মিলবেনা, প্রশ্ন প্রশ্নই থেকে যাবে।

"কি করে তোমরা এতো সাহস পাও, বলতে পারো আমায় ?" অমিতা নিজের মনে-মনেই যেন কথাটা বলে গেল।

"কতগুলো জিনিষকে সত্য বলে মনে করলেই সাহস পাওয়া যায়—আধো-আধো বিশ্বাস নয়, সত্য বলে দৃঢ় বিশ্বাস। মিথ্যায় অবিশ্বাস থাক্‌লেই শুধু চলেনা, মাসী—" অনু 'মাসী' কথাটা বলেই হেসে উঠ্‌ল।

"তোমার কাছে ভাই ও পরিচয়টা আমার না-থাকলেও চলে—" অমিতাও বিন্দু বিন্দু হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"কিন্তু তুমি ত তোমার নাম বলোনি—"

"তোমার নামও ত আমি জানিনে—আমি যদি একটা সম্বন্ধ পাতিয়ে নিতাম ?" হাসির মাত্রা বাড়িয়ে দিলে অমিতা।

"তা করবার আগে নামটাই বরং জেনে রাখো—অনুভা মিত্র—অনু—"

"অমিতা সেন-কে যা খুসী ডেকো শুধু মাসী নয়।"

"তোমার সঙ্গে আলাপ করে ভারি ভালো লাগ্‌ছে, মনে হচ্ছে আরো আগে কেন পরিচয় হলনা—আমি জিজ্ঞেস করব শমীনদাকে—"

অমিতা ঝরঝরে গলায় বল্‌লে : 'তা করো। কিন্তু চা খাবে ত এখন—উপরে চলো।"

"আজ নয় ভাই, আরেকদিন।" একটু নড়ে-চড়ে উঠ্‌ল অনু : "শমীনদার সঙ্গে দেখা হওয়া উচিত ছিল—"

"এলে আমি বল্‌ব। রাত্তিরেই যাবে নিশ্চয় তোমার সঙ্গে দেখা করতে—" ছেলেমানষি হাসিতে ভেঙে পড়ল অমিতা।

"কেন ?" অনু অপ্রস্তুত হয়েও সহজ গলায় জিজ্ঞেস করলে।

"তুমি আস্‌তে পারলে আর সে যাবেনা ?"

"যেতে বলো—" অনুর মনে হল এ অবস্থায় সহজ সরল হয়ে দাঁড়ানোই ভালো, সঙ্কোচ করতে গেলে অমিতার কৌতুকপ্রিয়তাকেই খুঁচিয়ে দেওয়া হবে।

"তা বল্‌ব—কিন্তু তোমাকে যেতে দিচ্ছিনে এক্ষুণি—" অনুকে দাঁড়াতে দেখে মাথা নেড়ে বল্‌লে অমিতা।

"আজ আমি যাই, ভাই—সত্যি জরুরী কাজ আছে—পাগ্‌লাটে দাদাকে কোনো রকমে ধরে এনেছি, আমি যে এতোক্ষণ বাড়িতে নেই—সে পালিয়েছে কিনা জানিনে! আরেকদিন আস্‌ব—নিশ্চয় আস্‌ব—" অনু ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল।

"আস্‌বে ত সত্যি ?" অনুনয়ে করুণ হয়ে উঠ্‌ল অমিতার মুখ।

"নিশ্চয় আস্‌ব।"

অনু গেট পার হয়ে চলে গেল—অমিতা চেয়ে রইল কতক্ষণ। তারপর ফিরে এসে দরজা বন্ধ করে উপরে উঠে গেল। অনুর চারদিকেই ঘুরে ফিরে চলেছে তার মন। এধরণের মেয়ে আছে জান্‌ত অমিতা—সঙ্কোচহীন অথচ দৃঢ়, প্রাণচঞ্চল হয়েও সংযত। প্রাণচাঞ্চল্যে যারা নিজেকে হারিয়ে ফেলে আধুনিকতার অপবাদ তাদের চরিত্র ঘিরেই গড়ে উঠেছে—তারাই অনেক আর তাই তাদের রং দিয়েই আধুনিকতার রং-কে চিন্‌তে চায় সবাই। একটি বা দু'টি অনু কারো চোখে পড়েনা তাই অপবাদহীন আধুনিকতার ঠাঁই নেই কারো মনে!

অনুকে দেখ্‌তে পেয়ে অনেকটা আকাশ দেখ্‌তে পেয়েছে অমিতা—যেন অনেকখানি স্নিগ্ধ আলো এসে চোখেমুখে ঝাঁপিয়ে পড়ল। আলোর তৃষ্ণা জাগানো আলো এ নয়—মরীচিকার মত

দূর থেকে হাতছানি নয়—এ আলো ভালোবেসে লুটিয়ে পড়ে চোখের উপর, চোখে আলো জাগায়।

বিছানায় গা এলিয়ে দিয়ে অমিতা ব্লাউজের ভেতর থেকে সন্তর্পণে রঞ্জনের চিঠিটা তুলে আন্‌ল। ঠাকুর বা ঝি কেউ এঘরে চুপি দিতে আস্‌বে না—তবু যেন সবাইকে লুকিয়ে চিঠির একটা ছত্রের উপর বারবার চোখ বুলিয়ে চল্‌ল সে: 'ওর চা-খাওয়ানোটা মনে পড়ে।' তারপর চোখ বুঁজে মনে-মনে উচ্চারণ করতে লাগ্‌ল: "মনে পড়ে—মনে পড়ে।"

বাড়ি ফিরে অনু দেখ্‌তে পেল সুদাসবাবু বসে বসে মার সঙ্গে গল্প করছেন—আর কেউ ঘরে নেই। ব্যস্ত হয়ে জিজ্ঞেস করল সে: "বড়দা কোথায়?" উত্তরে কিছু বলবার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছিল সুদাস—মা জোর করে একটা হাই তুলে বল্‌লেন: "হঠাৎ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল কিছু না বলে, ভাবলুম ফিরে আস্‌বে—"

"ছোড়দা ছিলনা?" অনুর মুখ শক্ত হয়ে এলো।

"আমাকে ডেকে আন্‌তে গিয়েছিল সুবীর—ওটা উচিত হয়নি, প্রবীরকে একা রেখে যাওয়া উচিত হয়নি—" সুদাস ঘটনাটার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে নিজের উপস্থিতির কৈফিয়ৎটাও উপস্থিত করল।

"একা আর কি? আমি ত ছিলুম--" মার মুখের রূপান্তর নেই: "বললুম, উপরে চল্—উনি দেখা করতে চান। চুপ করে থেকে হঠাৎ বেরিয়ে গেল।" ঠোঁট ভাঙতে চাইলেন মা কিন্তু রেখাগুলো স্পষ্ট হলনা।

"তোমার কথায়ই হয়ত বেরিয়ে গেল।" একটু দূরে একটা ইজি-চেয়ারে বসে চেয়ারের পিঠে মাথাটা এলিয়ে দিল অনু।

"আমি কি অপরাধ করলুম!" চোখ দুটো একটু বড় করে অসহায়ভাবে তাকালেন মা।

"এ কথার উপর চলে যাওয়ার মানে এখনও প্রবীরের চঞ্চলতা যায়নি!"—সুদাস নত চোখে নিবেদন করতে সুরু করলে: "আমার ওখান থেকেও ঠিক ওম্নি চলে গেল ও—"

"ছোড়দা কোথায় গেছে মা?" খানিকটা ঠাণ্ডা শোনাল অনুর গলা।

"ওর খোঁজেই বেরুল আবার!" গালের পানটা আবার আস্তে আস্তে চিবুতে সুরু করলেন মা।

"ফিরে আস্‌বে প্রবীর—আজ না হয় দুদিন বাদে ফিরে আস্‌বেই। আমাদের অনর্থক ব্যস্ত হয়ে ত লাভ নেই, ওর অস্থির মনও ত শান্ত হওয়া চাই।" সুদাস মা আর অনুর মাঝামাঝি চোখ চালিয়ে নিয়ে বল্‌লে।

"তোমায় ত বল্‌লুম সুদাস—" মা চেয়ারটা ছেড়ে দাঁড়ালেন: "ছেলেমেয়েদের ইচ্ছের উপর কোনদিন কোনো কথা আমরা বল্‌তে যাইনি। আমরা ত আশা করতে পারি ছেলেমেয়েরা আমাদের মনে কষ্ট দেবেনা!"

"নিশ্চয়ই আশা করতে পারেন।" বিনীত গলায় বল্‌লে সুদাস।

"তবে?" চোখে একটা করুণ মিনতি ফুটিয়ে তুলে মা চলে গেলেন।

ফলে যে একটা বিষণ্ণ আবহাওয়া তৈরী হল তা ভুলে গিয়ে কি করে অনুর উজ্জ্বল সান্নিধ্য অনুভব করা যায় সে-কথাই ভাবছিল সুদাস। সুবীরের ডাকে এখানে আসতে সে দ্বিরুক্তি করেনি—যুক্তিতর্কে প্রবীরকে বশ করবার প্রেরণা তার নেই, সবটুকু মোহই ছিল অনুর তৈরী আবহাওয়াটুকুর জন্যে। ঘরে ঢুকেই নিরাশ হয়েছিল সুদাস—অনু নেই, মা বসে বসে পান চিবুচ্ছেন। কিন্তু এখন সেই আবহাওয়া। সেই আবহাওয়ার চেয়েও গাঢ় গভীর এ ক'টা মুহূর্ত্ত—সে আর অনু একা বসে আছে! কিন্তু আশ্চর্য্য,

কোনো কথা খুঁজে পাচ্ছেনা তার মন—একটির পর একটি করে কথা যাচাই করে চলেছে—বাছাই করা যাচ্ছেনা কিছু।

"মা মনে করেন ওঁর মনে কষ্ট দেবার ষড়যন্ত্রই করছি আমরা সবাই মিলে—" সুদাসের দিকে তাকিয়ে হাস্‌তে লাগ্‌ল অম্বু।

হঠাৎ খানিকটা আলো পেয়ে প্রদীপ্ত হয়ে উঠল সুদাসের মুখ: "তোমরা সবাই পলিটিক্স করে বেড়াচ্ছ—ওঁরা কি করবেন বলো!"

"পলিটিক্সে ত ওঁদের আপত্তি নেই!"

"পলিটিক্যাল জীবদের জীবন গৃহস্থ বাপ-মা কি সহ্য করতে পারেন? ঘরের আইন কি ধরে রাখতে পারে তোমাদের?"

"আমাকে ওর মধ্যে টানবেন না—দাদাদের বলতে পারেন বরং ঘরের আইন ওদের জন্যে নয়—" গম্ভীর হয়েও অম্বু ভদ্রতার একটু হাসি মুখে মাখিয়ে রাখল।

"পরিবারে ত তোমাদের প্রায় চীনা পদ্ধতি চলেছে—মুসলমান, খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ না হয়ে ভাই বোনেরা মিলে কম্যুনিষ্ট, ফরোয়ার্ড ব্লক আর কংগ্রেস হয়ে উঠেছ!"

"কংগ্রেসের কাজ ত আমি করিনে—গান্ধীজিকে শ্রদ্ধা করি—সব ছেলেমেয়েরই তা করা উচিত!"

"তা অবশ্যি জানিনে—" সুদাস বিদ্রূপের একটা অস্পষ্ট হাসিতে মুখটা ধারাল করে তুলল: "চরকা, গোসেবা, হরিজন আর আবেদন নিবেদন নিয়েই গান্ধীজি এ-যুদ্ধের সময়টা কাটিয়ে দেবেন মনে হয়—কিন্তু ভারতবর্ষের অনেক ছেলেমেয়ে হয়ত মনে করে তার বাইরে দৃষ্টি দেবার সময় এসেছে!"

"গান্ধীজিও তার বাইরে দৃষ্টি দিয়েছেন—ইণ্ডিভিজ্যুয়্যাল সত্যাগ্রহ কি তা-ই নয়?"

"ওটা শান্তিবাদীর সামান্য উদ্বেগের চিহ্ন!"

"তবু ভালো—" ঝর্ণার মতো হেসে উঠল অম্বু: "কম্যুনিষ্টদের

মতো বলেন নি যে গান্ধীজির ও-সত্যাগ্রহ তাদের সহযোগিতা এড়িয়ে যাবারই ফন্দী !"

"তা আমি বলিনে—তার কারণ আমি কম্যুনিষ্ট নই।" সুদাস জানে যে অনুর কাছে শ্রদ্ধা পেতে হলে আর যা-ই বলা যাক নিজেকে কম্যুনিষ্ট বলে ঘোষণা করা চলেনা।

"হয়ত আপনি ফরোয়ার্ড ব্লকের অ্যাটিচ্যুডে বিশ্বাসী—"

"ফরোয়ার্ড ব্লকের অ্যাটিচ্যুড্ একটা থাকতে পারে কিন্তু কোনো প্রোগ্রাম তাদের আছে কি ?—অস্থিরতা একটা কংক্রীট বা পজিটিভ প্রোগ্রাম নয় !"

"তা না হলে আপনি ত কংগ্রেসীও নন—"

"নই।" জোর দিয়েই বলল সুদাস তারপর একটু স্নিগ্ধ হাসিতে নিজেকেই যেন সংশোধন করে নিলঃ "কংগ্রেসের কার্য্যকলাপ ভালো করে বুঝতে পারলে একদিন হয়ত কংগ্রেসী হ'ব—নেতিবাদ নিজের কাছেই আর ভালো লাগেনা—হয়ত সেদিন তোমার কথাগুলো সত্য বলে মেনে নিতে হবে !"

"আমার কোন্ কথা ?" অবাক হয়ে তাকাল অনু সুদাসের দিকে।

"গান্ধীজিকে যে সব ছেলেমেয়ের শ্রদ্ধা করা উচিত !"

"ও", অনু একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললে মনে হল ঃ "কিন্তু আপনি যে-ধরণের সমালোচক তাতে ত কম্যুনিষ্ট হওয়াই আপনার পক্ষে স্বাভাবিক !"

"তার উল্টো কথাটা কি দাঁড়ায় জানো ?—তোমরা গান্ধীবাদীরা বুদ্ধিবিচারের ধার ধার না !"

"বুদ্ধিবিচার পৃথিবীতে যতোগুলো কাজ করেছে আবেগময় শ্রদ্ধা কি তার চেয়ে কম কাজ করেছে মনে করেন ?"

"তা মনে করিনে। মনে করি, আবেগের যুগ অতীত হয়েছে।"

"তাহলে মানুষের যুগ অতীত হয়েছে বলেও মনে করতে পারেন আপনি!"

"তাও মনে করতে ইচ্ছা হয়। এখনও কি অতি-মানুষের যুগ আসবেনা?"

"অমানুষের যুগ আগে পার হয়ে নিক্!" অনুর গলায় বিদ্রূপের আভাস ফুটে উঠল।

একটু অপ্রস্তুত হল সুদাস। এবং অপ্রস্তুত হতে হল বলে অনুর উপর খানিকটা কঠিন হয়ে উঠল তার মন। খাটো হয়ে পড়বার ভয় তার সবচেয়ে বেশি—সে ভয়ের কাছে স্নেহ বা ভালোবাসারও কোনো দাম নেই। সে-ভয় থেকে ভালোবাসাকেও সে অনায়াসে আঘাত করতে পারে। হয়ত শ্যামলীকেও সে ভুলে যেতে পারে যদি কোনো কারণে মনে হয় যে শ্যামলীর কাছে সে খাটো হয়ে পড়েছে। শ্যামলী কাছে থাকলে হয়ত এ-অনুভূতিটা স্পষ্ট হয়ে মনের উপর ভেসে ওঠেনা—শ্যামলী এখন দূরে আছে বলেই মনের রংটা সুদাস নিরপেক্ষভাবে দেখতে পায়। মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ তার হয়ত কারো চেয়ে কম নয়—হয়ত অস্বাভাবিক-ভাবে বেশিই—হয়ত মনে-মনে অনুভবও করতে পারে সুদাস যে মেয়ের স্পর্শ ছাড়া জীবন তার নিঃসাড়, পঙ্গু হয়ে পড়বে কিন্তু তবু এই অতি প্রয়োজনীয় জীবটিকে সে জীবনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়না, চায়না যে তারা তার বুদ্ধিবিবেচনার উপরে বিচরণ করুক। অনুর প্রতি সে উৎসুক হ'তে পারে—মেয়েদের ভালো লাগে বলেই তার এই ঔৎসুক্য কিন্তু তা বলে অনুর কাছে নিজেকে বিলিয়ে দিতে পারেনা সুদাস। পাহাড়ের মতো ঊর্দ্ধে উঠে আসবার ইঙ্গিতই সে দেয়, পাহাড়ের মতো অটলই তার ঊর্দ্ধাশ্রয়ী সত্তা—সমতলের ইঙ্গিতে নিচে নেমে যেতে পারেনা সে। আমার আশ্রয়ে এসো—পাবে সেখানে আলোছায়া-মেঘরৌদ্রের বিচিত্র আরাম, পাবে অফুরন্ত হাওয়া, অজস্র রূপরসগন্ধস্পর্শ—

কৃপণতা নেই আমার, তোমার বুদ্ধি, তোমার মন, তোমার আবেগ, তোমার হৃদয় আকণ্ঠ ডুবে থাকতে পারবে আমার বিচিত্রতার সমুদ্রে—কিছুরই অভাব থাকবেনা তোমার কিন্তু এখানে আসবার বিনীত মন থাকা চাই—স্পর্দ্ধাকে আশ্রয় করে নয়, শ্রদ্ধাকে আশ্রয় করে এসো। শ্যামলীকে পেয়েছে সুদাস ঠিক তেম্নি করে, তাই নিজেকে ভুলে যাবার অবকাশ পেয়েছে সে, নিজের উচ্চতাকে ভুলে গেছে, ভুলে গেছে খাটো হয়ে পড়বার ভয়কেও। কিন্তু অম্বু আলাদা, তার আকাশ আর আবেষ্টনী আলাদা—পাহাড়ের পরিবেশে তাকে মনে হয় স্পর্দ্ধিত, উদ্ধত—হয়ত আছে এমন পরিবেশ যেখানে এই উদ্ধত অম্বু শ্রদ্ধাবনত হয়ে থাকে কিন্তু তাব খবর সুদাসের জানা নেই—জানতেও চায়না। শমীন যদি সে-পরিবেশ তৈরী করে থাকে ততটুকু মধ্যবিত্ততায় সুদাস নেমে যেতে পারেনা।

"আপনার চা খাওয়া হয়েছে, সুদাসদা?" হঠাৎ খেয়াল হল অম্বুর যে অনেকক্ষণ ধরে চুপচাপ বসে আছে সুদাস।

"দরকার নেই।" সুদাস অন্যমনস্কই রয়ে গেল।

"তার মানে?—চা আনব এ কথা ত আমি বলছিনে, চা খাওয়া হয়েছে কিনা জিজ্ঞেস করছি!" অম্বু হাসতে লাগল।

"খাওয়া না হলেও দরকার নেই—এ কথাই আমি বল্‌ছি!"

"দরকারটা আমায় বুঝতে দিন। আপনার বাড়িতেও সেদিন আমার চা খাওয়ার দরকারটা আপনি বুঝেছিলেন।" অম্বু উঠে দাঁড়াল।

"সত্যি—এখন আর চা এনোনা—" সুদাসের গলায় প্রশান্ত ভাব। একটি সুন্দর দৃশ্য স্মরণ করে মন তার ভরে উঠেছে।

"না, না—চা আনবেনা কি—বেশ ভালো দু'কাপ চা চাই—" প্রায় যাত্রাগানের নারদের মতো আকস্মিক আবির্ভাব হ'ল শমীনের। "বিকেলে চা খাওয়া হয়নি আজ—মাথাটা টিপ-টিপ করছে!"

হাসির উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে দিয়ে অনু চলে গেল। সুদাস ভাবতে সুরু করলে যে ধরণের অদৃশ্য শক্তিকে সে অবিশ্বাস করে তা সত্যি অবিশ্বাস্য কি না! তেমন একটা কিছু যদি না-ই থাকে তাহলে অনুর সাহচর্য্য-উপভোগে বারবার শমীনই এসে বাধা জন্মাবে কেন?—শমীনের সঙ্গে অনুর ঘনিষ্ঠতা আছে বলেই কি বারবার তাকেই আসতে হচ্ছে? হাস্যকর হলেও সুদাস এ কথাগুলোই ভেবে চলল—এবং শেষটায় কথাগুলোর হাস্যকরতা উপলব্ধি করে নিজেই হেসে উঠল।

"সত্যি, বিকেলে চা খাওয়া হয়নি—" সুদাসের অহেতুক হাসির উত্তরে বল্‌লে শমীন।

"তা'বলে নাটকীয় ধরণে মুখে কথা নিয়ে প্রবেশ করবি?" শমীনের আবির্ভাবটাকেই স্মরণ করে এবার হাস্‌তে লাগ্‌ল সুদাস।

"বাড়ি ফিরে আর জিরোইনি—সটান এখানে। প্রবেশটা নাটকীয় হওয়াই স্বাভাবিক।"

মিহি ধারাল হাসিতে সুদাস একটা ধারাল কথা ছুঁড়ে দিলে: "কি করে জানিস আমি এখানে আছি?"

"বাঃ, তা বুঝি—যাঃ—ধেৎ—" শমীন কথার ধারটা ক্রমে-ক্রমে হৃদয়ঙ্গম করে ধমক দিতে লাগ্‌ল।

সুদাস হাসিমুখে একটা সিগারেট বার করে নিয়ে আবার কি ভেবে যেন সিগারেটটা গুঁজে রেখে তাকিয়ে রইল শমীনের মুখের দিকে।

"প্রবীর কোথায় রে?" শমীন জিজ্ঞেস করল।

"জানিনে। আমার সঙ্গে দেখা হয়নি!"

"প্রবীর বাড়ি আসেনি?"

"শুনেছি সুবীর ধরে এনেছিল—"

"তার মানে পালিয়েছে আবার?"

"পালিয়েইছে তার কি মানে আছে—বেড়াতেও যেতে পারে।"

"কখন এসেছিস্ তুই?"

"যখন সুবীর ধরে নিয়ে এলো।"

"বাড়ি থাক্‌লে আমি হয়ত ঠিক সময়ে আস্‌তে পারতুম—অনুর সঙ্গে দেখা হলেও ঠিক এসে ধরা যেত প্রবীরকে।"

"অনু ফিরে এসে প্রবীরকে পায়নি।"

"প্রবীর খানিকটা বাড়াবাড়ি করছে—বাড়ি ফিরে এলে ওর কম্যুনিজ্‌মের গায়ে এমন কিছু কলঙ্ক পড়েনা।"

"কিন্তু তোর কি তাতে খুব সুবিধে হয়—" সুদাস সিলিং-এর দিকে তাকিয়ে রইল।

"আমার কি অসুবিধে?" হাস্‌তে লাগ্‌ল শমীন।

"ও, আর বুঝি ভয় নেই?" হাল্কা রসিকতায় সুদাস হেসে উঠ্‌ল। কিন্তু হাসির আওয়াজটা কানে যেতেই মনে হ'ল তার তাতে যেন অনাবিল রসিকতা ছাড়া আরো কিছু শোনা গেল—বিশুদ্ধ বাংলায় যাকে গাত্রদাহ বলে তারই খানিকটা আভাস যেন ফুটে উঠেছে সে-আওয়াজে। নিজেকে মনে-মনে শাসন করতে ইচ্ছা হল সুদাসের। খুবই অন্যায় হচ্ছে। নিজেকে শমীনের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে তুলে ধরবার কোনো মানে নেই। এ শুধু বন্ধুত্বের অপমান নয় শালীনতারও অপমান। আর যা-ই করুক সুদাস ভদ্র মনকে কলুষিত করতে পারেনা!

"ভয় ত আমার কোনোদিনই ছিলনা—" ভালোছেলের মতো মুখ করে তাকাল শমীন।

"তাই নাকি? ভালো।" সুদাস অন্যমনস্ক হতে চাইল।

"সমস্ত পরিবারের উপর রাগ করলেও ওর উপর অবিচার করা যায় না—" থেমে অদ্ভুত ধরণে কথাগুলো বল্‌ল শমীন।

"বেশ, বেশ—" চেয়ারের উপর নড়েচড়ে সোজা হয়ে বস্‌ল সুদাস: "তারপর তোদের পলিটিক্সের খবর কি?"

"স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি পেলে আমরা ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধরব।"

"অস্ত্র ধরব! আমরা মানে তুই আর আমি নিশ্চয়ই নই—গুর্খা, পাঠান, শিখ, রাজপুত, জাঠ, ডোগ্‌রা এরাই!—এরা ত স্বাধীনতাহীনতায়ই অস্ত্র ধরেছে!"

"আমরা মানে কংগ্রেস।"

"ভাগ্যিস্ চার আনারও মেম্বর নই—এ ব্যাপারে আমি গান্ধীজি আর রবীন্দ্রনাথের শিষ্য!"

"তাতে কি? কন্‌স্‌ক্রিপশ্যন হবে।" হাস্‌তে লাগ্‌ল শমীন।

"লোটা কম্বল নিয়ে সটান মহাপ্রস্থানের পথে রওনা হব।"

"সুভাষবাবুর মতো?"

"বিশুদ্ধ সন্ন্যাসীর মতো।"

"সুভাষবাবু তাহলে বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী হননি বল্‌তে চাস!"

"নিজের কথাটাই বল্‌তে চাই যে বিশুদ্ধ সন্ন্যাসী হ'ব—নেহাৎ তা অসম্ভব ঠেক্‌লে গান্ধীজির শরণ নেব—তোদের এই হিংস্র-প্রোগ্রামে গান্ধীজি ত নেই!"

"গান্ধীজি ত কংগ্রেস নন—কাজেই নেই।"

"কিন্তু হঠাৎ তোদের এ ডিগবাজি কেন? তোদের জিজ্ঞেস না করে যুদ্ধ ঘোষণা করা হ'ল বলে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে সত্যাগ্রহী হলি—আজ আবার যুদ্ধের বাদ্যে নেচে উঠ্‌লি কেন?"

"১৯৪০ আর ১৯৪১ একরকম সময় নয়—একদিকে হিটলার, একদিকে জাপান—চুপ করে বসে থাক্‌বার সময় নেই আর।"

"গান্ধীজি ত চুপ করে আছেন!"

"বল্‌লুম ত গান্ধীজি কংগ্রেস নন।"

"কিন্তু গান্ধীজি কন্‌সিস্ট্যান্ট্।"

"আমরা তা অস্বীকার করিনে।"

"সুবিধে মতো তোরা গান্ধীজিকে স্বীকার করিস কি না—"

"গান্ধীজি তাতে ক্ষুণ্ণ হননা।"

"তাই রক্ষা।" সুদাস হাস্‌তে লাগ্‌ল: "গান্ধীজির সঙ্গে

কংগ্রেসের বিরোধ হলে তোর পক্ষে মুস্কিলই হ'ত!" কথাটা বলেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল সুদাস। আবার সেই হাল্কা রসিকতায় চল্‌তে সুরু করেছে তার কথা—কিন্তু ভেবে দেখে আশ্বস্ত হল সুদাস গলার স্বরে এবার আর তার শ্লেষ ছিলনা, নির্দ্দোষ কৌতুক শুধু।

"তাহলে কংগ্রেসের সঙ্গে আমারও বিরোধ হ'ত—" সহজ স্বীকারোক্তি করল শমীন।

"খুসী হলুম।"

"কিন্তু আমি ত খুসী হতে পারছিনে—দেখেছিস্ কি ভীষণ দেরি হচ্ছে চা আস্‌তে!"

"তুই বরং চা খেয়ে যাস—আমি চলি—"

"সে কি? অসম্ভব—তাহলে আমিও চলে যাব!"

"তার কি মানে আছে? আমি ত বলেই দিয়েছি অনুকে চা খাবোনা।"

"কিন্তু যাবার কথা ত বলিস্‌নি!"

"না বল্‌লে কি ক্ষতি?"

শমীন চুপ করে গিয়ে তাকাল সুদাসের মুখের দিকে। বিষণ্ণ করুণ চোখ। সুদাস লক্ষ্য করল। অনুর চোখেই এ ধরণের বিষণ্ণতা দেখবে আশা করে এসেছিল সুদাস। দেখ্‌তে পেল শমীনের চোখে। কিন্তু তাতে হতাশায় ফাঁকা হয়ে উঠ্‌লনা তার মন। বরং ভরে উঠ্‌ল বুক: শমীনের বিষণ্ণতা অনুভব করেই হয়ত, হয়ত নিজেকে জয় করবারই আনন্দে।

সমস্ত পৃথিবীকে ভালোবাস্‌তে বাস্‌তে বাড়ি ফিরে এলো শমীন। মেঘের মতো হাল্কা হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে তার মন, বর্ষণ করতে লেগেছে করুণার ধারা। অনু তার বাড়িতে এসেছিল আজ— ছোট্ট এই ঘটনাটি খুসীতে তার মন তোলপাড় করে দিচ্ছে—যেন

এতেই তার অন্নুকে পাওয়া হয়ে গেছে—বাহুর নিবিড় উষ্ণ বন্ধনে যেন অনুভব করছে অন্নুর শরীর। মৌখিক প্রতিশ্রুতির পরও শারীরিক ব্যবধানে মন যে আশঙ্কার কুয়াসা আবিষ্কার করে নেয় অন্নুর এই আসা তা যেন ধুয়ে-মুছে পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে। তাদের সম্বন্ধের মধ্যে আর অন্ধকারের গোপনতা নেই—সবটুকুই এখন রৌদ্রোজ্জ্বল, পরিদৃশ্যমান। অন্নুর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়ে ওঠে শমীন। আড়ালের পর্দ্দা নিজের হাতে ছিঁড়ে বেরিয়ে যদি না আস্ত অন্নু, শমীনের শক্তি ছিলনা সে-আড়ালকে আঘাত করে। এখন মনে হয় অপরিসীম শক্তিতে ভরে উঠেছে শমীনের বুক। সে-শক্তির কাছে অসাধ্য বলে কিছু নেই। এমন কি সৈন্য-সংগ্রহের তালিকায় নাম লিখিয়ে আস্তে পারে অনায়াসে—কংগ্রেস যদি সত্যি-সত্যি সৈন্য-সংগ্রহের আদেশ দেয়। কিন্তু সবচেয়ে জরুরী কাজ তার প্রবীরকে ফিরিয়ে আনা—যে করেই হোক প্রবীরকে বাড়ি নিয়ে আস্তে হবে—ততটুকু শিভালরি-তেই অন্নু খুসী, যুদ্ধে যাবার দরকার নেই। প্রবীরের বাড়ি আসা উচিত—আর কারুর জন্যে না হোক অন্নুর জন্যেই ফিরে আসা উচিত। প্রবীরকে সবটুকু যদি বুঝে থাকে কেউ তবে সে একমাত্র অন্নু।

প্রবীরকে ভাবতে ভাবতে ঘরে এসে ঢুক্‌ল শমীন। ঘরে ঢুকেই মনে পড়ল রঞ্জনের চিঠির কথা। প্রবীরের খবরই জান্‌তে চেয়েছে রঞ্জন—ওর চিঠি এসে পড়ে আছে দুদিন, জবাব দেওয়া হয়নি।

শমীন গা থেকে পাঞ্জাবীটা খুলে চেয়ারের পিঠে ঝুলিয়ে রাখল—তারপর দরজা জানালা খুলে দিয়ে চেয়ারে এসে বস্‌ল। চিঠির জবাবটা এক্ষুণি লিখে ফেল্‌বে। দু'দিন ফেলে রেখেছে চিঠিটা—অন্যায়, খুবই অন্যায়। শমীন চিঠি খুঁজতে সুরু করল—কোথাও নেই। ড্রয়ারে বক্সফাইলে নেই—কাচের নীচেও দেখা যাচ্ছেনা। তার মানে? নিশ্চয়ই কোথাও ছিল—নিশ্চয়ই ফেলে দেয়নি সে

রঞ্জনের চিঠি! কোথাও থাক্‌বেনা এমন হতে পারে না। কাগজপত্র উলোটপালট করতে সুরু করলে শমীন। কিন্তু সত্যি চিঠিটা নেই। রঞ্জনের ঠিকানা ছিল তাতে—নইলে হয়ত তার দরকার ছিলনা। প্রবীর আর সুপ্রভার কথা জান্‌তে চেয়েছিল রঞ্জন—সুপ্রভার উপর সামান্য একটু দুর্ব্বলতা ছিল তার—ওর মৃত্যুর খবরে রঞ্জনের ভবঘুরেপণা হয়ত বেড়ে যাবে আরেকটু। মনের দুর্ব্বলতা এতো গোপন রাখতে চায় রঞ্জন যার ফলে স্নায়ুগুলো তার সব সময়ই চঞ্চল—কোথাও স্থির হয়ে বসতে পারে না। সুপ্রভার মৃত্যুর খবরে সংবাদদাতার কাজ নিয়ে মিড্‌ল-ইষ্টেও দৌড়ুতে পারে সে। কিন্তু চিঠিটা কোথায় গেল?

হঠাৎ শমীন বিরক্তির স্বরেই ডাক্‌তে সুরু করল: "মাসী—মাসী—"

অমিতার কথা ছিল চিঠিটাতে। আশ্চর্য্য, একদিনের কয়েক মিনিটের আলাপে অমিতার উপরও দুর্ব্বল হয়ে উঠেছিল রঞ্জন! অদ্ভুত মানুষ সে—দুর্ব্বলতা প্রকাশ করতে চায়না কিন্তু বেমালুম গোপন করবারও শক্তি নেই—আচার আচরণে কথায় বার্ত্তায় তার আভাস ফুটে উঠ্‌বেই।

অমিতার চোখে পড়েছিল কি চিঠিটা? শমীনের উকিল-বুদ্ধি সম্ভাবনার অলিগলি খুঁজতে লেগে গেল।

কিন্তু অমিতাকে দরজায় দেখ্‌তে পেয়ে শমীন হঠাৎ কোনো কথা খুঁজে পেলনা। সঙ্কুচিত হয়ে আপন মনেই বলতে লাগ্‌ল: "একটা চিঠি খুঁজে পাচ্ছিনে—"

"খামের একটা চিঠি ত?" অমিতার যেন একটা ভুল মনে পড়ল: "অনুর সঙ্গে কথা বল্‌তে বল্‌তে টেবিল থেকে হাতে তুলে নিয়েছিলাম—ভুলে উপরে নিয়ে গেছি—এক্ষুণি এনে দিচ্ছি—"

"টেবিলের উপরই ছিল, না? অথচ আমি আনাচেকানাচে খুঁজতে বাকি রাখিনি!" শমীন অসহায়ের মতো তাকাল:

"আমাদের বন্ধু রঞ্জনের চিঠি—তুমি একদিন যাকে চা খাইয়েছিলে, সেই রঞ্জন !"

"তাই না কি ?" অত্যন্ত নিস্পৃহ গলায় বলতে চেষ্টা করল অমিতা কিন্তু শমীনের মতোই দুর্ব্বল শোনাল তারও গলা। তা শোনাক। শমীন জানুক চিঠিটা সে পড়েছে। অমিতা তা-ই চায়।

চিঠি আনতে চলে গেল অমিতা।

অমিতার কাছে যে চিঠিটা পাওয়া গেল সে কথা ভাবছিলনা শমীন, ভাবছিল চিঠিটা নেবার স্বীকারোক্তির কথাই। কি করে জানতে পারল অমিতা, তার সম্বন্ধে কয়েকটা কথা আছে চিঠিতে ? রঞ্জনের সঙ্গে তেমন কিছু কথা ছিল কি তার ? শমীনের চিঠিতে অমিতার কথা লেখার মানে কি এই যে রঞ্জনের সঙ্গে অমিতার সম্বন্ধ কি তা শমীন জেনে নিক ! হতে পারে। অমিতার সঙ্গে রঞ্জনের একটা সম্বন্ধ তৈরী হয়ে যাওয়া অস্বাভাবিক নয়। বরং এ স্বাভাবিক সম্বন্ধটাকে শমীনই সহজভাবে নিতে পারেনি। অমিতাকে জানায় নি সে রঞ্জনের চিঠির কথা। একটা সঙ্কীর্ণতা থেকে শমীন মনকে মুক্ত করতে পারেনি—অথচ একদিন প্রবীরের চরিত্রে এ ধরণের সঙ্কীর্ণতা দেখেই ক্ষেপে উঠেছিল সে ! অমিতা মাসী কি এখন বলতে পারে না তাকে : "অন্যের দেওয়া ধন্যবাদটা জানাতে দোষ কি ?" বলতে পারে। বলা উচিত। মাসীর পাওনা ব্যবহার দূরে থাক মানুষের পাওনা ব্যবহারও কোনোদিন অমিতা শমীনের কাছে পায়নি। কি তার অপরাধ ? অসহায় বলেই সে তাদের পরিবারে আশ্রয় নিয়েছে। তার সেই নিরাশ্রয়তার সুযোগ নিতে চাচ্ছেন বাবা। তার জন্যে অমিতা মাসীর উপর বিরূপ হবার কি কারণ শমীনের থাকতে পারে ! নিজেরই লজ্জাকর মানসিকতাকে শমীন আজ প্রথম তিরস্কার করতে সুরু করল। অমিতার কাছে ক্ষমা চাওয়াটা অত্যন্ত নাটকীয় দেখাবে বলেই হয়ত ক্ষমা সে চাইতে পারবেনা কিন্তু মন তার অপরাধী হয়ে রইল অমিতার কাছে।

চিঠিটা টেবিলের উপর রেখে অমিতা চলে যাচ্ছিল। শমীন জড়তা ভেঙে বললে: "চারদিকে তোমার প্রশংসা শোনা যাচ্ছে, মাসী—"

"কেন? কি অপরাধ করলুম?" বিষণ্ণ চোখে তাকাল অমিতা।

একটু সময় নিয়ে বললে শমীন: "অন্নু বলছিল—অন্নু খুব প্রশংসা করছিল তোমার।"

১৯৪২

এক

জনশূন্য হয়ে চলছিল কলকাতা। এতোদিন ব্ল্যাক-আউট-টা ভয়ঙ্কর মনে হতনা—এখন সত্যি ভয়ঙ্কর মনে হয়। এই কালো রাত্রির গোপনতায় সত্যি কোথায় কি যেন একটা ষড়যন্ত্র চলছে—একসময় এসে তা ঝাঁপিয়ে পড়বে অসহায় কলকাতার উপর। বেজে উঠবে সাইরেনের একটা অশুভ তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদ—সেই যান্ত্রিক আর্ত্তনাদ হাজার হাজার রক্তমাংসের আর্ত্তনাদের সঙ্গে মিশে ভরিয়ে তুলবে কলকাতার আকাশ। হাওড়া আর শিয়ালদহর পথে বিশাল জনস্রোত প্রতিমুহূর্ত্তে বেরিয়ে যাচ্ছে—তবু হাজার হাজার মানুষ আতঙ্ক আর আশঙ্কা নিয়ে থেকে যাচ্ছে এই জনশূন্য আবহাওয়ায়। রত্নাও ভেবেছিল চলে যাবে তার দাদার কাছে শিলিগুড়িতে—যাবার জন্যে চিঠিও দিয়েছিলেন দাদা। স্কুল উঠে গেছে—উত্তর বাংলার কোনো সহরে নিয়ে স্কুলটাকে তৈরী করা যায় কিনা গোড়ায় এ ধরণের কথা ভাবছিলেন কর্ত্তৃপক্ষ। এখন ভাবছেন, কলকাতাই যদি যায় বাংলার কোথায় কি আর রইল—তাদিয়ে কি হবে। অনায়াসে চলে যেতে পারত রত্না শিলিগুড়িতে—নির্ভাবনায় থাকতে পারত ওখানে—জাপানী বোমারু বিমানের লক্ষ্য থেকে অনেকদূর শিলিগুড়ি। কিন্তু মহীতোষ বাধা দিলে। কলকাতায় এখনও ঢের লোক দেখতে পাচ্ছে মহীতোষ—সমুদ্রে খাল কেটে দিলে কতোটুকু আর জল বেরোয়, বলেছিল সে। বলেছিল: 'দোহাই তোমার বাংলার গৃহলক্ষ্মীদের মতো নন্‌-এসেন্সিয়্যাল সেজে কলকাতা ছেড়ে পালিওনা। সোভিয়েট রাশ্যার মেয়েরা কি করে যুদ্ধ করছে সে খবর না-ই-বা শুনলে—'রাশিয়ার চিঠি'তে সোভিয়েট মেয়েদের যতটুকু সাহসের কথা লেখা আছে অন্তত ততটুকু সাহস আয়ত্ত কর!'

রত্না লজ্জা পেয়ে বলেছিল : 'চাকরি নেই, আমায় খাওয়াবে কে ?' মহীতোষ সশব্দে হেসে আরো লজ্জিত করে তুলেছিল রত্নাকে।

রত্না থেকেই গেল। সিঙ্গাপুর থেকে রেঙ্গুনে এগিয়ে এলো জাপানীরা—তারপর উত্তর বর্ম্মার পাহাড় ভেঙে চলল যুদ্ধের অজগর বাংলার পূব সীমান্তের গা ঘেঁষে। তখনও থাকতে হল রত্নাকে।

'ফার্ষ্ট এয়ার-রেডের পর না-হয় চলে যেও।' মহীতোষ তখন বলেছিল রত্নাকে।

'কেন ?' সাহসের দৃঢ়তায় নয়, মহীতোষকে জব্দ করবার জন্যেই বলেছিল রত্না।

'তখন নিশ্চিত বোঝা যাবে কলকাতা বাঁচবে কি না !'

'কলকাতা না বাঁচুক তোমার কটন-মিল বাঁচলেইত হল—সেখানে গিয়ে থাকব !'

'কটনমিল বেঁচে গেছে ! চল্লিশ সনের মড়ক আর নেই—এবার প্রায় পাঁচশ কোটি গজ কাপড় তৈরী হবে ভারতবর্ষে !'

'ক'কোটি গজ ব্যাণ্ডেজ ?'

'ব্যাণ্ডেজ তোমাদের শাড়ির মতোই পয়সা দেয় !'

'তাইত বলছি তোমার মিলে গিয়েই থাকব—এখানকার চেয়ে নিশ্চয় ভালো জায়গা !'

তারপর মাদ্রাজের সমুদ্র-তীর ছুঁয়ে গেল জাপানী বোমা। রত্না ভাবছিল এবার তবে সত্যি ভারতবর্ষে যুদ্ধ এ'ল ! অনেক বিভীষিকা দিয়ে যুদ্ধকে বুঝতে চেষ্টা করেছে রত্না কিন্তু সবই তা কল্পনায়। দূরের যুদ্ধকে কল্পনায় যতোটা ধরা যায়, সহৃদয়তা নিয়ে মানুষের দুঃস্থতা যতোটা উপলব্ধি করা যায়—তার চেয়ে কতোটুকু বেশি হবে সত্যিকারের এ যুদ্ধ ? রত্নার কল্পনা এগোতে পারে না। কিন্তু কলকাতায় সে থাকবে—এতোদিনই থেকেছে যখন এখন আর যাওয়া যায়না। দাদার অনুরোধপত্রকেও অবহেলা করতে হবে। ঘড়ির কাঁটায় কাঁটায় সুবিন্যস্ত জীবন ত অনেকদিন কাটানো গেছে—

অনিশ্চয়তার মধ্যে কয়েকটা দিন কেটে যাক্‌না। ভয় থাকলেও তার উন্মাদনা কম নয়। দেশে যাবার জন্যে সতু ক্ষেপে উঠেছিল একসময়। একটি কথায়ই ও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। জীবন-মরণ যে অদৃষ্ট ছাড়া কিছু নয় কেবলমাত্র ও কথাটাই বলতে হয়েছিল রত্নাকে

রাস্তায় চলা এখন খুবই বিপদ, রত্না জানে। যেসব মেয়ে এখন কলকাতায় থাকছে এবং রাস্তাঘাটে চলাফেরা করছে তারা যে পুরুষমাত্রেরই ভোগ্য এ সহজ আবিষ্কারটা কলকাতার সাহসী পুরুষরা নির্ব্বিচারে করে নিয়েছিল। অনেক লোলুপ দৃষ্টি, গায়ে-পড়া অনেক আলাপ ঠেলে পথ চলতে হয়। বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকা অসহ্য মনে হলে রত্না এ আশঙ্কাটাকে মেনে নিয়েই বেরিয়ে পড়ে। ষ্টেশনারীর দু'একটা টুকিটাকি কিন্‌তে হলে বেশিদূর যেতে হয়না কিন্তু তাকে সত্যকারের বেরোনো বলা যায় কি? ট্র্যামে অন্ততপক্ষে চৌরঙ্গীটা ঘুরে এলে মনে হয় খানিকটা বাইরে বেড়িয়ে আসা হল।

মৃত্যুর ভয় আর আশঙ্কাও যে জৈবধর্ম্মকে নিঃসাড় করে দিতে পারেনা সে কথাটারই যেন প্রমাণ হচ্ছে কলকাতার ল্যাবরেটারিতে। বুদ্ধিবিচারের চাকায় চলা প্রাণের ধর্ম্মই নয়—আত্মরক্ষা আর উপভোগের চাকায়ই তৈরী তার দু'চাকার গাড়ী। প্রাণ সেই আদিম শোভাযাত্রা করে চলেছে কলকাতার রাস্তায়, মনুষ্যত্বের মুখোস আর কারো মুখে নেই। যুদ্ধের প্রতীক্ষায়ই একটা সহর এম্নি রূপ নিয়ে দাঁড়িয়েছে—যুদ্ধ যদি সত্যি আসে তাহলে যে কি চেহারা হবে কলকাতার তা ভাবতেও একটা ঠাণ্ডা ভয় স্নায়ুগুলোকে কাঁপিয়ে দিয়ে যায় রত্নার।

কিন্তু আশ্চর্য্য, এই ভয় নিয়ে তার মন ও জড় হয়ে যায়নি—মাঝে-মাঝে আনন্দ-কুড়োবার ইচ্ছা তারও হয়। যে অপূর্ব্ব বর্ণে আর সঙ্গীতে ডিস্‌নে পর্দ্দার গায়ে পৃথিবীর জন্ম ফুটিয়ে তুলেছেন—কয়েক ঘণ্টা সেই বিস্ময়কর জগতে ডুবে থেকে রত্না যখন বেরিয়ে

এলো তখনও য়ুরোপের ধ্রুপদী অর্কেষ্ট্রা তার কানে গুঞ্জন তুলছে, মনের উপর ভেসে বেড়াচ্ছে আদিম নীহারিকাপুঞ্জ, আদিম পৃথিবী, প্রাণের জন্মরহস্য। চৌরঙ্গীর বাস-ষ্ট্যাণ্ডের কাছে এসে যখন দাঁড়াল রত্না তখনো তার চোখে কলকাতার রাস্তাঘাটের কোনো মানে নেই।

"আপনি!" পেছনে একটা আওয়াজ।

কলকাতার রাস্তা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে তাকাল রত্না।

"ছবিটা দেখলেন?"

"ও—" রত্না হাসিতে ঝলমল করে উঠল: "ছবিটা দেখে এলুম। আপনি দেখেছেন?"

"আপনার পেছনেই বসেছিলুম।"

"আমি ত দেখিনি!"

"যে রকম মনোযোগ দিয়ে ছবি দেখছিলেন!"

"খুব ভালো ছবি নয়?"

"চমৎকার!"

"মিউজিকটা এতো ভালো, ভুলতে পারছিনে এখনো।"

কালিঘাটের বাস এসে দাঁড়াল—রত্না দু'পা এগিয়ে জিজ্ঞেস করল: "আপনি যাবেন না ওদিকে?"

"যাব।" রত্নার পেছনে প্রবীর গিয়ে বাসে উঠল।

ছায়ার মতো রত্নার পেছনে দাঁড়িয়ে সুযোগের অপেক্ষায় ছিল যারা হতাশ হয়ে অন্যদিকে মনোযোগ ফিরিয়ে নিতে হল তাদের। বাস ছেড়ে দিয়েছে তখন।

রত্নার সীটে জায়গা ছিল। "এখানে বসুন—পেছনে কেন?" রত্না বললে।

প্রবীর এগিয়ে আসতে আসতে দেখতে পেল, বাসের সব ক'টি লোক রত্নার ওই কথাটিতেই উৎকর্ণ হয়ে উঠেছে।

রত্না চা আনতে গেছে। প্রবীর রত্নার ছোট ঘরটার চারদিকে

তাকিয়ে আবহাওয়াটার সঙ্গে পরিচিত হয়ে উঠ্ছিল। আসবাবের ছড়াছড়ি নেই—নিঃসঙ্গ জীবন-যাপন করতে গেলে কতোই বা উপকরণ দরকার? 'অনেক কথা আছে আপনার সঙ্গে'—বাসে বলেছিল রত্না। কি কথা? হয়ত পার্টিতে আস্‌তে চায়। ভবিষ্যৎ যাদের ধোঁয়াটে তেমন মেয়েরাই আস্‌ছে পার্টিতে। পার্টিতে এসে তবু করবার মতো কিছু কাজ খুঁজে পায় তারা, মনকে ব্যস্ত রাখবার মতো একটা আদর্শ পায়। নিঃসঙ্গ, আশাহীন জীবন নিয়ে পচে মরবার দুর্দ্দশা থেকে কতো মেয়েকে সুস্থ জীবনে বাঁচিয়ে আন্‌ছে পার্টি। প্রবীর পার্টির উপর নূতনভাবে সশ্রদ্ধ হয়ে ওঠে।

হয়ত স্বাধীন জীবিকা অর্জ্জনের নেশা নিয়েই রত্না তার জীবন সুরু করেছিল। মেয়ে বলে নিজেকে অশ্রদ্ধা করবার বৃত্তি থেকে যে মুক্ত ছিল তার মন' তার জন্যে তাকে ধন্যবাদ! কিন্তু আমাদের সমাজ মেয়েদের ইস্কুলমাষ্টারী করে পয়সা রোজগারের স্বাধীনতায় মাত্র সম্মতি দিয়েছে, জীবনের যে চারদিকে আরো স্বাধীনতা চাই তাতে সমাজের সম্মতি নেই। কৃপণ আলো জীবনকে আলোকিত করতে পারেনা, আলোর অতৃপ্ত নেশা জাগিয়ে অন্ধকারের চেয়েও দুর্ব্বহ আবহাওয়া তৈরী করে তোলে। রত্নাদের জীবন ঠিক তেম্নি দুর্ব্বহ, যেটুকু আলো পেয়েছে তা তাদের আশীর্ব্বাদ নয়, অভিশাপ। সমাজকে ভেঙে দেবার আন্তরিক ইচ্ছা যদি কারো থাকে তবে তা এদেরই আছে। অন্তত এদের ইচ্ছাকে সে-পথে এগিয়ে দেওয়া সহজ। রত্নার 'অনেক কথা'র মধ্যে প্রবীর এ-ইচ্ছারই একটা ক্ষীণ করুণ ধ্বনি হয়ত শুনতে পাবে। তার জন্যে প্রস্তুত হয়ে রইল প্রবীর।

চায়ের ছোট ট্রে-টা টিপয়ের উপর রেখে জিজ্ঞেস করল রত্না: "আপনাদের নাইটস্কুল কেমন চলছে—?"

"চল্‌ছে।" প্রবীর একটু হেসে রত্নার দিকে সম্পূর্ণ তাকিয়ে বল্‌লে: "কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে গা-ঢাকা দেবার দিন বোধ হয়

শেষ হল আমাদের। এবার হয়ত দিনের আলোতে বাইরে এসে দাঁড়াতে পারব।"

"তার মানে?" স্বাভাবিক মিহি হাসি রত্নার মুখে।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চায়ের কাপটা সামনে টেনে নিয়ে প্রবীর বল্‌লেঃ "কম্যুনিষ্ট পার্টিকে বৈধ ঘোষণা করবার দাবী জানাচ্ছি আমরা—বলছি জনগণের হাতে হাতিয়ার দিতে। বিশ্বসভ্যতার শত্রু ফ্যাসিষ্টরা এগিয়ে আস্‌ছে, তাদের রুখ্‌তে পারে একমাত্র জনগণ।"

"যুদ্ধের জন্যে তৈরী হচ্ছেন আপনারা?"

"ফ্যাসিষ্টের হাত থেকে বাঁচতে হলে যুদ্ধের জন্যে সমস্ত দেশকে তৈরী করে তুল্‌তে হবে।"

"কিন্তু কংগ্রেস কি এ-কথা বলছে?"

"কংগ্রেস!" প্রবীর চায়ের কাপে কয়েকটা চুমুক দিয়ে বল্‌লে "কংগ্রেসকে নিয়ে মুস্কিল যে স্বাধীনতার বাইরে তাঁরা দৃষ্টিটাকে নিয়ে যেতে চাননা। বর্ত্তমান অধীনতার চেয়ে বড়ো দুর্ভাগ্য যে ফ্যাসিষ্টদের আক্রমণ একথাটাই তারা বুঝতে চাচ্ছেন না।"

"কিন্তু কংগ্রেসের দাবী এবার ত পূরণ হবে শোনা যায়। কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে ভারতবর্ষ যুদ্ধ করতে পারে না।"

"ক্রীপ্‌স্‌-অফার কংগ্রেস নিতে চায়নি—স্বাধীনতার চেয়ে যে হলদে অধীনতাকে প্রতিরোধ করা এখন বেশি দরকার কংগ্রেস আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে এ কথাটাই বুঝতে চায়না। ফ্যাসিজ্‌ম একটা আন্তর্জাতিক উপদ্রব—মড়কের মতো মানুষমাত্রেরই শত্রু—এই মড়ক ভুলে গিয়ে ইংরেজের সঙ্গে দেনাপাওনার হিসেব নিয়ে বসবার সময় কি এখন?"

"কংগ্রেস ক্রীপস্‌-অফার নেবেনা?"

"গান্ধীজি এই পোষ্ট ডেটেড চেকে রাজী নন—এক্ষুণি তাঁর স্বাধীনতা চাই। কংগ্রেস তাঁর বিরুদ্ধে যেতে রাজী হবেনা, বিশেষ

করে জওহরলালত ত নয়ই—গান্ধীজি যখন বলেছেন—Jawaharlal will be my successor." প্রবীর বিশেষজ্ঞদের মতো মার্জিত মিহি হাসি হাসতে লাগল।

"কংগ্রেসের স্বাধীনতার প্রস্তাবে ত রাজী ছিলেন ক্রীপস্—জওহরলালের বন্ধু তিনি, ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্যে অনেক কথাই বলেছেন—কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বনিবনাও হলনা?" ছাত্রীর মতো চোখেমুখে আগ্রহ নিয়ে জিজ্ঞেস করল রত্না।

"স্বাধীনতার মানে যে এক্ষুণি ইংরেজকে চলে যেতে হবে ক্রীপস্ হয়ত ততটা ভাবেন নি।" চা শেষ করে সিগারেটের দগ্ধাবশেষ টুকরোটা কাপের ভেতর ফেলে দিলে প্রবীরঃ "কিন্তু এ-নিয়ে কংগ্রেসে গোল বেঁধে গেল। কংগ্রেস থেকে রাজাজি সরে এলেন।"

"আমার কিন্তু সত্যি খুব খারাপ লাগছে—সবদিকে কেমন যেন নিরাশার অন্ধকার—ভালো লাগেনা—সত্যি।"

"ভালো না লাগবার কি আছে? পৃথিবীর সমস্ত দেশের মানুষেরইত আজ এই অবস্থা—আমাদের কষ্ট তাদের কারো চেয়ে বেশি নয়। মনুষ্যত্ব রক্ষার জন্যে জনগণ আজ বর্ব্বরতার বিরুদ্ধে হাতিয়ার নিয়েছে—এ কথা মনে করে কি আপনার ভালো লাগেনা?"

"এতো বড় ছবি হয়ত কল্পনায় আসেনা।" লজ্জিতভাবে হাসতে লাগল রত্না।

"আসা উচিত। এখন যে ভারতবর্ষের একটা স্বতন্ত্র নিজস্ব-সমস্যা আর নেই—ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে দেশে দেশে যারা লড়ছে তারাই যে ভারতবর্ষের বন্ধু, আজকের দিনে শিক্ষিতশ্রেণীর অন্তত এ-কথাটা বোঝা উচিত।" প্রবীর আরেকটা সিগারেট ধরালে।

"চ্যাংকাইশেক ত ভারতবর্ষের স্বাধীনতার কথা বলছেন।"

"নিজের দেশের শ্রমিক আর চাষীদের স্বাধীনতা সহ্য করতে পারেন কি চ্যাংকাইশেক? নেহাৎ দায়ে পড়ে আজ তিনি লালচীনের

শরণ নিয়েছেন, তার আগে স্বাধীনতার উদার বাণী তার মুখে ত শোনা যায়নি।"

রত্না চুপ করে রইল। নিবিষ্টমনে সিগারেট টেনে চলল প্রবীর। চ্যাংকাইশেকের উপরই কয়েক মিনিট বিচরণ করে চলল তার চিন্তা। রাশ্যার মিলিটারি মিশন চলে গেছে চুংকিং থেকে। কেন? লালচীনের নেতা মাউসেতুং-এর সঙ্গে আর বনিবনাও হচ্ছেনা জেনারেলেসিমোর। দেশটা তাঁর কাছে কিছুই নয়—নিজের প্রভুত্বই সব! চিন্তার ধারা শতপথে পল্লবিত হয়ে হয়ত আরো অনেকক্ষণ চলতে পারত কিন্তু হঠাৎ প্রবীর একজন অর্দ্ধপরিচিতার সামনে চুপ করে থাকা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। "আপনার অনুমতি না নিয়েই কিন্তু আমি সিগারেট টেনে চলছি—নিশ্চয়ই কিছু মনে করছেন না!" আরেকটা সিগারেট ঠোঁটে তুলে নিয়ে বল্‌লে সে।

"বাঃ, মনে করব কেন? বরং সম্ভব হলে আমিই সিগারেট আনিয়ে দিতুম।"

উত্তরে প্রবীর কথা বল্‌লেনা শুধু বিস্মিত চোখে তাকাল রত্নার দিকে। নিজেকে লজ্জিত দেখাবে এই ভয়ে রত্না তাড়াতাড়ি অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বললেঃ "কংগ্রেসের কাজে আপনাদের সায় নেই?"

"তা কি করে বলা যায় বলুন। ক্রীপস্ আসবার আগে ভারতরক্ষার কাজে কংগ্রেস ত গররাজি ছিল না! আমরা ত কংগ্রেসের কথাই বলছি—ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে হবে।"

"কংগ্রেস কি ভারতবর্ষকে রক্ষা করতে চায়না?"

"নিশ্চয়ই চায়। কিন্তু কি উপায়ে যে তা হবে তা-ই বোঝা যাচ্ছেনা।"

"আপনারা কি উপায় ঠিক করেছেন?"

"জনশক্তিতে আমাদের বিশ্বাস আছে—তাই জনগণ যাতে

ফ্যাসিষ্ট-প্রতিরোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়ে ওঠে তারি জন্যে আমরা সচেষ্ট হ'ব।"

"জনগণ আপনাদের চেষ্টায় সচেতন হবে?"

"প্রত্যেক দেশেই হচ্ছে। ফ্যাসিষ্টদের জয়যাত্রার যে-বিরাট প্রতিরোধ তৈরী করেছে রাশ্যার জনগণ, এতো রোজ দৈনিক কাগজের পৃষ্ঠায়ই দেখা যায়।"

"প্রতিরোধে সফল হবে রাশিয়া?"

"হবে বলেই মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি। তা যদি না-হয়, যদি ককেশাস পেরিয়ে নাৎসীরা ইরাণের পথে ছুটে আসে তাহলে ভারতবর্ষের কি অবস্থা হ'বে ভাবতে পারেন? নাৎসীদের হিংস্রতার কাছে অহিংসার কোনো মানে নেই তা-ত জানেন!"

"সে কল্পনা করতে গেলে মাথা ঘুরে যায়!"

"কিন্তু মাথা ঘুরলে ত চলবেনা—আমাদের তৈরী হতে হবে। ঐক্যবদ্ধ রাশ্যার মতো ভারতবর্ষ তৈরী হতে পারলে তা যে কি বিরাট শক্তি হয়ে উঠবে কল্পনা করা যায়না।" বক্তৃতার ভঙ্গীটাকে হঠাৎ মোলায়েম করে নিয়ে প্রবীর আবার বলল: "আসুন না, আমাদের সঙ্গে কাজ করবেন।"

এ ধরণের অনুরোধের জন্যে রত্না মোটেও প্রস্তুত ছিলনা তাই হঠাৎ ভেবে পেলনা কি উত্তর দেওয়া যায়। ভেবে নেবার জন্যে রত্নাকে যতটুকু সময় দেওয়া যায় ততটুকু সময় দিয়ে প্রবীর বললে: "আসবেন?"

"গিয়ে কি হবে বলুন, আমাকে দিয়ে কোনো কাজই হবেনা"

"সবাইকে দিয়ে সব কাজই হয়। তা না হলে রাশ্যায় নিত্যনূতন জেনারেল তৈরী হতনা।"

"বাংলাদেশের মেয়ে কি সব কাজ করতে পারে?"

"চেষ্টা করলেই পারে। জলবায়ু দিয়েই কেবল মানুষ তৈরী হয়না।"

"তৈরী হবার সময় আমাদের চলে গেছে!"

"তৈরী হবার কি একটা ধরাবাঁধা সময় আর বয়েস আছে?"

"কি জানি—" রত্না নিজের উপর বিরক্তি নিয়েই একটুকু হাসলে: "মনে হয় আমাদের দিয়ে কিছু আর হবেনা!"

প্রবীর প্রতিবাদ করলেনা। খানিকক্ষণ উস্‌খুস্ করে চেয়ার থেকে উঠে বললে: "আচ্ছা—চলি আজ।"

"আসবেন আরেকদিন—" রত্নাও দাঁড়িয়ে গেল।

"বিরক্ত না হলে নিশ্চয়ই আসব—"

"আপনাকেই ত বরং ধরে নিয়ে এসে বিরক্ত করলাম!" রত্না হাসতে লাগল।

প্রবীর সেই হাসিটুকু কুড়িয়ে নিয়েই যেন ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সহজ, সুন্দর, নির্ভয় হাসি। এই হাসি থেকেই বোঝা যায় একে দিয়ে কাজ হ'বে। প্রবীর আসবে—পার্টির জন্যে একে চাই। কোনোসময় পার্টিতে ও ছিল না কি? একটা নাইটস্কুলে পড়াবার কথা ছিল যেন ওর—কিন্তু শেষটায় এসেছিল কি না প্রবীর ঠিক মনে করতে পারেনা। হয়ত আসেনি—এলে নামটার সঙ্গে পরিচয় থাকৃত প্রবীরের। কিন্তু ওর নাম ত প্রবীর জানেনা, হয়ত তখন শুনেছিল, এখন ভুলে গেছে। ও-ও হয়ত প্রবীরের নাম জানেনা—শুধু মুখচেনা আছে! মুখচেনা পরিচয় থেকে প্রবীরকে বাড়িতে ডেকে এনে চা খাওয়াবার কি দরকার ছিল ওর? প্রবীর সদ্য-অতীত মুহূর্ত্তগুলো স্মরণ করে পরীক্ষা করতে সুরু করল। শ্রদ্ধার অভাব ছিলনা মেয়েটির কথাবার্ত্তায় বা আচরণে। কোনো মেয়ের কাছ থেকে শ্রদ্ধা পাওয়া যে একটা বড়ো ইতিহাসের সূচনা প্রবীর তা জানে। সুপ্রভা প্রথম তাকে শ্রদ্ধাই করত। কতো জটিল ঘটনার ভেতর দিয়েই না সুপ্রভা তার জীবনকে টেনে নিয়ে গেল। পেছনে তাকালে প্রবীর এখনও যেন সে ঘটনাগুলোতে রক্তমাংস নিয়ে বাঁচতে সুরু করে। তাতে আনন্দের চেয়ে ব্যথাই বেশি। তাই

আর পেছনের দিকে তাকাতে চায়না এখন প্রবীর। প্রাণপণে সে সম্মুখের দিকে ছুটছে কাজের অজস্র ধূলিকণা উড়িয়ে—যাতে পেছনের অধ্যায়টা ধুলোচাপা পড়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। কিন্তু জীবনের কোন্ এক দুর্জ্ঞেয় স্থান যেন ছুঁয়ে গেছে সুপ্রভা যাকে হয়ত কাজ দিয়ে ভুলানো যায় না, কিছুতেই যা কাজের আড়ালে চাপা পড়তে চায়না। সে-স্থানের শূন্যতা কাজের স্থূলতা দিয়ে ভরে উঠ্‌বে না কোনদিন—প্রবীর তা বুঝতে পারে। কোথায় যেন একটা কবিতা পড়েছিল প্রবীর, কিছুতেই আর ভুল্‌তে পারেনি—ওটাই আবৃত্তি করতে থাকে তার মন :

'Why should your love be idle, when I am no more ?

Look at other eyes when mine are closed for ever,

Let your lips meet other lips in love,

Whisper into other ears, have other whispers in yours ; '

গলি দিয়ে বড়ো রাস্তার দিকে যাবার মুখে প্রবীর মনে-মনে এ-কবিতাটাই আবৃত্তি করতে সুরু করলে। জনবিরল গলি, জোরে-জোরে আবৃত্তি করলেও ক্ষতি ছিলনা। প্রবীরের অন্তত ইচ্ছা করছিল মনের কথাটা কানকে শুনিয়ে দেয়। কিন্তু কান তার হঠাৎ সচকিত হয়ে উঠ্‌ল মোটরের একটা তীব্র হর্নে। রাস্তার পাশ ঘেঁষে প্রবীর দাঁড়াতে যাচ্ছিল—মোটরটাও তার পাশ ঘেঁষে হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল।

"কম্যুনিষ্ট যে, কি খবর ?" মোটরের ভেতর থেকে গলা বাড়িয়ে দিল মহীতোষ।

"চাপা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি।" জড়সড় হাসি নিয়ে প্রবীর বললে।

মহীতোষ দরজা খুলে দিয়ে বললে, "চাপা পড়লে তুলে নিতে হ'ত—এখন ওম্নি উঠে এসো ত।"

"কোথায় যাচ্ছ?"

"জাহান্নামে নয়, এসো।"

প্রবীরকে উঠতেই হল। গাড়িতে ষ্টার্ট দিয়ে মহীতোষ বললে, "অকাজেই ত ঘোরাফেরা কর—না হয় আমার সঙ্গেই বেড়িয়ে এলে খানিকক্ষণ।"

খুব বেশি আপত্তি নেই প্রবীরের। মহীতোষ ব্যবসা করে টাকা-পয়সা পাচ্ছে সুদাসের কাছে প্রবীর খবরটা শুনেছে। এখন একেবারে চেঞ্জড্ ম্যান না কি। না হবার কি আছে। মানুষেরই পরিবর্ত্তন হয়, পরিবর্ত্তন হয় বলেই সে মানুষ।

"পকেট থেকে টিনটা তুলে নিয়ে সিগারেট খেতে পার।" গলি পার হয়ে একটা মোড় ঘুরতে গিয়ে বললে মহীতোষ।

প্রবীর অসঙ্কোচে টিনটা বার করে নিলে: "জাহান্নাম ছাড়াও ত জায়গাগুলোর নাম আছে—কোথায় যাবে?"

"ধরে নাও—লেক!"

"লেক ত ভায়া এ-গলি নয়।"

"তোমার সঙ্গে দেখা হবে অদৃষ্টে লেখা ছিল কাজেই গলিটাতে ঢুকে পড়লাম—সদর রাস্তাগুলো পুরোণো হয়ে গেছে—" বুদ্ধিমানের মতো হাসতে সুরু করলে মহীতোষ।

মহীতোষের কটনমিলের কথা ভাবতে ভাবতেই বাড়ি ফিরে আসছিল প্রবীর। ওর মুখ থেকে যা খবর পাওয়া গেল তা সত্যি তারিফ করবার মতো—একটা ইণ্ডাষ্ট্রি দাঁড় করিয়েছে তাহলে মহী! প্যাশনেট লোকগুলো সত্যি কাজের হয়—ফ্রয়েডকে না মেনে উপায় নেই—মানুষের স্তূপীকৃত কীর্ত্তির কর্ত্তাই তার প্যাশন। অবশ্য

প্যাশনকে তার সহজ সরল পথে চলতে দিলে চলবেনা, ঘাড়ে ধরে কাজের বাঁকা পথে ঢুকিয়ে দিতে হবে। যতদিন সুপ্রভা বেঁচেছিল, প্রবীর, বলতে গেলে, পার্টির জন্যে কোনো কাজই করেনি। এখন ক্রমেই কাজ করবার ইচ্ছা তার ফিরে আসছে। 'জনগণকে আত্মরক্ষায় উদ্বুদ্ধ করতে হবে'—এ ধরণের প্রতিজ্ঞা মনকে অবিরতই ব্যাকুল করে তুলছে এখন। শুধু ওই শিক্ষয়িত্রীটিকেই নয়, মহীতোষকেও প্রবীর বোঝাতে চেষ্টা করেছে কেন এখন ভারতবর্ষের রণসাজ পরা উচিত। মহীতোষের মতো রাজনীতিতে অজ্ঞ লোকও প্রবীরের অকাট্য যুক্তিতে তাকে সমর্থন করতে বাধ্য হল। জাপানী আক্রমণ হলে স্করচ্‌ড্‌ আর্থ পলিসি ত নিতেই হবে—কারখানার এক টুকরো লোহাও মহীতোষ জাপানীদের গুলি তৈরী করতে রেখে যাবেনা। কারখানার যন্ত্রপাতি সরিয়ে ফেলবার ব্যবস্থা নাকি মহীতোষ মনেমনে এঁচে রেখেছে—রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে না হোক আর্থিক ক্ষেত্রে ত জাপান বরাবরই ভারতবর্ষের কাপড়ের কলওয়ালাদের শত্রু। মহীতোষের কারখানা জাপানীদের হাতে পড়লে হয়ত তারা তাকে বার করে দিয়ে লোহালক্করগুলো বন্দুক-কামান তৈরীর জন্যে নিপ্পনে পাঠিয়ে দেবে! কথাটা কল্পনা করতেও মহীতোষ শিউরে ওঠে আর সেই সঙ্গে ক্ষেপে ওঠে জাপানীদের উপর। স্বার্থের জন্যেই হোক আর প্রবীরের যুক্তির জন্যেই হোক মহীতোষ অ্যান্টি-জাপান। এইটুকুই যথেষ্ট স্বস্তিকর। মহীতোষের এ মানসিকতাও এখন দুর্লভ। সুভাসবাবু নাৎসীক্যাম্পে পালিয়ে গেছেন ধারণায় আর হিটলারের আর জাপানের অদ্ভুত সাফল্যে অ্যান্টিফ্যাসিষ্ট মনোভাব কিছুতেই গড়ে উঠছেনা এখানে। যুক্তিতর্ক দিয়ে সুবীরকেই বোঝাতে পারলনা প্রবীর যে জনগণের হাতে ফ্যাসিষ্ট কুচক্রীদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী। একটা মিথ্যা মনোভাব আশ্রয় করে সুবীর অনর্থক জেল খাটতে গেল। জেলখাটা-টাই আমাদের দেশে রাজনীতির মোক্ষ। আবেগপ্রবণ মন আমাদের কিছুতেই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে পলিটিক্‌সটা

বুঝতে চায়না। বার্লিন থেকে আবেগময়ী ভাষায় না কি সুভাষবাবু রেডিওতে বক্তৃতা দিচ্ছেন—এরচেয়ে ছেলেমানুষি আর কি হ'তে পারে! স্যুটকেসে করে বিপ্লব আমদানী করার মতোই হাস্যকর বিদেশ থেকে স্বাধীনতা নিয়ে আসা!

বাড়িতে চুপচাপই থাকে প্রবীর—তার রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে একটি কথাও বলেনা। জেলে গিয়ে সুবীর সমস্ত বাড়ির দুর্ব্বলতাটুকু জয় করে নিয়েছে। প্রবীরের রাজনৈতিক বিশ্বাস সুবীরের কার্যকলাপের প্রতি পাছে বিদ্রূপবাণ বর্ষণ করতে সুরু করে সে আশঙ্কাতেই চুপ থাকতে হয় প্রবীরকে। গান্ধীভক্ত হয়েও অনু সুবীরের সমালোচনা সহ্য করতে চায় না। থাক্, কি দরকার হৈ-হাঙ্গামা করে! বাড়ির সঙ্গে প্রবীরের সম্বন্ধই বা কতটুকু? পার্টির কাজ পুরোদমে সুরু হয়ে গেলে সমস্ত সময়ের জন্যে পার্টির কাজই করবে সে—খাওয়াপরার খরচ যখন প র্টিই বহন করতে রাজি তখন আর বাড়ির সঙ্গে সম্বন্ধ রাখবার দরকার কি? এ-বয়েসে বাপমার আদর জিনিসটা সত্যি বলতে কি, কুৎসিতই মনে হয়। মনে হয় এ আদরের পিছনে হয়তবা কোনো গূঢ় অভিসন্ধি আছে। সুপ্রভার মৃত্যুতে তাঁদের মন যে গভীর তৃপ্তি অনুভব করেছে—মনে হয় তা-ই যেন এই আদরের গায়ে মাখানো। মা যদি ঠাকুরকে প্রবীরের খাওয়া সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতে যান একটা ঘৃণার শিরশিরে স্পর্শ যেন প্রবীরের মেরুদণ্ডে কিলবিল করতে থাকে। জোর করে মুখ বুঁজে গম্ভীর হয়ে যায় প্রবীর। কথা বলেনা কিন্তু মনের উপর কালো পোঁছ লাগতে থাকে অনবরত।

বাড়ি ফিরে আসতে আজ ভালো লাগছিল প্রবীরের। লেকের হাওয়ার জন্যে কি? না কি মহীতোষের মোটরে বেরিয়ে এলো বলে? মন থেকে কালো পোঁছ কয়েকটা উঠে গিয়ে হাল্কা লাগছিল যেন শরীর। কেন? কেন আবার? শিক্ষয়িত্রীটির

সঙ্গে আলাপ করেই। তার চেয়ে বড়ো কারণ আর নেই। কিন্তু ওর নামটা প্রবীর ভুলে গেল কি করে? পার্টির মেয়েদের নাম একে একে স্মরণ করতে লাগল প্রবীর—কিন্তু তাতে কি হবে? যারা কাজ করে তাদের নামগুলোই সে জানে—তার বাইরেও ত অনেক আছে—আর তাছাড়া ও-ত পার্টির নয়। সিগারেটই খেতে পারল যখন মেয়েটির সামনে, ওর নাম জিজ্ঞেস করলে তার চেয়ে বেশি কি আর অভদ্রতা হ'ত? নামটা জানা যখন দরকার ছিল প্রবীরের, কেন সে এ বুর্জোয়া ভদ্রতা করতে গেল? যাক্—আরেকদিন নিশ্চয় সে যাবে—তখন জেনে নেওয়া যাবে নামটা। ওর কাছে যাওয়া উচিত। উচিত এ জন্যে যে এ ধরণের মেয়েই পার্টিতে দরকার—লজ্জাবতী লতা নয়, পলিটিক্যাল ইণ্টারেষ্ট যার আছে। পার্টির কাজেই যাবে সে মেয়েটির কাছে। কাজে। মনকে বারবার শোনাতে লাগল প্রবীর—পার্টির কাজে কিন্তু বাড়ি ঢুকবার মুখে অবাক হয়ে দেখতে পেল সে, মন তার গুণগুণ করে চলেছে: 'Why should your love be idle, when.I am no more!'

মনোহরপুকুরের মোড়ে প্রবীরকে নামিয়ে দিয়ে মহীতোষের মোটর আবার এসে ঢুকল রত্নাদের গলির ভেতর। প্রবীর কেন এসেছিল এ-গলিতে—প্রশ্নটা পোকার মতো মহীতোষের চিন্তায় অবিরত ঘুরপাক খাচ্ছিল। রত্নার কাছেই কি? জিজ্ঞেস করতে পারেনি মহীতোষ প্রবীরকে। রত্নার সঙ্গে প্রবীরের ঘনিষ্ঠতা যদি ম্লান হয়ে গিয়ে থাকে—এ-প্রশ্নে তা উস্কে উঠ্‌তে পারে আবার রত্নার খোঁজই হয়ত রাখেনা প্রবীর—গায়ে পড়ে তাকে সে খোঁজ দিতে যাবে কেন মহীতোষ? মহীতোষ স্বীকার করে, মেয়েদের ব্যাপারে পুরুষের যা স্বাভাবিক দুর্ব্বলতা—যে দুর্ব্বলতার চরম স্ত্রীকে অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বল্‌তে দেখ্‌লে স্বামীর মাথা খারাপ হয়ে

যাওয়া—তা তার আছে। প্রবীরের কি তা নেই? কম্যুনিষ্ট বলে নিজেকে পরিচয় দিয়েও এ-দুর্ব্বলতার উপরে উঠ্‌তে পারেনি সে। সিনেমায় একটা দিনের ঘটনা বেশ মনে করতে পারে মহীতোষ। ওহোঃ, সে-মেয়েটিকেই ত বিয়ে করেছিল প্রবীর। একজন নার্সকে বিয়ে করেছে প্রবীর এবং প্রবীরের স্ত্রী মারা গেছে—সুদাস যেন বলেছিল একদিন। প্রবীরকে জিজ্ঞেস করলে হ'ত। বেচারী! খুবই সপ্রতিভ ছিল মেয়েটি! সমবেদনা জানানো উচিত ছিল না কি প্রবীরকে? সত্যি, এবয়েসে স্ত্রী-বিয়োগ বিশ্রী ব্যাপার—একটা তীব্র, তীক্ষ্ণ, ট্র্যাজিডি। কিন্তু রত্নার সঙ্গে প্রবীর দেখা করতে আসেনি ত? স্ত্রী-বিয়োগের পর পূর্ব্বপরিচিতাদের খোঁজ নেওয়া খুবই স্বাভাবিক!

"আর একটু আগে যদি আস্‌তে—" মহীতোষকে দেখে রত্না হাস্‌তে লাগ্‌ল।

"কেন? লেট হয়ে কিছু হারিয়েছি বলে ত মনে হয়না—"

হাসিটাকে সংযত করে নিল রত্না। তাতে মহীতোষের কিছু যায় আসেনা—সোজা কথায় সরাসরি এগিয়ে যাওয়া তার অভ্যাস। এ অভ্যাসের দরুণ গালাগালি দিতে হলে তাকে এক্‌স্‌ট্রোভার্ট মাত্র বলা যায়।

"তোমার বন্ধু প্রবীরবাবু এসেছিলেন—" রত্না মহীতোষের দিকে তাকাল।

"ও—তাই?" খুব উৎসাহিত দেখাতে চাইল মহীতোষ কিন্তু বুঝতে পারছিল যে মনে মেজাজে আর চিন্তায় একটা ভীষণ উলোট-পালট চলছে।

"হঠাৎ রাস্তায় দেখা হয়ে গেল—ধরে নিয়ে এলুম।"

"কিন্তু ধরে রাখতে পারলে না?"

"ছট্‌ফটে অভ্যাস। বসে থাক্‌তে হচ্ছিল বলে সিগারেটের পর সিগারেট টেনে চল্‌ছিলেন।"

"ধূমপান অভ্যাসটা ওদের মার্ক্সের আমল থেকে চলে আসছে—" মহীতোষ প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের পথ খুঁজছিল কিন্তু প্রচ্ছন্ন রাখতে গিয়ে বিদ্রূপটাকে আর বিদ্রূপের রূপ দিতে পারছিল না।

"অনেক কথা হ'ল প্রবীরবাবুর সঙ্গে—"

"পলিটিক্স্?"

"তাছাড়া এখানকার আবহাওয়ায় আর কি আছে?"

"এখানকার আবহাওয়ায়ও কিছু নেই?" হাল্কা আওয়াজে হেসে উঠ্‌ল মহীতোষ।

"তোমার বন্ধুও যে তোমার মতোই হবে তার কি মানে আছে?" কথা নিয়ে মহীতোষকে এগোবার জন্যে রত্না একটু জায়গা ছেড়ে দিলে।

"আমার মতো হোক সে কি আমিও চাই না কি? তাহলে ত বন্ধুবিচ্ছেদই হতো।"

"কিন্তু বিরোধী মত নিয়ে বন্ধুতা সে-ও বা কেমন?"

"হিটলার আর ষ্ট্যালিনের বন্ধুতা হয়নি?"

"বন্ধুতা ভেঙে যেতেও সময় লাগেনি।"

"ওবার রিবেনট্রপ বন্ধুতা ভিক্ষা করতে গিয়েছিল—এবার ষ্ট্যালিনের পালা।"

"তুমি কি ভাব্‌ছ রাশিয়া হেরে যাবে?"

"হেরে গেছে—ফিনিশিংটুকুমাত্র বাকি।"

"তাহলে যে কি হ'বে ভাব্‌তে পারো? ইরাণের ভেতর দিয়ে বোম্বের বন্দরে এসে ঢুকবে নাৎসী-ফৌজ। ষ্টালিনগ্রাডের যুদ্ধ ভারতবর্ষের দোর আগ্‌লাচ্ছে।"

"ফরমূলাটা প্রবীর দিয়ে গেল বুঝি?" একটা অট্টহাসির চেষ্টা দেখালে মহীতোষ।

"এ সহজ কথাটা ধার করতে হয়না।" রত্না অবিচলিত।

"তবু ভালো। প্রবীরের মতো যারা তারা ধার করে কথা বলে আর কথা ধার দেয় কি না, তাই বলছিলুম।"

"বন্ধুর সম্বন্ধে ভালো কথাই রটাচ্ছ।"

"বন্ধু জিনিষটা একটা মুস্কিলের ব্যাপার—ওকে ভালোবাসতেও ইচ্ছা হয় আবার ব্যথা দিতেও ইচ্ছে হয়। বল্‌তে পারো ওটা ভালোবাসারই প্রকৃতি।"

"তা জানি।"

"কথাটা জানা থাক্‌লে অনেক ট্র্যাজেডির হাত এড়ানো যায়।"

"তা যায়না। দুঃখের কারণটা জানা থাক্‌লেই কি দুঃখ পায়না মানুষ?"

"পাওয়া উচিত নয়।"

"তবু তুমি আমি সবাই পাই। যুক্তির বাইরেও মানুষ আরেকটু কিছু। হয়ত তার জন্যেই মানুষের দুঃখ, কিন্তু তার জন্যেই আবার মানুষ মানুষ—যন্ত্র নয়।"

"যাক্, কম্যুনিজম থেকে এবার রবীন্দ্রনাথে ফিরে এসেছে মন।"

"মানুষের ত্রুটীবিচ্যুতি দুর্ব্বলতাকে কি উড়িয়ে দিতে চায় কম্যুনিজম্? কোনদিন নয়। মানুষকে বলিষ্ঠ করে তোলার মানে এ নয় যে মানুষের দুর্ব্বলতাকে স্বীকার করা হলনা।"

"কম্যুনিজম্ চর্চ্চা করছ বুঝি আজকাল?"

"তোমারও করা উচিত।"

"আমার পক্ষে তার বিপদ আছে। মন আমার ধনতান্ত্রিক—তার উপর কম্যুনিজমের বিদ্যা চাপ্‌লে নির্জ্জলা ফ্যাসিষ্ট হয়ে দাঁড়াব।"

"বিদ্যাটা মনকে বদ্‌লেও দিতে পারে।"

"মনটা ত অনবরত বদ্‌লেই চলেছে—নূতন একটা অবস্থায় এসে যে দাঁড়িয়েছে তা খুব বেশিদিনের কথা নয়—এক্ষুনি আবার এখান থেকে সরতে হুকুম দিলে বেচারীর উপর জুলুম করা হয় না কি?" নম্র হাসিতে মহীতোষ আবহাওয়াটা নম্র করে তুললে।

বাইরের দিকে চুপচাপ তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ রত্না। হয়ত

মহীতোষকে নিয়েই ভেবে চলছিল তার মন। দিনের পর দিন রত্নার কাছে এগিয়ে আসছে মহীতোষ—অস্থির পদক্ষেপে নয়, সংযত সম্ভ্রান্ত গতিতে। রত্না বাধা দিতে চায়নি কিন্তু ভাবতেও চায়নি এ গতির পরিণতি কোথায়। খুবই কাছে এসে পড়েছে মহীতোষ এখন—এখন রত্নাকে ভাবতে হবে পরিণতির কথা। কিন্তু সহজ স্বাভাবিক যা পরিণতি ভেবেচিন্তে বিচার করে কি তার কাছে আত্মসমর্পণ করা যায়?—বিচারের জাল জড়িয়ে তা এম্নি জটিল হয়ে ওঠে যে কিছুতেই আর তার দিকে মন এগোতে চায়না। তার চেয়ে ভালো, আগেও যখন ভাবতে চায়নি এখনও আর ভাবতে চাইবেনা রত্না।

"অবশ্যি—" ছোট্ট একটু শব্দে আবহাওয়াটাকে ভেঙে দিয়ে একটু থামল মহীতোষ: "অবশ্যি তোমার মন যদি সাম্যবাদী হয়ে ওঠে তখন মনটাকে বদলে নিতেই হবে।" মহীতোষ ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল।

"আমি তো তোমার উপর জুলুম করতে চাইনে!" অনুনয়ের মতো করুণ সুর ফুটে উঠল রত্নার গলায়।

"জুলুম নয়।" মহীতোষ আর কোনো কথা খুঁজে পেলনা।

অনেক, অনেক কাছে এসে পড়েছে মহীতোষ—চোখের উপর হয়ত ছায়া পড়েছে তার চোখের। দুর্ব্বল শিখার মতো কি একটা ভয়, কেমন একটা আশঙ্কা যেন কেঁপে উঠল রত্নার রক্তে। তারি জন্যে সে মহীতোষকে অভ্যর্থনা জানাতে পারছেনা। হয়ত অভ্যর্থনা জানাবে কোনো একসময়—এখন নয়। কোনো এক সময়। সে যে কখন তা সে জানেনা। শুধু জেনে রেখেছে কোনো এক সময়। তখন হয়ত স্বাতন্ত্র্যের ছায়া, সযত্নলালিত জীবনের ছায়া মন থেকে মুছে গেছে—স্বাভাবিক মৃত্যু হয়েছে তাদের। কিন্তু এখন ত বেঁচে আছে তারা—সেই ছায়াদেরই ভয় আর আশঙ্কা কেঁপে কেঁপে উঠছে

তার রক্তে—দুর্ব্বল শিখার মত কাঁপছে সেই ছায়ারা। হাসিতেও রত্নাকে বিবর্ণ দেখালে।

মহীতোষ তার স্বাভাবিক প্রকৃতি নিয়ে হঠাৎ বেঁচে উঠল আবারঃ "জানো রত্না, বিয়ে জিনিষটা একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার! অনেকটা বন্যার জলের মতো, মাটির উঁচুনিচু ভেঙেগড়ে একাকার করে দেয়। বিয়ে যখন আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তখন তা আলাদা কিন্তু যদি নিজে থেকে গ্রহণ করতে পারি আমরা বিয়েকে তাহলে দেখা যায় বন্যার মতোই একটা প্রাকৃতিক শক্তি দুজনের মনকে ভেঙেগড়ে একাকার করে দিচ্ছে!"

মহীতোষের কথাগুলো, মনে হল, মন দিয়ে শুন্‌ছে রত্না কিন্তু বিবর্ণতা ছেড়ে সে উঠে আসতে পারছেনা।

মহীতোষ অন্যদিকে তাকিয়ে বললেঃ "হয়ত তুমি আমার কথা মানোনা কিন্তু আমার তা সত্যি মনে হয়!"

নিজের অবস্থাটাকেই কেমন যেন অসহ্য লাগছিল রত্নার—তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল সে "চা করি—চা খাওয়া যাক্, কেমন?"

মহীতোষ প্রবল উচ্ছ্বাসে হেসে উঠল।

দুই

সুদাসের কামরায় তখনও বাতি জ্বল্‌ছে, ফ্যান চল্‌ছে—লালচে ঝাপসা চোখ নিয়ে ক্যাশিয়ার আর লেজার-কিপাররা আঙুল মটকাতে মটকাতে চলে গেছে অনেকক্ষণ। বিরক্তিতে বিষণ্ণ হয়ে জমাদার দোর আগলাচ্ছে—পাগড়ি-তকমা-কোট-পাৎলুন খুলে হাল্কা হওয়ার আনন্দে যে পৈতেটার খানিক পরিচর্য্যা করবে সে-সুযোগও ছিলনা বেচারীর—কামরায় 'বড়সাব' বসে আছেন। ড্রাইভার জমাদারের কাছে কলকাতা ছাড়বার পরামর্শ চেয়ে, খানিকক্ষণ বিড়ি টেনে এখন মোটরের খোঁদলে বসে ঝিমুচ্ছে।

ছবার-পড়া চিঠিটা খুলে আবারও পড়ছিল সুদাস। জবাব লিখবার চেষ্টায় ঘণ্টাখানেক সময় নষ্ট করেও জবাব তৈরী হলনা। তাই আবার মনোযোগ দিয়ে চিঠিটা পড়তে হচ্ছিল। নিরপরাধ চিঠির সুর—কিছুতেই কোনো অপরাধ আবিষ্কার করা যায়না—তবু কেন তার জবাবে বারবারই রূঢ় হয়ে উঠছে সুদাস? বিদ্রূপে, ব্যঙ্গে কথাগুলো তার কেন ধারাল হয়ে উঠছে?

কিছুতেই যে শ্যামলী কথা রাখতে পারছেনা, আসতে পারছেনা কলকাতা তার জন্মে ব্যাকুলতার ত অভাব নেই তার, এমনকি নিজেকে অপরাধী করে বার বার সে ক্ষমা চাচ্ছে। সুদূর মফঃস্বলে কলকাতা সম্বন্ধে একটা দারুণ বিভীষিকা এখন। কলকাতা রক্ষার জন্মে ডায়মণ্ড হারবারে দুর্গ তৈরী হয়ে নাকি কলকাতার সীমা পর্য্যন্ত এসে পৌচেছে। তাছাড়া ট্র্যাম পুড়িয়ে দিচ্ছে, টেলিফোনের তার কেটে দিচ্ছে; স্বদেশীর হৈ-হ্যাঙ্গামা চলছে পুরোদমে? অবশ্যি এসবও কিছু বাধা ছিলনা। এসব ভয় শ্যামলীর নেই, অনায়াসেই সে চলে আসতে পারত। কিন্তু মার মুখের দিকে চেয়ে এক পা-ও আর সে নড়তে পারছেনা। মার যে অসুখ তা নয়, শরীর ভেঙে যাচ্ছে কিন্তু অসুখ কিছু নেই। অসহায় হয়ে পড়বার আশঙ্কায় ব্যাকুল দৃষ্টিতে মা তাকে জড়িয়ে ধরছেন। 'মা, তুই ছাড়া আমার আর কেউ নেই—' এমন সব অদ্ভুত কথা বলেন মা। দাদা-বৌদিকে আপন ভাববার সুযোগ কোনোদিনই তাঁরা দেন নি মাকে। পাছে একবার আশ্রয় হিসাবে শ্যামলীকে পেয়ে আবার তাকে হারিয়ে ফেলেন, সেই ভয়েই অস্থির। দেখলে কষ্ট হয়। সুদাসেরও দেখলে হয়ত কষ্ট হ'ত। নিজেকে কষ্ট দিয়েও তাই শ্যামলী মাকে একটু সুখ দেবার চেষ্টা করছে। কিছুইত না, শুধু কাছে থাকা। শরীর ভেঙে যাচ্ছে যখন মার, বেশিদিন ত আর বাঁচবেন না তিনি—হয়ত ছ'মাস, নাহোক একবছর—এক'টা দিনের জন্মে কেন আর তাকে কষ্ট দেওয়া? জীবন ত পড়েই আছে তাদের—শ্যামলীর ভবিষ্যৎত

অন্ধকার নয়—এক'টা দিন না হয় একটু কষ্টই করল। এ-কষ্ট শ্যামলী হাসিমুখেই সয়ে যেতে পারে সুন্দর ভবিষ্যতের কল্পনায়! কিন্তু সুদাস যে তাতে কষ্ট পাচ্ছে তার জন্মেই একেকসময় অস্থির হয়ে ওঠে তার মন।

ফাউন্টেন পেনের গোড়াটা দিয়ে ঠোঁট চাপতে লাগল সুদাস। হতেও পারে মাকে সত্যি ভালোবাসে শ্যামলী। যদিও চিঠির শেষ দিকে লিখেছে সে, মার প্রতি শ্রদ্ধা বা ভালোবাসা এ নয়—এ শুধু কর্ত্তব্যবোধ। 'একজন অসহায় নিরাশ্রয়কে তুমি পথের পাশে ফেলে চলে যেতে পারোনা, তোমার মনুষ্যত্বে বাধে। এ-ও তাই।' তা-ই কি? সুদাস ভাবতে থাকে। নিজের মা সম্বন্ধেও সুদাস কর্ত্তব্যের কথাই বলত। জোর গলায় প্রচার করত—পচা সেন্টিমেন্টের তাগিদে সে মার জন্মে কিছু করছেনা, যা কিছু করছে একজন নিরাশ্রয়, অসহায় মানুষের প্রতি কর্ত্তব্যবোধেরই খাতিরে। কিন্তু সে কি সত্যি? সেদিন তা সত্যি বলে মনে হলেও—আজকের স্বচ্ছ দৃষ্টি নিয়ে সে কি তাতে শুধু কর্ত্তব্য-বোধই দেখতে পায়? নিজের কাছে উত্তর জানতে চাইলে অকপটে কি মন তার স্বীকার করেনা যে মাকে সে ভালোবাসত? মাকে হারিয়ে কি হৃদয় তার ভালোবাসার আশ্রয়কেই হারিয়ে ফেলেনি? শূন্য হয়ে পড়ে নি কি মনের চারদিক? শুকনো হয়ে যায়নি হৃদয়ের স্নিগ্ধতা? একটা মরুভূমির উপর দিয়েই লক্ষ্যহীন হয়ে হেঁটে চলেছে তার সত্তা যতদিন না তা আবার মরূদ্যানের শ্যামল ছায়ার মতো করে পেয়েছিল শ্যামলীকে।

শ্যামলী তার মাকে ভালোবাসে। এখানে থাকতেও এ-কথা বুঝতে পেরেছিল সুদাস। মাকে নিজের স্বাধীন নিরাপদ আশ্রয়ে রাখবে বলেই ত অচেনা অজানা কলকাতায় আসবার সাহস হয়েছিল তার—নিজের জন্মে এই দুঃসাহসিকতা দেখায়নি শ্যামলী। সুদাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা তার আকস্মিক—তা না হলেও জীবনের ছক তার অপূর্ণ থাকতনা। এখন যে তার জীবনে সুদাস নেই তাতে কি

খুব বড়ো একটা অভাব অনুভব করছে শ্যামলী—? যে অভাববোধ সুদাসের রক্তমাংস স্নায়ুমন ছিঁড়েখুড়ে দিচ্ছে তার অর্দ্ধেকও শ্যামলীর মনে নেই। সুদাস শ্যামলীকে যত গভীর ভাবে পেতে চায়, শ্যামলীর সুদাসকে পেতে চাওয়া কি তত গভীর? হয়ত নয়। এ-প্রশ্ন নিজেকেও অনেক করেছে সুদাস, শ্যামলীকেও জিজ্ঞেস করেছিল একদিন। 'এর গভীরতা মাপবার ত কিছু নেই, যদি থাকত তাহলে দেখাতুম—' বলেছিল শ্যামলী। সুদাস খুসী হয়ে গিয়েছিল তখন। শ্যামলী একটু থেমে আবারও বলেছিল: 'সন্ধ্যার অন্ধকারে কোনো দীঘি দেখেছ? মনে হয়নি তার গভীরতা হয়ত পাতালে চলে গেছে? ঠিক তেম্নি আমার এ গভীরতা!' কি অদ্ভুত মানে ছিল তখন এ-কথাগুলোর! আর এখন? মনে হয় শুধু কথা—অর্থহীন, প্রাণহীন, হাস্যকর কতগুলো শব্দ! তাছাড়া আর কি? কতগুলো ফাঁকা, ফাঁপা কথার মানুষ আমরা—কথা দিয়ে নিজেদের সাজিয়ে রাখি, পরিচয় দিই—রক্তমাংসের পরিচয় নেই! তেমন করে ভালোই বাস্‌তে যদি পারত শ্যামলী সুদাসকে তাহলে মার কাছে থাকাটা ওর জীবনে বড়ো হয়ে উঠ্‌তে পারতনা কিছুতেই। না, স্বার্থপরতা নয়। জীবনের দাবী সবার উপর। জীবনের দাবী—আর্‌জ্‌ ফর লিভিং—বার্ণার্ডশ'র লাইফ ফোর্স সবকিছুকে উপেক্ষা করে ছুটে যায়—তাই স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিকতাকে নির্য্যাতন করে চলেছে মেয়ের দল, পবিত্র পারিবারিক খাঁচায় পোষা নিরীহ প্রাণীরা! নিজেদের হৃদয়ের চেয়ে আর সব কিছুই তাদের কাছে বড়ো!

বিদ্রূপে আবারও জ্বলে ওঠে সুদাসের চোখ। কলমের উপর আঙুলগুলো নিস্‌পিস্‌ করতে থাকে। শ্যামলীকে ক্ষমা করা যায়না কিছুতেই। যে বিষাক্ত গ্যাস জমা হয়ে উঠ্‌ছে তার মনে তাকে উজোর করে দিতে না পারলে বিপদ হবে সুদাসের। সমস্তটা দিন এক ফোঁটা কাজ করতে পারেনি সে। অস্থিরতায় ছটফট

করছে সমস্ত সময়। অথচ করবার মতো অজস্র কাজ—কাজের ঠাসবুনোনিতেই তৈরী হওয়া উচিত দিনগুলো। এই ত সময়। এইত সময় এসেছে বাঙালী ব্যাঙ্কগুলোর! হু-হু করে বেড়ে চলেছে ডিপোজিট—বিদেশী ব্যাঙ্কের উপর মানুষের অটল বিশ্বাস আজ প্রত্যক্ষভাবেই টলে উঠেছে। এ-সুযোগ ছাড়া যায় না। ব্যাঙ্ককে একটা সুদৃঢ় ভিত্তিতে নিয়ে পৌঁছে দিতে হ'লে এ-সুযোগের চুলের ঝুঁটি ধরতে হবে। কিন্তু তারজন্যে যে-পরিশ্রম, যে-উৎসাহ দরকার, চিন্তার যে শৃঙ্খলা দরকার সুদাস নিজের ভেতর কিছুতেই তা খুঁজে পাচ্ছে না। একটা সাংঘাতিক অবস্থায় এনে তাকে ফেলেছে শ্যামলী! ওইটুকু একটি মেয়ের চারদিকে নিজেকে এমন বিশ্রীভাবে জড়িয়েই বা ফেল্‌ল কেন সে? রাগ যদি সত্যি করতে হয়, নিজের উপরই রাগ করা উচিত তার।

ফাউণ্টেনপেনের মুখে ক্যাপ এঁটে সুদাস চিঠিটা ভাঁজ করতে সুরু করল। খুবই অসহায় মনে হতে লাগ্‌ল নিজেকে। এভাবে আরো কতো দিন চলতে হবে কে জানে? আর চলেও শেষটায় শ্যামলীকে পাওয়া গেলে ত! প্রতি মুহূর্ত্তেই মরে যেতে চায় মানুষের মন—পরের মুহূর্ত্তে নূতনভাবে বেঁচে উঠ্‌বে বলে,। সে-মনকে কতোদিন একটি ফিকে স্বপ্নে ঘেরাও করে রাখ্‌তে পারবে শ্যামলী, সুদাসও বা কতোদিন তা পারবে?

সুদাস কামরা ছেড়ে বেরিয়ে এলো। বিরক্ত মুখটাকে সচকিত করে জমাদার সেলাম ঠুক্‌বার চেষ্টা করতে না করতেই সুদাস তার পাশ কাটিয়ে চলে গেল। কিন্তু রাস্তায় পা বাড়াতে গিয়েই পা তার থেমে পড়্‌ল। শমীন। হঠাৎ এসময়ে? তাঁরই খোঁজে এখানে এসময়ে?

"তোর বাড়ি ঘুরে এখানেই এলুম—কথা আছে।"

"গাড়িতে আয়—" সুদাস এগিয়ে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে দাঁড়াল।

গাড়ির ভেতরে ঢোকবার খুব যেন ইচ্ছা ছিলনা শমীনের, সুদাসের ইচ্ছাতেই তবু সে ভেতরে গেল। ছুটতে সুরু করল গাড়ি। শমীন কালক্ষেপ না করে বললেঃ "কিছু টাকা দিতে পারিস—ডোনেশন।"

"ডোনেশন?" শমীনকে বুঝ্‌তে চেষ্টা না করেই সুদাস কথাটার উপর যেন ঠোক্কর খেল।

"প্রসেশন বা মীটিং অরগেনাইজ করতে টাকার দরকার হয়না?"

"ও" সুদাস স্তিমিত হয়ে রইল।

"কি বিরাট কাণ্ড চলেছে দেখ্‌তে পাচ্ছিস নে? গান্ধীজির শেষ কথার মর্য্যাদা রাখ্‌তে হবে ত!" উত্তেজনায় অদ্ভুত দেখাচ্ছিল শমীনকে, কথাগুলোও আশ্চর্য্য শোনাচ্ছিল।

"তোরা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিস?"

"আমরা বল্‌তে যদি অমুকে মনে করিস," ভালোছেলের লজ্জিত হাসি মুখে এনে বল্‌লে শমীনঃ "ও ভাষণ ক্ষেপে উঠেছিল। ক'দিন আগে ওর পরীক্ষার ষ্ট্রেন গেল, তাই আমি বাধা দিলুম!"

"তাহলে তুই একাই ঝাঁপ দিচ্ছিস?"

"ঝাঁপ? বল্‌তে পারিস।" একটু নাটকীয় ভঙ্গীতে মুখটা সরিয়ে নিয়ে শমীন মনে মনেই যেন বল্‌লেঃ "ডু অর ডাই।"

"'ডু' মানে ট্র্যাম পোড়ান নয় নিশ্চয়।" সুদাসের মাথায় সমালোচক জন্ম নিতে সুরু করল।

"কারো কাছে তা হ'তে পারে কিন্তু কংগ্রেসীদের কাছে নয়।"

"কিন্তু তার জন্যে ত দায়ী হবেন কংগ্রেসনেতা পরম সত্যাগ্রহী গান্ধীজী!"

"বুদ্ধিমানদের কাছে নিশ্চয়ই দায়ী হবেন না। নেতারা বিপ্লব উস্কে দিতে পারেন—পরিচালনা তাদের হাতে নয়। বিপ্লব জন্ম নিয়ে তার নিজের ধর্ম্মেই চল্‌তে থাকে—জনমনই সে-ধর্ম্মের জন্ম দেয়।" শমীন হঠাৎ চুপ করে গেল। মনে হল তার, গুছিয়ে যেন

কোনো কথা এখন আর বলতে পারবে না। গুছিয়ে কথা বলার সময় নয় এখন।

সুদাসও চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। পাশের শমীনকে ভুলে আন্দোলনের আবহাওয়ায় শমীনের মূর্ত্তিকে খুঁজতে সুরু করল তার চিন্তা। অনুর কাছ থেকে বিদায় নেওয়া, শোভাযাত্রা পরিচালনা, তারপর বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়িয়ে দুঃসাহসিক বক্তৃতা—সবগুলো দৃশ্যেই বিপ্লবীর অদ্ভুত উদ্দীপনায় শমীনের মুখ উজ্জ্বল। মুখ তার উজ্জ্বল আরেকটি মুখ উজ্জ্বল করে তুল্‌বে বলে—সে-মুখ কোনো কংগ্রেস নেতার নয়, দেশের নয়, সাধারণ একটি মেয়ের—অনুর। সাধারণ একটি মেয়ের জন্যে সাধারণ একটি ছেলে অসাধারণ হয়ে উঠতে পারে। অসাধারণ হয়ে উঠ্‌বার লগ্ন এসেছে শমীনের। সাধারণ মানুষের এই অসাধারণ লগ্নগুলো কুড়িয়েই দেশের আর সমাজের ভাণ্ডারে জড় হয়ে ওঠে গৌরবের পুঁজি। অবিশ্বাসী, শ্লথ মন নিয়ে সুদাসও হয়ত এমন একটা দুঃসাহসিক কাজ করতে পারত—ব্যক্তির সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে নিজেকে মুক্ত করে নিয়ে বিলিয়ে দিতে পারত সমাজের বা দেশের প্রসারিত পরিধিতে—যদি তাতে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ত শ্যামলীর মুখ। যে মেয়েকে তুমি ভালোবাস সে তোমাকে অনেক নীচে নিয়ে যেতে পারে আবার পৌঁছে দিতে পারে অনেক উঁচুতে। শমীন ভাগ্যবান। অনু তাকে নীচে টেনে নিতে চায়না—নিতে চায় এত উঁচুতে যা শমীনের কাছেও হয়ত বিস্ময়কর।

"তাহলে এবার জেলেই যাচ্ছিস্?" সামনের দিকে তাকিয়ে ভারি গলায় বল্‌লে সুদাস।

"নেতাদের আটক করে রাখার প্রতিবাদ জানাব না?"

"জানাবিনে একথা কি আমি বল্‌ছি?" সুদাস ম্লানভাবে হেসে বল্‌লে: "ভাব্‌ছি এটা বাড়াবাড়ি হচ্ছে কি না।"

"বুদ্ধির সূক্ষ্মদৃষ্টিতে অনুভূতির সব ব্যাপারই বাড়াবাড়ি।"

"আমার ত মনে হয় গান্ধীজির ইচ্ছা নয় কোনো আন্দোলন হোক।"

"কম্যুনিষ্টদেরও তা-ই মনে হচ্ছে!"

"তাই না কি? তাহলে ত তাদের বুদ্ধিমান বলতে হবে!"

"নিশ্চয়।" শমীন হাসতে লাগল: "কিন্তু মুস্কিল কি জানিস্ সমাজটা বুদ্ধিমানদের পোষ্য নয়, বুদ্ধিমানদের সতর্ক পাহারায় থাকতে তা নারাজ তাই সেখান থেকে বিগড়ে সমাজের মন আবেগের স্থূল আশ্রয়ে গিয়ে মাঝে-মাঝে উপস্থিত হয়।"

আবারও চুপ করে গেল সুদাস। তাদের গাড়ি চৌরঙ্গী পার হচ্ছে। জনহীনতায় নিষ্প্রাণ চৌরঙ্গী। বিশুষ্ক, বিশীর্ণ কলকাতার চেহারা। কিন্তু এই বিশুষ্ক দেহেও কোথায় যেন বেঁচে আছে প্রাণ। ১৯২১ বা ১৯৩০-এর প্রাণ না হোক তবু সে প্রাণেরই উত্তরাধিকার রক্তের ক্ষীণস্রোতে যেন আবিষ্কার করা যায়। বন্দেমাতরম্ ধ্বনির সঙ্গে ফিরে এসেছে আবার সেই উৎকণ্ঠা, সেই সাহস, সেই রহস্য! কিন্তু হয়ত বড় দুর্ব্বল এই প্রাণের উৎসাহ। ভঙ্গুর, বাঁচতে পারবেনা বেশিদিন!

"আমেদাবাদ নির্মক্ষিক—টাটার আগুন নিভে গেছে—" প্রাণের সেই উত্তরাধিকার ফুটে উঠল শমীনের চোখে।

"তার মানে পুরোপুরি বুর্জ্জোয়া ডেমোক্র্যাটিক রিভলিউশন?" কাচের জানালার উপর চোখ রেখেই বললে সুদাস—বিকেলের আলো জানালার কাচ থেকে ঠিকরে যাচ্ছে তার মুখের উপর।

"তা জানিনে। সোজা কথা বুঝি যে সমগ্র ভারতবর্ষেরই বিপ্লব এটা।"

"হয়ত।"

"তোর সন্দেহ আছে?"

"সন্দেহ নয়—একটা কথা শুধু বলবার আছে—বাংলাদেশ এ বিপ্লবে নেই।"

"কথাটা ত সত্য না-ও হতে পারে।"

"তোর কাছে কথাটা সত্য নয়, আমার কাছে সত্য।"

শমীন চুপ করে আছে বলে সুদাস মুখ ফিরিয়ে তাকাল শমীনের দিকে: "যুদ্ধের ভয় আর টাকার লোভ—এ দুটো বস্তু ছাড়া আর কিছু আজ আছে বাংলাদেশে? যুদ্ধের ভয়কে যারা জয় করতে পেরেছে তারা স্বাধীনতা চায়না, টাকা চায়।"

শমীন চুপ করেই রইল।

"আর টাকাও যারা চায়না তারা চায় জনযুদ্ধ।"

একটা বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠল শমীনের মুখে। 'জনযুদ্ধ' কথাটা অবিরত শুনতে হচ্ছে প্রবীরের মুখে। প্রবীর বলে আজকের দিনে একমাত্র যুক্তিপূর্ণ পলিটিক্যাল শ্লোগান না কি ওই কথাটা। কংগ্রেসেরও কারো কারো সমর্থন নাকি আছে ওই শ্লোগানে। রাজাজির নাম করে প্রবীর বলে, স্বাধীন মতামত দিতে হলে জওহরলালও ও-কথাই বলতেন। আজ না-হয় ক্রীপস্-অফার ঠেলে দিয়ে কংগ্রেস 'কুইট ইণ্ডিয়া' শ্লোগান নিয়েছে, কিন্তু একবছর আগেওত জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করার সঙ্কল্প ছিল—তখনকি জনযুদ্ধের শ্লোগান ছিলনা কংগ্রেসের? সে অবস্থা ত পাল্টে যায়নি—সমস্ত ব্রহ্মদেশে এখন জাপানের হাতে—চাঁটগার সীমান্তে এসে পৌঁচেছে হলদে ফ্যাসিষ্টরা। জনযুদ্ধের প্রয়োজন এখনি সবচেয়ে বেশি গৃহযুদ্ধের সময় এ নয়। দার্শনিকের উঁচু আসনে বসে প্রবীর অনেকদিনই অজ্ঞ শমীন আর অনুকে আলো দিতে চেয়েছে। অনু প্রবীরের কথার শেষে হেসে লুটিয়ে পড়ে বলেছে: 'তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে এনে আমার খুব আক্কেল হয়েছে বড়দা—বিপ্লব-টিপ্লব ভুলে ঠাণ্ডা গেরস্থ হয়ে গেলে!'

'মার্ক্সবাদী হলেই যে অষ্টপ্রহর বিপ্লবের আগুন জ্বেলে রাখব ও তোদের ভুল ধারণা। বিপ্লবের একটা অবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যন আছে। যখন-তখন হৈ-হৈ করে ওঠা মার্ক্সীয় পদ্ধতি নয়।'

'অবজেক্টিভ কণ্ডিশ্যন কাঁচা কি পাকা তার বিচার করবে কে?' শমীন বলেছিল।

'মার্ক্সবাদীর দৃষ্টিতেই ওটা সহজে ধরা পড়ে।'

শমীন সেদিন মনে-মনে সুদাসকে স্মরণ করেছিল—এই যুদ্ধের প্রহরে-প্রহরে তার রং মার্ক্সবাদীর দৃষ্টিতে কেমন করে বদলাতে পারে বা যাদের চোখে তা বদলায় তারা মার্ক্সবাদী কি না, এ ধরণের আলোচনায় পা বাড়াবার ক্ষমতা নেই শমীনের, সুদাসই তা করতে পারে। প্রবীরের মার্ক্সবাদ সুদাসের সামনে খানিকটা সন্ত্রস্তই হয়ে থাকে। কিন্তু আজ সন্দেহ হচ্ছিল শমীনের সুদাসও যেন প্রবীরের মতামতেই সায় দেবে। কই, জনযুদ্ধের প্রসঙ্গে সামান্য একটু বাঁকা হাসিও ত দেখা গেলনা সুদাসের ঠোঁটে!

"প্রবীর খুব জনযুদ্ধে মেতেছে, না রে শমীন?" প্রত্যাশিত বাঁকা হাসি দেখা গেল সুদাসের ঠোঁটে।

"তোর সঙ্গে দেখা হয়না?"

"না-ত! আমাকে হয়ত মনে করে পুঁজিবাদী! মানুষের পুঁজির তহবিলদার হয়ে পুঁজিবাদী আখ্যা পাচ্ছি—মন্দ নয়।"

"কিন্তু সত্যিকারের পুঁজিবাদীর সঙ্গে ত ওর বেজায় দহরম-মহরম।"

"মানে?"

"মহীর সঙ্গে।"

"তাই না কি?" সুদাস হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল: "মহী খুব ভালো করছে। যুদ্ধের শেষে দেখা যাবে ওর মিল দাঁড়িয়ে গেছে। স্পিনিং এরেঞ্জমেণ্টটা করে ফেলতে পারলেই হয়ে গেল।" চোখে কৌতুক ফুটিয়ে তুলে বললে: "মহীর কাছ থেকে ভারি হাতে নিয়ে নে না কিছু—"

"মহীর কাছ থেকে? না—"

"দোষ কি?"

"ওর সঙ্গে দেখাশুনা নেই অনেককাল। তাছাড়া হয়ত জনযুদ্ধওয়ালা হয়ে গেছে—"

"হয়ত হয়নি।"

"তাহলে ওর সঙ্গে প্রবীরের এতো দরকার থাকতনা।"

"ভুলে যাস কেন প্রবীরেরও একটা পার্টি আছে আর সে পার্টিরও টাকার দরকার।"

শমীন হেসে উঠল। হাসির শেষে মনে হ'ল তারও টাকারই দরকার, সুদাসের সঙ্গে গালগল্প করার দরকার নেই। কালিঘাট পেরিয়ে যাচ্ছে গাড়ি। টাকাটা যদি দিয়ে ফেলত সুদাস অনেক আগেই নেমে যেতে পারত সে। অনুর সঙ্গে দেখা করে ফিরতে হবে মেসে—ভবানীপুর। বাড়ির সুখ নেই আর। অবশ্যি শমীনই আগ্রহ করে বাবা আর মাসীকে পাঠিয়ে দিয়েছে দেশে—শরৎবাবুর একটু বোমার ভয় ছিল, শমীনই ওটাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে মস্ত একটা আতঙ্ক করে তুলেছে। অমিতাকে শরৎবাবুর বন্ধন থেকে মুক্ত করা দরকার। দেশে না গেলে অমিতার আর সে-মুক্তি নেই। অমিতা সম্বন্ধে নরম হয়ে গেছে শমীনের মন। তাছাড়া মেসের আশ্রয়ে স্বদেশী আন্দোলনের ইচ্ছাটা মনে-মনে জমে ভালো। ক্রীপ্‌সের পোষ্টডেটেড চেকের দিন থেকে সুরু করে শমীন নিজেকে তৈরী করে চলেছে।

"এখানেই নাব্‌ছি আমি"—রাসবিহারী এভিন্যুর মোড়ে এসে বল্‌লে শমীন।

"সে কি? বাড়ি চল।"

"কাজ ছিল।"

"তা-ত আছেই আর থাক্‌বেও। মাঝখানে একটু অকাজ করে গেলে ক্ষতি নেই।"

"আরেকদিন না হয় আসব।"

"দেখা আর না-ও হতে পারে।"

"চারছয় মাস জোর একবছর। একবছর জেল সইবে।"

"তা যদি সয়, আমার সঙ্গেও এক আধঘণ্টা সইবে।"

শমীন হাসতে লাগল। সুদাসেরও হাসা উচিত ছিল—কিন্তু হাস্‌তে পারলনা সে।

অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে আছে সুদাস আর শমীন। টেবিলের উপর দুকাপ চা, একটা সিগারেটের টিন। গ্রাউণ্ড গ্লাসের শেড দেওয়া আলো একটু রহস্য সৃষ্টি করেছে আবহাওয়ায়। সেই নরম আলোতে সুদাস আর শমীনকে আজকের দিনের সুদাস আর শমীন বলে চেনা যায়না—ওদের চোখমুখ শরীর থেকে অনেকগুলো বছরের রূঢ় গ্লানি যেন ঝরে ঝরে কোথায় মিলিয়ে গেছে।

শমীনকে সামনে নিয়ে কলেজে পড়ার দিনগুলোর কথাই ভাবছিল সুদাস। যে আকর্ষণ আর ভালোবাসা ছিল তখন তাদের মধ্যে এখন আর তা নেই। সে মন কোথায় হারিয়ে গেল? কবে হারিয়ে গেল বুঝতে ত পারলনা সুদা ! পেছনের গাঢ় অন্ধকার থেকে আজ আবার হঠাৎ সে মনের ঝিলিমিলি উঁকি দিয়ে যাচ্ছে সুদাসের মনে; কোথায়, কোন্ দুর্গম অভিযানে চলেছে শমীন—হয়ত এমনি অন্ধকারাচ্ছন্ন সে-ভবিষ্যৎ যে সেখান থেকে শমীনকে আর খুঁজে পাওয়া যাবেনা ! শমীনের জন্যে ব্যথিত হয়ে উঠ্‌ছে সুদাসের হৃদয়—আশঙ্কায় চঞ্চল হয়ে উঠ্‌ছে মন। শমীন যেন হারিয়ে যেতেই চলেছে কোথাও। যেমন করে শ্যামলী হারিয়ে গেল, শমীনও হয়ত ঠিক তেমনি হারিয়ে যাবে। মানুষের জীবন কখন কোন্ খাতে বয়ে যাবে সে কথা আগে থেকে বলা যায়না—বিজ্ঞানের দূরবীক্ষণও সেখানে ব্যর্থ। মানুষের হাতে এমন কিছু নেই, বিজ্ঞান বা দর্শন এমন কোনো রঞ্জনরশ্মি মানুষের হাতে তুলে দেয়নি যা দিয়ে ভবিষ্যতের পথে আলো ফেলা যায়। মার্ক্সবাদীরা

বলে নিজের হাতে ভবিষ্যৎ তৈরী করে নেবে তারা। মতের অনেক জোর আর আশা দিয়ে তৈরী এ-কথা। শুন্‌তে ভালো লাগে। ইচ্ছে হয় পরীক্ষা করতে। সুদাস পরীক্ষা করতে চেয়েছিল। মনের মতো করে ভবিষ্যৎ তৈরী করবার ইচ্ছে ছিল সুদাসের। তৈরী হতেও সুরু হয়েছিল সে-ভবিষ্যৎ। কিন্তু সে কি জান্‌ত শ্যামলী হারিয়ে যাবে? ভবিষ্যতের ছবি ভাঙতে সুরু করেছে সুদাসের মনে। ভবিষ্যতের অন্ধকার তাকে ভয় দেখাতে সুরু করেছে। সুদাস দুর্ব্বল হয়ে পড়ছে।

"অনু বল্‌ছে তোকে আন্দোলনে যোগ দিতে?" নিজের ভীরুতার খানিকটা অংশ অনুর উপর চাপিয়ে দিতে চাইল সুদাস।

"অনু কি বল্‌বে? আন্দোলনে যোগ দেওয়াটা আমার পক্ষে স্বাভাবিক। অনু বাধা দেয়নি, এই মাত্র!"

"তাছাড়া নিজেও ও যোগ দিতে চেয়েছিল! তার মানেই তার সম্মতি আছে?"

"তার সম্মতি না থাক্‌লেও আমাকে যোগ দিত হ'ত। চাঁদার খাতায় নাম-তোলা নামে মাত্র কংগ্রেসী আমি নই।"

"কিন্তু স্বনামধন্য অনেক কংগ্রেসীই আন্দোলন থেকে সরে আছেন।"

"যেহেতু তাঁরা স্বনামধন্য! ওয়ার্কিং কমিটির আমন্ত্রণ পেতে হবে তাঁদের তারপর পালিয়ামেণ্টারী বিতর্কের ভেতর দিয়ে ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্ত পরিশুদ্ধ করে নেবেন—তারপর—"

"তারপর খানিকটা সময় নিয়ে দেখ্‌বেন হাওয়া কোন্‌দিকে বইছে—তা জানি।" সুদাসের মুখে আবছা হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

"এসব ব্যাপারে বাবা অনেকটা পরিষ্কার। সোজাসুজি বলেন কংগ্রেসের রঙ একদিন গায়ে ছিল, এখন চামড়া তুলে ফেল্‌লেও সে-রঙ খুঁজে পাবেনা।"

"আর কিছুর জন্যে না হোক নিজেদের মধ্যে বিরোধের জন্যেই বাংলায় কংগ্রেসী আন্দোলনের শিকড় ছড়াবে না।"

"কোনদিনই বাংলাদেশে কংগ্রেস-আন্দোলনের ফসল ফলেনি। কিন্তু তাতে ক্ষতি হয়েছে কার? বাংলাদেশেরই। সেই ক্ষতিপূরণ আমাদের করতে হবে। রাষ্ট্রীক চেতনায় ভারতবর্ষ থেকে আলাদা হয়ে বাঁচা যে আমাদের পক্ষে লাভের নয় এ কথাটাই বুঝ্তে এবং বোঝাতে হবে।"

"কিন্তু যে-আঘাত দুবছর আগেও কংগ্রেস বাংলাকে দিয়েছে তার ব্যথা ভুলে যেতে বাঙালীকে খানিকটা সময় দেবে ত?"

"ওটা আঘাত নয়, দলের নিয়ম আর শৃঙ্খলা রক্ষা।"

"বাংলাদেশের অব্জেক্টিভ কণ্ডিশ্যনটা উপলব্ধি করে যদি কংগ্রেস তার উপর আইনকানুন জারি করে তাহলে কারো কোনো আপত্তি থাকেনা। এই নিয়ম আর শৃঙ্খলা রক্ষার ফল কি দেখা যাচ্ছে আজ? কংগ্রেস-বিরোধী যতগুলো দল ভারতবর্ষে আছে, বাংলাদেশের মাটিকে উর্ব্বর পেয়ে সবাই তারা নিশ্চিন্তমনে সমৃদ্ধ হয়ে উঠ্ছে এখানে!"

"বেশি বুঝ্বার অভিমান যে-দেশের থাকে সেখানেই প্রতিক্রিয়াশীলতার প্রাদুর্ভাব হয়—নাৎসী জার্ম্মেণীও তার একটা প্রমাণ।"

"কম বোঝার দেশগুলোর প্রগতি হয় বটে কিন্তু তাহলেও বেশি বোঝার দেশের নাগাল তারা পায়না। বাংলাদেশকে নাগাল পেতে ভারতবর্ষের অনেক উঁচুতে উঠ্তে হ'বে। বোম্বে বা আমেদাবাদ মিলের চিমনিগুলো সেই উঁচুর রাজ্যের সন্ধান পায়নি!"

"তোর বাংলা-ভক্তি অভূতপূর্ব্ব না হলেও প্রশংসনীয়।"

"মনে করতে পারিস শমীন, আমি আদর্শবাদীর মতো কথা বল্‌ছি। আমি আদর্শবাদী নই—কোনো বিমূর্ত্ত ভাবের জন্যে আমার আবেগ নেই—আমার আবেগ বস্তুর সঙ্গে জড়িত।

বাংলাদেশ অনেক কিছু করেছে, আমি বল্‌তে চাই ভারতবর্ষের সে কৃতজ্ঞতা থাকা উচিত। আর বাঙালী হিসেবে আমি মনে রাখতে চাই, আমাদের হাতে যেন বাংলার ঐতিহ্য নষ্ট না হয়।"

"বাঙালী হিসেবে আমিও এ-কথা মনে রাখি। কিন্তু তার চেয়েও বেশি মনে রাখি একথা যে প্রাচীন গৌরবই যেন আমাদের একমাত্র সম্বল না হয়। নতুন দিনকে নতুন ভাবে উপহার দেবার মতো শক্তি যেন আমাদের থাকে!"

সুদাসের কানে শমীনের কথাগুলো প্রতিজ্ঞার মতো শোনাল। কঠোর প্রতিজ্ঞা। মনে হল কোনো অতীতের ধূসর জগতে যেন বসে আছে সুদাস, যেখানে মানুষ অকরুণ প্রতিজ্ঞায় জীবনকে মৃত্যুর হাতে সঁপে দিত। সেই অদ্ভুত জগতের প্রাণবন্ততা শমীনের কণ্ঠে। কি করে পেল শমীন এই বলিষ্ঠতা? শমীন, সুদাসের বন্ধু শমীন, ১৯৪২-এর ২৮শে আগষ্ট এই সাহসোজ্জ্বল মুখ, এই প্রদীপ্ত উৎসাহ কি করে পায়? অভিভূতের মতো তাকিয়ে রইল সুদাস শমীনের মুখের দিকে।

"তাহলে আমি যাচ্ছি, সুদাস—" একটু হেসে যেন সুদাসের চোখকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দিল শমীন: "টাকা-টার জন্যে তোকে অনেক ধন্যবাদ!"

"ধন্যবাদ পাব জান্‌লে টাকাটা দেবার সময় বল্‌তুম ওটা তোকেই দিচ্ছি আর কিছুর জন্যেই নয়।"

"টাকাটা যে আমাকে দিচ্ছিস এ-কথা ত মিথ্যা নয়—"

"কংগ্রেসকে দিচ্ছিনে কথাটা সত্যি।"

"তাতেও কংগ্রেসের ক্ষতি নেই। ব্যক্তি ত তুচ্ছ, শ্রেণী আর দলের উর্দ্ধে তার স্থান।"

"মানে ভাব-রাজ্যে?"

"ক্ষতি কি? ভাবটা জাতিরই মন থেকে উৎসারিত—কারো শেখানো স্বপ্ন নয়।"

"ভুল করিস নে—আমি শেখানো স্বপ্নের স্বাপ্নিক নই।"

"তা আমি জানি।" শমীন উঠে দাঁড়াল।

"আরে—" সুদাস দরজার দিকে তাকিয়ে আঁৎকে ওঠার মতো করে বল্‌লে। পেছন ফিরে তাকাল শমীন। প্রবীরকে দেখা গেল দরজায়।

"অমুকে ধরে নিয়ে গেছে।" দৌবারিকের ভঙ্গীতে বললে প্রবীর।

শমীনের মুখের দিকে তাকাবার সাহস সুদাসের হলনা, উৎকণ্ঠ হয়ে জিজ্ঞেস করলে প্রবীরকেই: "তার মানে?"

ঘরের ভেতরে এসে প্রবীর বসবার জায়গাটা দুবার বদলে তৃতীয় একটা জায়গায় আরাম খুঁজে নিলে। চোখ দিয়ে প্রবীরকে অনুসরণ করতে লাগল সুদাস—শমীন কুশনের খোঁদলে এম্নি ডুবে গেল যেন তার অস্তিত্ব নেই।

"য়ুনিভার্সিটি না কোথায় কি একটা বক্তৃতা দিয়েছিল—মাথাখারাপ—" টিন থেকে একটা সিগারেট তুলে নিল প্রবীর।

"মাথা খারাপ নয়। কিন্তু বক্তৃতার জন্যেই ধরা পড়লে? শুধু বক্তৃতার জন্যে?" সুদাস প্রবীরের এই সংক্ষিপ্ত ধরণের কথায় কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছিলনা।

"কিছু অর্গেনাইজ করছিল হয়ত ভেতরে ভেতরে—শমীনকে জিজ্ঞেস করলেই জানতে পারবি!" নির্ব্বিকারভাবে সিগারেট ধরাতে সুরু করলে প্রবীর।

"আচ্ছা, চলি আমি সুদাস—" একটা স্বপ্ন ভেঙে হঠাৎ যেন জেগে উঠল শমীন: "চলি, কেমন?"

"শুভাস্তে পন্থানঃ সন্তু—" সুদাস ম্লানভাবে হাসতে লাগল।

দোর থেকে বলে গেল শমীন: "দুর্গমপথস্তৎ কবয়ঃ বদন্তি—"

সুদাস শূন্যদৃষ্টিতে সেদিকে তাকিয়ে রইল খানিকক্ষণ, কান পেতে যেন শুন্‌তে লাগল শমীনের কথার ধ্বনিগুলো। সত্যি,

সে-পথ দুর্গম। কিন্তু তোমার কাছে তা দুর্গম হবেনা। পথের শেষে যে অপেক্ষমানা তার চোখের স্নিগ্ধতায় মুছে যাবে তোমার পথের ক্লান্তি, দুর্গমতার গ্লানি। অনেকদিনের গ্লানি মিলিয়ে যাবে একটি মধুর মুহূর্ত্তের সীমায় এসে। পথ তোমার দুর্গম নয়, বন্ধু, শুভঙ্কর পথ তোমার। মনে-মনে যেন আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করল সুদাস!

"ওরা একদম ক্ষেপে গেছে—কিছুতেই ওদের থামানো যাবেনা—যুক্তির বালাই নেই ওদের—" প্রবীরের কথাগুলো তেমন অভি-ভাবকের মতোই শোনাল ভাবনার বালাই যার নেই।

"থামাবার জন্যে তুইও বা ক্ষেপে উঠেছিস কেন?" নিজেকে খুব বেশিরকম সাম্‌লে নিল সুদাস।

"এখন জেলে যাবার কোনো মানে আছে? একটা লোককে আত্মহত্যা করতে দেখলে তুই তাকে বাঁচাবি নে?"

"সমাজের এমন শুভসাধনা করবার ভার পেয়েছিস কবে থেকে?"

"ভার নেবার কেউ যখন নেই—কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যখন জেলে—অগত্যা দেশকে বাঁচাবার ভার আমাদেরই নিতে হবে!"

"তার মানে তোরা ছাড়া আর সবাই বোকা।"

"কেবল আমরা কেন, কংগ্রেসও আন্দোলন করতে বলেনি।"

"তোর এ-কথাটার উত্তর আজই শমীন আমার কাছে দিয়ে গেছে। কথাটা অত্যন্ত সত্যি বলে তোর শুনে রাখা ভালো। বিপ্লব যেমন স্যুটকেসে করে চালান দেওয়া যায়না তেম্নি তা নেতার তুড়িবাজিতেই জ্বলে ওঠেনা। তোদের ফেব্রুয়ারি রুশ-বিপ্লবের সময় নেতারা কোথায় ছিলেন নিজেই ভেবে দেখিস!"

"*সেদিনের রাশ্যার সঙ্গে আজকের দিনের ভারতবর্ষের তুলনা দিয়ে লাভ নেই—ইতিহাস অনেক বদ্‌লে গেছে। আবেগময় জনসাধারণের খামখেয়ালিপনা ছাড়া এ আন্দোলন আর কিছু*

নয়। জনসাধারণের বিক্ষোভ সত্যিকার যুক্তিপূর্ণ পথে পরিচালনা করাই আমাদের কাজ। ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লড়াই-এ সঙ্ঘবদ্ধ করতে হ'বে জনগণকে!"

"তারপর কি তুই আমায় জনযুদ্ধের থিওরী শোনাবি?"

"শুনে রাখলে কি দোষ?"

"দোষ এই যে তোর উপর পর্য্যন্ত বিরূপ হয়ে উঠতে পারে মন।"

"তাহলে তা তোর মনের অপরাধ। যুক্তিটা মানুষের সহজে রোচে না!"

"ধার করা যুক্তি শুনলে সত্যি খুন চেপে যায়।"

"ধার করা যুক্তি?" প্রবীর সিগারেটের ধোঁয়ার সুগন্ধে আচ্ছন্ন হয়ে যেন বলতে সুরু করলে—কোনো উত্তাপ অসহিষ্ণুতা বা অধৈর্য্য নেই তার গলায়—"দেশ রক্ষার সমস্যা, জাতীয় মুক্তির সমস্যা কি আজ একটা নূতনরূপে দেখা দেয়নি, দাসু? এ-সমস্যার সমাধান কি আত্মঘাতী আন্দোলন করে ফ্যাসিষ্টদের ভারতবর্ষে নিয়ে আসা? এই ফিফ্‌থ্‌ কোলাম-সুলভ ভাবনায় অনেকেই কিন্তু মশগুল। সুবীর বাইরে থাক্‌লে হয়ত এ-ভাবনাই ভাব্‌ত। এ ধরণের ভাবনা যাদের দেশের তারা যে হিতাকাঙ্ক্ষী নয় একথা তুই নিশ্চয়ই মানবি।"

"তোরাই দেশের হিতাকাঙ্ক্ষী, তোদের ভূমিকাটা কি তা-ই শুনতে চাই!"

"এই নূতন সমস্যার সমাধান হ'তে পারে জনগণের সঙ্ঘবদ্ধতায়, ফ্যাসিষ্ট প্রতিরোধে। ফ্যাসিষ্ট প্রতিরোধী জনশক্তির কাছে স্বাধীনতা হাতের আমলকির মতো।"

"যে জনগণ একমাস চরকা কাটার খাটুনি নিয়ে স্বাধীনতা আনতে চায়না—তাদের তোরা সঙ্ঘবদ্ধ করবি ফ্যাসিষ্টদের বিরুদ্ধে লড়াই-এ? এ-লড়াই তোদের কে শেখাচ্ছে রে প্রবীর—লেফ্‌টেন্যান্ট, ফিল্ড মার্শাল, জেনারেল এঁরা কারা?" সুদাস কঠোরভাবে হেসে উঠল।

প্রবীর বিচলিত হলনা: "চাটগাঁর গাঁয়ে-গাঁয়ে আমাদের লোক কাজ করে বেড়াচ্ছে। হাতিয়ার নাইবা থাকল—গেরিলা যুদ্ধ করা ত আমাদের পক্ষে সম্ভব!"

"হাবসী নিধিরামদের মতো?"

"তা কেন? লালচীনের মতো।"

"ভুলে যাসনে চীন স্বাধীন দেশ।"

"কিন্তু একথাও আমাদের ভুললে চলবেনা কলোনিয়্যাল অধীনতার চেয়ে ইন্টারন্যাশনাল অধীনতা অনেক মারাত্মক।"

"কলোনিয়্যাল অধীনতা উপলব্ধি করছি, তার মারাত্মকতাটাও তাই বুঝতে পারি কিন্তু সেই অনাগত ভবিষ্যতের ব্যথা হৃদয়ঙ্গম করবার মতো সিক্সথ্ সেন্স আমার নেই!"

"তোর কথাগুলো হতাশার সুরে ভরা। এই হতাশা নিয়ে কি জাতি চলতে পারে? জাতিকে কর্ম্মঠ করে তোলা দরকার, জাতির মনে আশা জাগিয়ে তোলা দরকার।" প্রবীর নড়েচড়ে বস্‌ল: "এক-কাপ চা খাওয়া উচিত—সীধু—এক কাপ চা দে বাবা—"

"মন যখন ব্যথায় মুষড়ে থাকে তখন তাকে কর্ম্মঠ করে তোলবার চেষ্টা একদম বাজে। একথা নিশ্চয়ই তুই ভালো করে জানিস!" সুদাসের মুখে মেঘ ঘনাতে সুরু করল: "হৃদয়ের আঘাতে মার্ক্সবাদীও মার্ক্সবাদ ভুলে যায়—এ-কথা কি মিথ্যা?"

প্রবীর হাস্‌তে সুরু করল। হাসিটা যে-রকমই হোক আলোর স্নিগ্ধতায় তা করুণই মনে হল। কিন্তু তাতেও সুদাসের মন নরম হয়ে এলোনা। সুবীরকে না হয় ভুলে থাকা যায়, অনুকে কি করে মন থেকে মুছে ফেলতে পারে প্রবীর? বোনের অজস্র ভালোবাসা যে-মতবাদের কাছে তুচ্ছ হয়ে যায়, সুপ্রভার মৃত্যুর পর সে-মতবাদ তার কোথায় ছিল?

"প্রবীর—"সুদাসের গলা কর্কশ হয়ে এলো: "হৃদয় দিয়েই হৃদয়ের শুশ্রূষা করতে হয়—কথার চাবুক মেরে নয়। তোমাদের

শ্লোগান আজ সমস্ত দেশের কানে চাবুকের আওয়াজের মতোই শোনাচ্ছে। জনযুদ্ধ চালাবার আগে জনমনকে বুঝতে চেষ্টা করিস।"

"জনমন যে আজ কি অবস্থায় আছে তা কি কারো অজানা আছে? ব্যথিত মনকে বাঁচবার ইঙ্গিত দেওয়াও কি অপরাধ? আজ যে বাংলাদেশের সমস্ত সাহিত্যিক ফ্যাসিষ্ট-বিভীষিকায় সচেতন হয়ে উঠেছেন সে ত দেশের প্রতি তাঁদের দরদ আছে বলেই! বাংলাদেশের রোমান্টিক সাহিত্যিকদেরও আমরা রাষ্ট্র-সচেতন করে তুল্‌ছি। বাংলাদেশের শিক্ষিত শ্রেণী—শিক্ষক, অধ্যাপক এঁরা সবাই আজ বুঝ্‌তে পারছেন আমাদের শ্লোগানেই দেশকে বাঁচিয়ে তুল্‌তে হবে!"

"জেলের ভয়ে পলিটিক্সের রং যারা মনে মাখতে পারেনি, মনের গোপন সাধ মেটাবার জন্যে এবার তারাই এসে ভীড় করছে তোদের দলে!"

"কিন্তু এ-দল সবচেয়ে বিপ্লবী—"

"বিপ্লব কথাটাকে অপবিত্র করিসনে, প্রবীর—"

"ওটা তোর রাগের কথা হ'ল দাস্থ—"

"রাগের কথাই। এমন বীতরাগ প্রশান্ত মন নয় আমার যে তোদের কথা অনেকক্ষণ সহ্য করতে পারব।"

"তাহলে এ-নিয়ে আলাপ না করাই ভালো।"

"বোধ হয় ভালো।"

প্রবীর সিগারেটের টিনের লেবেলটা খুঁটতে সুরু করল। অস্বাভাবিক গম্ভীর দেখাচ্ছিল তাকে, সুদাসের ইচ্ছা করছিল ওখান থেকে উঠে আসে। এ অভদ্রতার জন্যে নিজেকে তৈরী করে নিতে সময় লাগ্‌ছিল খানিকটা। সীধু চা নিয়ে এলো। বিশ্রী আবহাওয়াটা চায়ের আবির্ভাবে কিছুটা সহনীয় হয়ে উঠ্‌বে মনে হল সুদাসের। প্রবীর নিঃশব্দে চায়ে চুমুক দিতে লাগল।

প্রবীরের উপস্থিতিটাকে মন থেকে মুছে ফেল্‌তে চেষ্টা করল

সুদাস। প্রবীরের ছায়ার বদলে সেখানে অন্য কারো ছায়া ফেলা দরকার। ভালো লাগ্‌ছিল শমীনকে ভাবতে। কলেজে-পড়ার দিনগুলোই এক ঝাঁক পাখীর কতো উড়ে আস্‌ছে মনে। সেখানেও প্রবীর। কিন্তু এ-প্রবীরের সঙ্গে সে-প্রবীরের কতো তফাৎ! প্রাণের অফুরন্ত উৎসাহই শুধু তার ছিল তখন যুক্তির জটিলতায় অন্ধকার হয়ে ওঠেনি মন। আজও সে-প্রবীর বেঁচে থাকলে অন্যায় হতনা কিছু। সমাজের বা দেশের খুব বেশি অপকার হত না নিশ্চয়।

"আচ্ছা—" একটা সিগারেট তুলে নিয়ে প্রবীর দাঁড়িয়ে গেল।

"যাচ্ছিস্?" সুদাসও দাঁড়াল।

ঘর থেকে বেরিয়ে গেল প্রবীর—সুদাস পায়চারি সুরু করল ঘরের বাইরে এসে।

প্রবীরের উপর হয়ত অন্যায় করা হ'ল। কিন্তু প্রবীরও কি অবিচার করছেনা অনুর উপর? বোনের উপর শতসহস্র অন্যায় করতে পারে প্রবীর কিন্তু তার জন্যে বারবার সুদাস প্রবীরের উপর কঠোর হয়ে উঠ্‌ছে কেন? এ কি শমীনের প্রতি সহানুভূতি না সবটুকুই অনুর জন্যে দুর্ব্বলতা? সুদাস জানে অনুর জন্যে দুর্ব্বলতা থাকা তার অন্যায়। কিন্তু অন্যায় বলেই কি অন্যায়ের হাত এড়ানো যায়? মহীতোষ শ্যামলীকে ভালোবাসত। তারজন্যে কি সুদাস ভালোবাসেনি শ্যামলীকে? অনুকে যদি ভালো লাগে সুদাসের তাতে কার কি ক্ষতি? সে-ভালো-লাগা সে জাহির করতে যাবেনা কোনোদিন, রক্তের ঢেউ যদি বাইরে দেখা না যায় তাতে কি অপরাধ!

শোবার ঘরে এসে বাতি জ্বালিয়ে দিল সুদাস। দেয়ালে শ্যামলীর ফটো-টা ঝিক্‌মিক্ করে উঠেছে। শ্যামলীর মুখের স্নিগ্ধ সুন্দর হাসিটা এতো কুৎসিত মনে হচ্ছিল সুদাসের যে তক্ষুণি সে দেয়াল থেকে চোখ ফিরিয়ে নিল।

তিন

কফি হাউসের ফ্রেস্‌কো-আঁকা দেয়াল ঘেঁষে একটা টেবিল জুড়ে বসেছিল ওরা চারজন। মহীতোষ, রত্না, প্রণব প্রবীর। মাদ্রাজ-জাত এই পানীয়টির উপর মহীতোষের শ্রদ্ধা থাকা উচিত কারণ মাদ্রাজ তার মিলের সূতো জোগায়। কিন্তু প্রবীর যে রাজাজির উপর শ্রদ্ধার দরুণই কফি-হাউসকে পছন্দ করতে সুরু করেছে তা নয়—কফিহাউসে বসে খানিকক্ষণ পলিটিক্স আলাপ করলে আলাপটার আভিজাত্য বাড়ে বলে তার ধারণা। রত্না ভালোবাসে কাশু বাদাম। কফির বুনো গন্ধ আর উগ্রতা প্রণবের পছন্দসই। কাজেই কফি হাউসে এসে মিলবার পক্ষে চারজনের কারো কোনো বাধা নেই।

"প্রণববাবুর হাত খুলে গেছে, কি বলিস মহী—?" প্রবীর হাসি-ঠাট্টা থেকে ওদের গম্ভীর প্রসঙ্গে টেনে আনবার চেষ্টা করছিল।

প্রণব এককাপ কফি শেষ করে আরেক কাপের আয়োজনে রত্নার শরণ নিচ্ছিল—হাত গুটিয়ে ফেলে চেয়ারের ভেতর সরে এলো সে।

মহীতোষও যে কথাটা ধরতে পেরেছে তা নয়—মিহি হাসিতে সম্মতি বা অসম্মতি সবকিছুই বোঝা যেতে পারে বলে সে ওধরণের একটা হাসিকেই আশ্রয় করে রইল।

অগত্যা প্রবীরকে বিশদ হতে হল: "ওঁর 'সীমান্তে' গল্প-টার কথা বল্‌ছিলুম—বস্তির-জীবন বা চাষী নিয়ে আগেও গল্প লিখেছেন প্রণববাবু কিন্তু 'সীমান্ত' অদ্ভুত। চাটগাঁয়ের টপোগ্রাফির জ্ঞানের

কথা বল্‌ছিনে—অনঙ্গমাঝির চরিত্রের কথাই বলছি, আপনি কি বলেন মিসেস্ মুখার্জ্জি ?"

রত্না মুখ তুলে তাকাল প্রবীরের দিকে, তাকাল যেন তার টকটকে সিঁদুরের টিপটাই। "সত্যি, খুব ভালো হয়েছে গল্পটি—" ছেলে-মানুষের মতো বললে রত্না।

একটা কাশুবাদাম চুয়িংগামের মতো করে চিবুতে চিবুতে মহীতোষ বল্‌লে: "চাটগাঁয়ে ছিলে নাকি তুমি কোনদিন, প্রণব ?"

"না !" প্রণব হাসতে লাগল: "বাংলাদেশে যে চাটগাঁ বলে একটা জায়গা আছে যুদ্ধ না লাগলে হয়ত তা জানাই হতনা !"

"গল্প লেখকের দৃষ্টিটাই আসল—আপনার সে-দৃষ্টির পরিচয় আছে অনঙ্গমাঝির চরিত্রে—ধরুন, তার জীবিকার একমাত্র অবলম্বন নৌকোটি স্বেচ্ছায় সে ডুবিয়ে দিচ্ছে কর্ণফুলির জলে, জাপানীশত্রু এসে যেন নৌকোর সাহায্য না পায় ! তারপর সন্ধ্যার অন্ধকারে কর্ণফুলির তীরে দাঁড়িয়ে তার শেষ শপথটি কি চৎমকার: 'গায়ের রক্ত তৈরী হয়েছে এ জল আর মাটি থেকে, না-হয় এ জল আর মাটিকেই দিয়ে যাব সে-রক্ত !' জনমনের দৃঢ়তার আর বলিষ্ঠতার এমন সুন্দর ছবি আপনাদের আর কেউ আঁকতে পারেনি !" খোসা-মোদে বিনম্র নয় উৎসাহে উদ্দীপিত হয়ে উঠ্‌ল প্রবীর।

"তার মানে তোমাদের জনযুদ্ধের সার্থক প্রপাগ্যাণ্ডা !" মহীতোষ নিরিবিলি হাসতে সুরু করলে।

" 'আমাদের জনযুদ্ধ' বলে বিশেষ কোনো ব্যাপার ত নেই—জনযুদ্ধের তাগিদ আজ সবাই অনুভব করছে। প্রণববাবু কি মনে করেন না জনযুদ্ধই একমাত্র ভারতবর্ষের মুক্তির পথ ?"

"প্রণব নিশ্চয়ই মনে করে ! তোদের দলের ছেলেমেয়েরা যে রেটে ওর বই পড়তে সুরু করেছে—হুহু করে এডিশন হয়ে যাচ্ছে ওর বই-এর—তার জন্যে প্রণবের একটা কৃতজ্ঞতা ত থাকা উচিত !"

"কথাটা ভুল হল"—প্রণবই আপত্তি জানালে মহীতোষের কথায়ঃ "নিজের মনের সঙ্গে বোঝাপড়া না হলে একটি অক্ষরও আমি লিখতে রাজী নই !"

"সত্যিকারের সাহিত্যিক রাজী হতে পারেন না।" প্রবীর কথাটাতে আরো খানিকটা জোর দিয়ে দিলে।

রত্নার মুখটা ফ্যাকাসে দেখাচ্ছিল। মহীতোষ রত্নার দিকে একপলক তাকিয়ে হাসির মতো একটা প্রকাণ্ড হাঁ তৈরী করে তাড়াতাড়ি বল্‌তে শুরু করলেঃ "মনের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রশ্ন ত নয়। নিশ্চয়ই মনের সঙ্গে বোঝাপড়া হয়েছে তোমার। তবে সূক্ষ্ম সমালোচনায় প্রশ্ন হ'বে এ বোঝাপড়ার পেছনে কোন্ প্রেরণা কাজ করছে ! এতো বড় একটা পাঠকের দল তুমি পেয়ে গেছ তাদের চাহিদা তোমাকে মেটাতে হবে বৈ কি !"

"এ ব্যবসায়ী বুদ্ধি আমার নেই। তা থাকলে জনযুদ্ধের আগে সিনেমায় ঢোকা কঠিন ছিলনা। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেও সিনেমায় ঢুকিনি—তা ত তুমি জানো !"

মহীতোষ সত্যি জানে সে-কথা। চুপ করে গেল সে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধের চিহ্ন প্রণবের জামাকাপড়ে এখনও বর্ত্তমান। মহীতোষের স্ত্রীর সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যেই আজ এসেছে সে কিন্তু ঘামের দাগ-লাগা আধময়লা পাঞ্জাবীটা ঠিক তেম্নি আছে, স্যাণ্ডেলের সোলটা হাঁ-করা, আর সযত্নে ঢাকবার চেষ্টা করলেও দেখা যায় হাঁটুর কাছে কাপড়টা ফেঁসে গেছে। দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ করছে বলেই একটা উদ্ধত ভঙ্গী আছে প্রণবের মনে। একেক সময় একেক খাতে তা উঁকি দেয়। শান্ত, সচ্ছল, নিরুপদ্রব জীবনের প্রতি অপরিসীম ঘৃণা তার কখনো আঘাত করে মধ্যবিত্ত জীবনকে কখনো উজ্জ্বল করে তুলতে চায় বঞ্চিত নিম্নশ্রেণীর আদিম মানবিক সত্তাকে।

মহীতোষের পক্ষ থেকে নয়, নিজের পক্ষ থেকেই কথা বলল

রত্না : "সিনেমা যে আপনাকে টেনে নিতে পারেনি তারজন্যে সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ।"

"আলাপটা জমেই উঠছে যখন—" মহীতোষ বয়কে ডেকে আনল : "কিছু ফুড দাও ত, বাবা, যা তোমাদের ভালো আছে—চোখের উপর এনে মেনু-কার্ড ধরবার দরকার নেই—ফুডের পর আরেক পট্ কফি।"

"দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করছ না কি?" প্রণব হেসে উঠল। মহীতোষ আর রত্নাও হেসে উঠল তার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রবীর সিগারেটের ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন থেকে গম্ভীরভাবে বললে : "মহীতোষ না হলেও মিসেস্ মুখার্জ্জি আমাদেরই দলে—মানে গরীবেরই দলে!"

"সে কি!" ভুরু কপালে তুলে বল্‌লে মহীতোষ : "তুমি কি স্বামীস্ত্রীর মধ্যে শ্রেণীযুদ্ধ চালাবার মতলবে আছ?"

এবার প্রবীরকেও হাসতে হল : "শ্রেণীযুদ্ধে বুর্জ্জোয়ারাও সর্ব্বহারার দলে যোগ দিতে পারে!"

"তবু ভালো। পথ খোলা আছে! কি বলো প্রণব?"

"শ্রেণীযুদ্ধটুদ্ধ আমি বুঝিনে। আমি বুঝি সভ্যতা লড়ছে বর্ব্বরতার সঙ্গে। সংস্কৃতির শত্রু ফ্যাসিবাদকে নির্ম্মূল করতে মসী ছেড়ে যদি অসি ধরতে হয় তাতেও আমরা রাজি। সভ্যমানুষ মাত্রেরই উচিত ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, সেখানে আর শ্রেণীর বিচার নেই।"

"তাঁর মানে কি যুদ্ধ না করলে ফ্যাসিবাদকে ঘৃণা করা হবেনা? ধরো, আমিত জীবনে যুদ্ধ করতে চাইবনা—তাহলে কি তোমাদের দল থেকে নাম-কাটা যাবে আমার?"

"না তা কেন?—" প্রণব আর কিছু বলতে পারবে বলে মনে হলনা।

প্রণবকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো প্রবীর : "যুদ্ধ করা মানে

প্রতিরোধ করা—অনেক রকমেই প্রতিরোধ করা যায়। অনঙ্গমাঝির নৌকো নষ্ট করে ফেলাও প্রতিরোধ!"

"এই স্কর্চড্ আর্থে রাজী হওয়াত মুস্কিল! শোনা যায় টাটাও রাজি হয়নি!"

"আসল মুস্কিল রাজি না হওয়াটাই," প্রবীর দার্শনিকের মিহি-হাসি টেনে বল্‌লে: "এই স্কর্চড্ আর্থের দরুণই সোভিয়েট আজ দুর্দ্ধর্ষ নাৎসীদের হটিয়ে দিতে সুরু করেছে! ফিফ্‌থ কোলামের জোরেই ফ্যাসিস্টরা দেশজয় করে—যেখানে ফিফ্‌থ কোলাম নেই, সমস্ত দেশ যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করে সেখানে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। টাটা একথা বুঝতে না পারেন কিন্তু জওহরলাল সেদিন কি বলে গেছেন? সুভাষ বসু যদি জাপানী সৈন্য নিয়ে আসেন, তিনি তা প্রতিরোধ করবেন!"

"সবই বুঝতে পারছি ভাই—" দীর্ঘনিশ্বাসের ভঙ্গী এনে বল্‌লে মহীতোষ: "কতো খোসামোদ, অপমান আর পরিশ্রম এই মিল করবার পেছনে—তাকে ভেঙে দেওয়া কি সহজ?"

কৌতুকের হাসিতে রত্নার চোখ চিক্‌চিক্ করে উঠল: "জাপানীরা যে আসছেই এ-কথা তোমায় কে বললে?"

"জনযুদ্ধের এতো তোড়জোড় করছ, তবু জাপানীরা আসবেনা?"

কৌতুকী চোখ নিয়ে রত্না প্রবীর আর প্রণবের দিকে তাকাল। প্রণব একটু ভ্রূকুঁচকে বললে: "Enough of it—মহী! এখন আর দরিদ্র-নারায়ণকে বসিয়ে রেখোনাত—টেবিলের দিকে মন দাও।"

"নিশ্চয়! এতক্ষণ ত প্রবীরকে খাইয়েছি—আমাদের এই ত আহার্য্য!"

প্রণব আর প্রবীরকে চৌরঙ্গীতে ছেড়ে দিয়ে মহীতোষ আর রত্না বাড়ি ফিরে এল।

রত্না ঃ "সিনেমা যে আপনাকে টেনে নিতে পারেনি তারজন্যে সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ।"

"আলাপটা জমেই উঠছে যখন—" মহীতোষ বয়কে ডেকে আনল ঃ "কিছু ফুড দাও ত, বাবা, যা তোমাদের ভালো আছে—চোখের উপর এনে মেনু-কার্ড ধরবার দরকার নেই—ফুডের পর আরেক পট্ কফি।"

"দরিদ্রনারায়ণের সেবার ব্যবস্থা করছ না কি?" প্রণব হেসে উঠল। মহীতোষ আর রত্নাও হেসে উঠল তার সঙ্গে সঙ্গে।

প্রবীর সিগারেটের ধোঁয়ায় সমাচ্ছন্ন থেকে গম্ভীরভাবে বললে ঃ "মহীতোষ না হলেও মিসেস্ মুখার্জ্জি আমাদেরই দলে—মানে গরীবেরই দলে!"

"সে কি!" ভুরু কপালে তুলে বল্‌লে মহীতোষ ঃ "তুমি কি স্বামীস্ত্রীর মধ্যে শ্রেণীযুদ্ধ চালাবার মতলবে আছ?"

এবার প্রবীরকেও হাসতে হল ঃ "শ্রেণীযুদ্ধে বুর্জ্জোয়ারাও সর্ব্বহারার দলে যোগ দিতে পারে!"

"তবু ভালো। পথ খোলা আছে! কি বলো প্রণব?"

"শ্রেণীযুদ্ধটুদ্ধ আমি বুঝিনে। আমি বুঝি সভ্যতা লড়ছে বর্ব্বরতার সঙ্গে। সংস্কৃতির শত্রু ফ্যাসিবাদকে নির্ম্মূল করতে মসী ছেড়ে যদি অসি ধরতে হয় তাতেও আমরা রাজি। সভ্যমানুষ মাত্রেরই উচিত ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা, সেখানে আর শ্রেণীর বিচার নেই।"

"তাঁর মানে কি যুদ্ধ না করলে ফ্যাসিবাদকে ঘৃণা করা হবেনা? ধরো, আমিত জীবনে যুদ্ধ করতে চাইবনা—তাহলে কি তোমাদের দল থেকে নাম-কাটা যাবে আমার?"

"না তা কেন?—" প্রণব আর কিছু বলতে পারবে বলে মনে হলনা।

প্রণবকে উদ্ধার করতে এগিয়ে এলো প্রবীর ঃ "যুদ্ধ করা মানে

প্রতিরোধ করা—অনেক রকমেই প্রতিরোধ করা যায়। অনঙ্গমাঝির নৌকো নষ্ট করে ফেলাও প্রতিরোধ !"

"এই স্কর্চড্ আর্থে রাজী হওয়াত মুস্কিল ! শোনা যায় টাটাও রাজি হয়নি !"

"আসল মুস্কিল রাজি না হওয়াটাই," প্রবীর দার্শনিকের মিহি-হাসি টেনে বল্‌লে : "এই স্কর্চড্ আর্থের দরুণই সোভিয়েট আজ দুর্দ্ধর্ষ নাৎসীদের হটিয়ে দিতে সুরু করেছে ! ফিফ্‌থ কোলামের জোরেই ফ্যাসিষ্টরা দেশজয় করে—যেখানে ফিফ্‌থ কোলাম নেই, সমস্ত দেশ যেখানে সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে প্রতিরোধ করে সেখানে তাদের পরাজয় নিশ্চিত। টাটা একথা বুঝতে না পারেন কিন্তু জওহরলাল সেদিন কি বলে গেছেন ? সুভাষ বসু যদি জাপানী সৈন্য নিয়ে আসেন, তিনি তা প্রতিরোধ করবেন !"

"সবই বুঝতে পারছি ভাই—" দীর্ঘনিশ্বাসের ভঙ্গী এনে বল্‌লে মহীতোষ : "কতো খোসামোদ, অপমান আর পরিশ্রম এই মিল করবার পেছনে—তাকে ভেঙে দেওয়া কি সহজ ?"

কৌতুকের হাসিতে রত্নার চোখ চিক্‌চিক্ করে উঠল : "জাপানীরা যে আসছেই এ-কথা তোমায় কে বললে ?"

"জনযুদ্ধের এতো তোড়জোড় করছ, তবু জাপানীরা আসবেনা ?"

কৌতুকী চোখ নিয়ে রত্না প্রবীর আর প্রণবের দিকে তাকাল। প্রণব একটু ভ্রূকুঁচকে বললে : "Enough of it—মহী ! এখন আর দরিদ্র-নারায়ণকে বসিয়ে রেখোনাত—টেবিলের দিকে মন দাও।"

"নিশ্চয় ! এতক্ষণ ত প্রবীরকে খাইয়েছি—আমাদের এই ত আহার্য্য !"

প্রণব আর প্রবীরকে চৌরঙ্গীতে ছেড়ে দিয়ে মহীতোষ আর রত্না বাড়ি ফিরে এল।

পথে অবশ্যি বলেছিল মহীতোষ যশোর রোড ধরে একটা লম্বা ড্রাইভ দেবার কথা। রত্নার উৎসাহের স্রোত ততটা প্রখর নয় বলেই আপত্তি ছিল তার কিন্তু আপত্তি জানালে সে ব্ল্যাক-আউটের বিপদের কথা তুলে। নিজের দৃষ্টিশক্তির উপর অগাধ বিশ্বাস থাকলেও প্রতিবাদ করেনি মহীতোষ। বাইরের ব্ল্যাকআউট উৎরে যাওয়া যায় হয়ত এই দৃষ্টিশক্তিরই জোরে কিন্তু সে-জোরে রত্নার মনের ব্ল্যাকআউট আলোকোজ্জ্বল করে তোলা যায়না। বিয়ের পর রত্না যেন থিঁতিয়ে গেছে অনেকখানি। জীবনের উৎসাহে ভাটার টান লেগেছে যেন। কারণ খুঁজতে চায়নি মহীতোষ। খুঁড়ে খুঁড়ে কারণ আবিষ্কার করার ছেলে সে নয়। ভেবে নিয়েছে রত্নার মনের এই অস্বাস্থ্য হয়ত কয়েকটা দিন খুবই স্বাভাবিক। স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনার চেষ্টার চেয়ে রত্নার মনকে সমীহ করে যাওয়াই ভালো।

বিয়েটা রত্নার পক্ষে সত্যি খুব বিপর্য্যয়ের ব্যাপার নয় কি? বিয়ের বয়েসে বিয়ে না করার প্রতিজ্ঞা নিয়ে বিয়ে না করার বয়েসে বিয়ে করতে হ'ল তাকে। মনে আর মতবাদে বিপর্য্যয় হতে পারেই ত এতে। মহীতোষ অবশ্যি রত্নার মনের এই দুরবস্থা তৈরী করার দায় নিজের উপর তুলে নিয়ে অনুতাপ করতে প্রস্তুত নয় কিন্তু সহানুভূতি দেখাতে সে প্রস্তুত। প্রস্তুত সে মনের অনেক ইচ্ছাকে সংহত করতে। একে একরকম ত্যাগই বলা যায়—তাহলে আবার বলতে হয় বিয়েটাই একটা ত্যাগের ব্যাপার। রত্না যদি কিছুই ত্যাগ না করে, আর মহীতোষও আঁকড়ে থাকে তার মনের প্রত্যেকটি পদক্ষেপ, তাহলে তাদের সম্পর্কটাকে বিয়ের না বলে লড়াই-এর বলাই ভালো।

রাস্তায় আর কোনো কথা হলনা তাদের। বাড়ি ফিরেও মহিমবাবুর তত্ত্বতল্লাসে খানিকক্ষণ কাটিয়ে দিয়ে একমাত্র সৌজন্য-বোধেই যেন মহীতোষের ঘরে এসে দাঁড়াল রত্না।

মহীতোষ সে-সপ্তাহের ক্যাপিটেল কাগজটা খুলে 'কারেন্ট কয়েন'-এর বিভাগে টেক্সটাইল সম্বন্ধে মন্তব্য খুঁজে দেখছিল—ফরটিটুর বুম্-টা আরো কিছু দিন চলবে বলে ক্যাপিটেল ভরসা দিচ্ছে কিনা তা জেনে রাখা ভালো। বিরাট একটা লেবার ট্রাবলের ভেতর দিয়ে চল্‌তে হচ্ছে মহীতোষকে—সুরসুর করে ওদের সমস্ত দাবী মিটিয়ে দিয়েও একতিল ছুশ্চিন্তা কম্‌ছেনা তার—কে জানে কখন কি নূতন দাবী পেশ করে বসে! অস্বাভাবিক একটা বুম্ আছে বলে সবই পুষিয়ে যাচ্ছে এখন কিন্তু কে জানে কতদিন চলবে এ-বুম্। এদিকে লেবারার ত অভ্যস্ত হয়ে গেল মাগ্‌গিভাতার উপরি টাকায়—বুম্ চলে গেলেও কি এ-টাকা কর্ত্তন করা যাবে তাদের মজুরী থেকে? একদিকে তবু রক্ষা ওদের পরামর্শদাতারা মাগ্‌গিভাতার রব তুল্‌তেই বলে, ষ্ট্রাইকের পরামর্শ দেয় না। প্রবীর-এরা বল্‌ছে শ্রমিকদের পক্ষে ফ্যাসিষ্ট-প্রতিরোধ হচ্ছে মন দিয়ে কারখানায় কাজ করে যাওয়া! ফুলচন্দন পড়ুক ওদের মুখে!

"বোসো—" মহীতোষ কাগজটা পাশে ছুঁড়ে দিয়ে রত্নার সঙ্গে কথা বলবার জন্যে তৈরী হল।

"এক কাপ চা খেয়ে আবার একগাদা কাগজপত্র নিয়ে বসেছেন বাবা, অসম্ভব এনার্জ্জি!" রত্নার মুখে শ্রদ্ধা ফুটে উঠল।

"কোম্পানীর হিসেবপত্র তন্নতন্ন করে দেখা ওঁর অভ্যাস!" মহীতোষ হাসতে লাগল: "শেয়ার হোল্ডারদের অনেকদিন উপোসে বসিয়ে রেখে সততার পরিচয় দিতে পারিনি, কঠোর সততা দেখাবার তাই এবার জেদ হয়ে গেছে আমাদের!"

"সততা তোমাদের শেয়ার হোল্ডারের বেলায়ই। যারা রাতদিন খেটে মরছে তাদের বেলায় নয়!"

"কে বল্‌ছে নয়? প্রবীর হয়ত বল্‌বে ওদের সারপ্লাস্ লেবার আত্মসাৎ করেই আমাদের মোটা মুনফা। সত্যি বল্‌তে ওদের

বেতনের উপযুক্ত লেবারই ওরা দিচ্ছেনা, এফিসিয়েন্সি এতো কম! আন্‌স্কিল্‌ড্‌, ইনএফিসিয়্যান্ট লোক নিয়ে কাজ করে সারপ্লাস লেবার হতে পারে কোনদিন? লাভ করছি আমরা কমার্শিয়াল বিধি-ব্যবস্থার মার প্যাঁচে, ডিমাণ্ড এবং সাপ্লাই-এর কারিকুরিতে। ভারতবর্ষের যা লেবার ষ্ট্যাণ্ডার্ড আর তাদের যা বেতন দিচ্ছি আমরা তা এসে চাক্ষুষ দেখলে তোমাদের কার্ল মার্ক্সও বল্‌তেন না যে সারপ্লাস্‌ ভ্যালু দিয়ে আমাদের মুনফা তৈরী।"

"আমার কাছে এ-বক্তৃতা দিয়ে কি লাভ, আমি ত কার্ল মার্ক্সের শিষ্য নই!"

"প্রবীরের দলে ত তুমিও!"

"কে বলেছে?"

"প্রবীর মনে করে!" রত্নার প্রশ্নের কঠোর ভঙ্গীতে মহীতোষ 'প্রবীর বলেছে' না বলে 'প্রবীর মনে করে' বলাই ভালো মনে করল।

"মনে উনি যা খুসী করতে পারেন কিন্তু মনের উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে, কারো কথায় সে বিশ্বাস বদলে যাবেনা!"

"তাহলে বেচারীর ভুল ভেঙে দিলেই পারতে!"

"তোমার বন্ধু, ভুলটা তুমিই ভাঙিয়ে দিও দরকার মনে করলে।"

"দরকার আমার নেই—" হাসিটাকে ঠোঁটের উপর ধরে রাখল মহীতোষ। হাসিটার মানে অনেক রকমই হয়। এমন মানেও হতে পারে যে প্রবীর সম্বন্ধে কোনো দুর্ভাবনাই তার নেই। আবার এমনও হতে পারে, অনেকগুলো অপ্রিয় কথাকে পাহারা দিয়ে ভেতরে রাখবার জন্যেই এ-ধরণের হাসির দরকার। কথার স্বাভাবিক স্রোত ধরে চল্‌লে মহীতোষ বলতে পারত, 'তোমারও ত পরিচিতই প্রবীর'! কিন্তু তার উত্তরে যদি রত্না বলে বস্‌ত, 'আমার সঙ্গে পরিচয়টা আমি ভুলতে পারি কিন্তু তুমি ভুল্‌তে পারছনা!'—তখনও ত চুপ করেই থাকতে হ'ত মহীতোষকে! চুপ

করে না থাকলে সুরু হ'ত এ-ধরণের বিয়ের সেই ইতর অধ্যায়—ঈর্ষা, সন্দেহ, কটু কথার নোংরামি ডাইভোর্স! অবশ্যি ডাইভোর্স পর্য্যন্ত যাবার মানসিক কঠোরতা রত্নার নেই—মনে-মনেই হয়ত কৃতপাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে সুরু করবে সে কিন্তু সে-দুর্ঘটনা ডাইভোর্সের চেয়েও মর্ম্মান্তিক। ঘটনার এ গতিকে উন্মুক্ত করে দেওয়ার চেয়ে কথাটাকে মোড় ফিরিয়ে দেওয়া কি অনেক ভালো নয়?

মহীতোষ তবু কথার মোড় ফিরিয়ে দিতে চায়, রত্না চায় কথার উপর যবনিকা ফেলতে। কথা যখন অপ্রিয়তার পথে সূচীমুখ হয়ে মনে উঁকিঝুঁকি দেবার চেষ্টা করে রত্না তাকে চিরদিনের জন্যে মন থেকে উপড়ে তুলে ফেলে। স্নায়ুতে আঘাত লাগে লাগুক—এ-আঘাত সয়ে যাবার অভ্যাস তার আছে—বাঙালী মেয়ে তার স্বভাবজাত ইচ্ছা আর অনুভূতির সবগুলো রং নিয়ে বেঁচে উঠতে পারে না। একটি ইচ্ছাকে সুস্থভাবে বাঁচাতে হলে ত্যাগ করতে হয় তাকে অনেক কিছু, সয়ে যেতে হয় অনেক আক্রমণ। সে যে থিঁতিয়ে যাচ্ছে বুঝতে পারে রত্না। কিন্তু এই স্বাভাবিকতার হাত থেকে পালিয়ে বাঁচা ত সম্ভব নয়। তাই হাসি মুখেই রত্না জীবনের বিষণ্ণতাকে মেনে নিয়েছে।

"তোমার সাহিত্যিক বন্ধুকে দেখলুম—" খবরের কাগজে খবর পড়ার মতো করে বল্‌লে রত্না।

"প্রণব হঠাৎ অ্যান্টিফ্যাসিষ্ট হয়ে গেছে!"

"সিনেমার গল্প লেখার চাইতে ত ভালো।"

"সিনেমার রাজ্যটাকে তোমার মতো সবাইত আর পাপরাজ্য মনে করেনা, এমন কি ব্যার্ণার্ডশ ও না!" হাস্‌তে লাগ্‌ল মহীতোষ।

"ব্যার্ণার্ডশ সিনেমার জন্যে লেখেন না, নিজের রুচিতেই বই লেখেন—সিনেমা তাঁর শরণ নেয়!"

"কি করবে, ওদেশে ত রবীন্দ্রনাথ জন্মাননি। রবীন্দ্রনাথ বাঙালী-মাত্রকেই সাহিত্যের উত্তরাধিকার দিয়ে গেছেন—সিনেমার প্রোপার্টিম্যানও এখানে সাহিত্যিক, কাজেই বাইরের সাহিত্যিককে সেখানে ঢুক্‌তে হলে 'সিনেমিত' হয়ে ঢুক্‌তে হয়!"

"তাহলে কি দরকার আছে তাদের যাবার?"

"এখানে একটু মার্ক্সবাদ এপ্লাই কর তাহলেই বুঝ্‌বে কি দরকার আছে—সব কিছুই অর্থনীতির উপর নির্ভর করে।"

"তার মানে কি টাকাপয়সার জন্যে সব কিছু করা যায়?"

"অনেকটা তাই। হ্যাণ্ডফুল অব সিলভারের জন্যে ওয়ার্ডস্বার্থ মতবাদ বিসর্জ্জন করেছিলেন, হ্যাণ্ডফুল অব ভাত দুবেলা জোটাবার জন্যে ভারতবর্ষের লোক চীনে গিয়ে স্পাইগিরিও করে!"

"কিন্তু যারা তা করেনা তাদের কথাই বল্‌ছি—প্রণববাবু সে-দলেরই।"

"ভীষণ রোমান্টিক প্রণব! দারিদ্র্য নিয়েও ওর একটা রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ আছে!"

"যেদিন সাহিত্যিকরা রোমান্টিসিজ্‌ম্‌ ছেড়ে দেবেন, সেদিন হয়ত সাহিত্য বলেও কিছু থাক্‌বে না!"

"রোমান্টিসিজমেরও বিষয় আছে—ফুল নিয়ে কবিরা আবেগময় হয়ে উঠুন সহ্য করতে রাজি আছি কিন্তু এবার যে এঁরা ঘাম নিয়ে মেতে উঠেছেন!"

"কি ক্ষতি?"

"সহ্য করতে রাজী নই।"

"আমার ত খারাপ লাগ্‌বেনা পড়তে!"

"তোমার রাজ্যে ত খারাপ বলে কিছু নেই—সবই ভালো!"

"খারাপ বলে সত্যি ত কিছু নেই! মানুষের জীবনকে যদি আমরা মেনে নিই, খারাপ বলে কিছু বলবার উপায় আছে কি

আমাদের ?” রত্নার মুখে ঠিক তেম্নি হাসি যা দিয়ে সে জীবনের বিষণ্নতাকে মেনে নিয়েছে।

কথাটা যে প্রায় বৈরাগ্যের ধার ঘেঁষে গেল বুঝ্তে পারে মহীতোষ। একটা অজানা, অনিবার্য্য স্রোতে নিজেকে যেন ভাসিয়ে দিয়েছে রত্না। সব কিছুই ভালো মানে কোনো কিছুরই মানে নেই তার কাছে। বিয়েতে সম্মতি না দেবার কোনো মানে নেই বলেই হয়ত সে সম্মতি দিয়েছিল। কিন্তু তখনও যতটুকু পাওয়া গেছে রত্নাকে এই তিন মাসে সেটকুও আর নেই।

“কিন্তু এ ধরণের মানাকে কি তুমি ভালো বলে মনে করতে চাও ?” সশ্রদ্ধ প্রতিবাদের ভঙ্গীতে বল্লে মহীতোষ।

“তাছাড়া আর কি করা যায় বলো !”

“কি করা যায় তা তুমি নিশ্চয়ই জানো।”

হয়ত জানে রত্না। নিজেকে যতো উদাসীনই করে তুলুক, জীবনের ভালো দিক্ বলে কতগুলো বস্তুর ঝিলিমিলি এখনো রত্নার মনে উঁকি দিয়ে যায়। জীবনে যে তাদের আর কোনো মানে নেই এ ধরণের চিন্তা আসে কি সে সত্যি তাদের মানে নেই বলে ? হয়ত তা নয়। বরং এটাই সত্যি কথা যে রত্না মনে করে তার বিবাহিত জীবনে তাদের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে ! বিবাহিত জীবনের কাছে আত্মবিক্রয় করে এ শুধু বিবাহিত জীবনের কলঙ্ক রটনা করা ! মহীতোষ কোনো সময় তার স্বাধীনতার উপর হাত দেয়নি—বরং স্মরণ করিয়ে দিতে চায় স্বাধীনতার কথা যখন রত্না নিজে ভুলে যেতে চায় স্বাধীনতার স্বাদ।

“আর কিছু না হোক—” মহীতোষ যেন কোনো অর্দ্ধ-পরিচিতাকে সম্ভাষণ করছেঃ “আমার কাজে ত একটু সাহায্য করতে পারো। করবার মতো কাজ নেই বলেই যে ভালো লাগছেনা তোমার তা আমি জানি।”

"নাঃ, সবই ত আমার কাছে ভালো লাগছে—" রত্না কথায় ধরা দিতে চাইল না কিন্তু হাসিতে ধরা পড়ে গেল।

"সব ভালো লাগা আর সব ভালো না লাগা একই রকম।"

রত্না তাকিয়ে রইল মহীতোষের মুখের দিকে—হয়ত তাকাল চোখের দিকেই তার। মহীতোষের চোখের উজ্জ্বলতা—সব সময়কার উজ্জ্বলতা ছায়াচ্ছন্ন হয়ে এসেছে।—রত্না কি ভালো করছে ?

"আনন্দের হাজার উপকরণ থাকলেও ঘরের চারটে দেয়াল আমাদের হাঁপিয়ে তোলে, আমরা ছোট হয়ে যাই তাই হাঁপিয়ে উঠি। বাইরের জগতে আনন্দ না থাকুক ওখানে আমরা হাঁপিয়ে উঠিনে। ওখানে কাজের শেষে ক্লান্তি—ঘর তোমায় ক্লান্ত করে তোলে হাতে তোমার কাজ তুলে দিতে না পেরে !"

ঘরের দেয়ালের মধ্যে ঘোরাফেরা করে কি ভালো করছে রত্না ? ভালো লাগছে তার খাঁচার ভেতর শান্তিতে বসবাস করে ?

"বলতে পারো তুমি আমায়, আমিও বা কি এমন কাজ করছি ! করবার মতো কাজ করবার ক্ষমতা আমার কোনদিনই ছিলনা। আমি অসঙ্কোচে স্বীকার করি, নিজের লাভের লোভেই আমার ব্যবসা। অসঙ্কোচে স্বীকার করেও তার জন্যে সঙ্কোচ আমার আছে—আমি যে অত্যন্ত সাধারণ তার জন্যেও সঙ্কোচ আছে আমার। তাই যা-কিছু ভালো, যা-কিছু বড়ো তার জন্যে একটা টান ছিল নাড়ীতে !"

ভেঙে দিচ্ছে কি রত্না মহীতোষের স্বপ্ন ?

"সে-টান সোজা পথে চলতে পারে নি সবসময়—আমি ছোট বলেই হয়ত। আমি ছোট বলেই বড়োকে ছোট করতে চেয়েছি অনেক সময়। আজ আর সত্যি তেমন ছোট হ'তে ইচ্ছা করছেনা। কিন্তু হয়ত ছোট হয়ে আমায় থাকতেই হবে !"

চীৎকার করে বল্‌তে ইচ্ছা করছিল রত্নার : "না"—কিন্তু তার

গলার স্নায়ুগুলো যেন ষড়যন্ত্র করে শিথিল হয়ে আছে, কিছুতেই তাকে কথা বলতে দেবে না।

"আমার এক কংগ্রেসী বন্ধু মেদিনীপুর যাচ্ছিল—শুনেছিলাম আরেক বন্ধুর মুখে, ওর টাকার দরকার। ওর মেসে দেখা করে ওকে টাকা দিতে চাইলুম। আমাকে দেখে ফ্যাকাশে হয়ে গেল ও, টাকা নিতে চাইলনা। গাঁয়ে-গাঁয়ে বক্তৃতা দিয়ে ওর জেল হয়ে গেছে। দেশকে ও হয়ত ভালোবাসে। ওর মতো ভালো না বাস্‌লে কি দেশকে ভালোবাসবার অধিকারই আমার নেই ?"

"আছে।" জোর করে কথাটা বল্‌ল রত্না, কথাটাতে অনেক জোর দিয়ে। এতদিন ধরে যত কিছু অস্বীকৃতি মনে-মনে লালন করছে সে, ওই ছোট একটি কথা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধেই যেন বিদ্রোহ ঘোষণা করল। মহীতোষের সবই আছে—কিছুই সে হারাবেনা, হারাতে দেবেনা রত্না—নিজেও সে হারাবেনা কিছু। সব কিছু আছে—করবার, পাবার, হবার সব কিছু।

"হয়ত আছে—" মহীতোষ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন রত্নার মুখের এই কথাটিই এতক্ষণ সে অপেক্ষা করছিল। কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছিল রত্না, এইমাত্র ফিরে পেল সে তাকে পাশে।

কিন্তু মহিমবাবু এসে ঘরে ঢুকলেন : "তোমাকে একটা চিঠি ড্র্যাফ্‌ট্‌ করতে দিয়েছিলেম বৌমা, আমারও মনে ছিলনা আর তুমিও করে দাও নি ."

ঘোমটার উপর হাতটা তুলে মুখ নীচু করে বল্‌লে রত্না : "কাল করে দোব।"

চার

এই রাত্রির জন্যেই যেন সমস্ত দিন অপেক্ষা করে থাকে সুদাস—রাত্রির এই বিভীষিকার জন্যে। যেন কান পেতে শুনতে চায়, কখন বেজে উঠবে সাইরেনের আর্ত্তস্বর—সেই ধ্বনিতরঙ্গ তার স্নায়ুতে এনে দেবে একটা অসহ্য উত্তেজনা, সমস্ত শরীরকে মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত করে তুলবে। কোথায় সুরু হবে আজ আগুনের আর ইস্পাতের হোরিখেলা—এখানে কি সুরু হতে পারে না, এই বালিগঞ্জে? কি রকম—কি চেহারার সে-মৃত্যু? কয়েক সেকেণ্ডে বোমার আগুনে আর ইস্পাতে সোজাসুজি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়া মন্দ কি? কি বাড়ি ধ্বসে গিয়েও মৃত্যু হ'তে পারে তার, দশবারো ঘণ্টা অসহ্য যন্ত্রণার ভেতর দিয়ে, কিম্বা স্প্লিণ্টারে পঙ্গু হয়ে থাকতে পারে আজীবন! মৃত্যুর বা জীবনের সেই কুৎসিত চেহারাটা স্মরণ করেও শিউরে ওঠে সুদাস। যদি মৃত্যু হয়, কয়েক সেকেণ্ডে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক সে।

যদি মৃত্যু হয়! সত্যি কি সে চায় মৃত্যুকে? মৃত্যুর হাত থেকে জীবনকে বাঁচাবার দুর্ব্বল ইচ্ছাটাই হয়ত মৃত্যু কামনার মতো দেখা যাচ্ছে তার অনুভূতিতে। বাঁচার ইচ্ছা-ই আজ বীভৎস হয়ে উঠেছে চারদিকে। সবার উদ্‌ভ্রান্ত চোখে এ ইচ্ছারই একটা বিকৃত ছাপ। যারা পালিয়ে যাচ্ছে আর যারা পালায়নি, যারা মরতে চায়না আর যারা ভ্রূক্ষেপ করেনা মৃত্যুকে—সবার চোখেই এ-ইচ্ছাকে আবিষ্কার করতে পারবে। খাঁচার পশুর মতো পায়চারি করতে করতে সুদাস তার এই ইচ্ছাটার সঙ্গেই মুখোমুখি হয়। হৃদপিণ্ডের রক্তের প্রত্যেকটি ওঠা-নামায় এ-ইচ্ছাই কেবল চলাফেরা করছে তার শরীরে। আর কোনো ইচ্ছা নেই। বাঁচার ইচ্ছা

তার বস্তুময় রূপ হারিয়ে ফেলে বিদেহী হয়ে উঠেছে বলেই তার আসল চেহারা মন থেকে তুলে আনতে পারেনি সুদাস—মনে হচ্ছে বুঝি এ মরবারই ইচ্ছা। কিন্তু রূপ তার যতো বিদেহীই হোক, সংজ্ঞা তার স্থূলই থাক্‌বে—নাম তার বাঁচারই ইচ্ছা, পশুর সহজপ্রবৃত্তির মতোই।

কিন্তু সত্যি বল্‌তে, বাঁচতে চাওয়ার কি মানে হয় সুদাসের? প্রলুব্ধ হবার মতো কি তার জীবন—এ জীবনের উপর কোনো আকর্ষণ থাকা কি উচিত? সঙ্গী বল্‌তে কেউ নেই তার—সীধু আর একগাদা বই ছাড়া! অফিসের কামরায় অনেক লোকের সঙ্গেই রোজ সে কথা বলে আসে—ঘরকন্না থেকে সুরু করে পলিটিক্স পর্য্যন্ত অনেক রকম কথাই বলতে হয় তাকে কন্‌ষ্টিট্যু-য়েন্টদের সঙ্গে, আন্তরিকতার অভিনয় করতে হয়, তাদের আত্মীয় বিয়োগে বিয়োগ-ব্যথা চোখেমুখে তুলে ধরতে হয়—কিন্তু তারা তার জীবনের কেউ নয়। জীবন বল্‌তে একগাদা বই আর মোটা একটা ব্যাঙ্কব্যালেন্স! টাকা চেয়েছিল সে—টাকা পেয়েছে। কিন্তু টাকা কি চেয়েছিল ব্যাঙ্কের লেজারে কালো অক্ষরে জমা হবার জন্যে? চেয়েছিল জীবনকে পরিচ্ছন্ন করে অন্ধকার থেকে মনকে মুক্তি দেবার জন্যে। মায়ের জন্যে দরকার ছিল টাকার—শ্যামলীর জন্যে দরকার ছিল। দরকার ছিলনা ব্যাঙ্কের খাতায় জমা হবার। কিন্তু ব্যাঙ্কের খাতায়ই জমা হয়ে চলেছে টাকা! এইত তার জীবন? জীবনে আর কিছু কি সে করতে পারল? কাউকে কি পেল, যার জীবন সুন্দর করে তুলে নিজের সৃষ্টিতে ভরে উঠতে পারে মন?

শ্যামলীর সবশেষের চিঠিটা এ' ক'দিন ধরে বারবার পড়েছে সুদাস! সেই একই কথা—মাকে ছেড়ে আসতে পারছেনা, মাষ্টারি করছে ওখানকার একটা স্কুলে। একই কথা তবু সুদাস বারবার পড়েছে যদি কথার বাঁকে নূতন কোনো মানে খুঁজে পাওয়া যায়।

সংক্ষিপ্ত চিঠি, কথায় বাঁক নেই, সহজ সরল তার মানে। শেষ পর্য্যন্ত শ্যামলীর উপর যবনিকা টেনে দিয়েছে সুদাস। পুরু যবনিকা যাতে শ্যামলীর ছায়ার ঝিলিমিলি আর দেখতে না পাওয়া যায়। একটা দূর ভবিষ্যতের নেশায় মেয়েলি বাঁচা যদি বাঁচতে চায় শ্যামলী, বাঁচতে থাকুক সে। তার স্বপ্নের শরীক হয়ে সুদাসের বাঁচবার দরকার নেই।

কিন্তু তার জন্যে ত তার অন্যভাবে বাঁচা দরকার। প্রত্যেকটি রাত্রিতে মৃত্যুর অপেক্ষা করা তবে কেন? কেন বলিষ্ঠ নয় তার বাঁচবার ইচ্ছা? শ্যামলীকে তার জীবনে এতোটা প্রতিষ্ঠিত হতে দিচ্ছে কেন সুদাস? সাধারণ একটি মেয়ের আকর্ষণের চাইতে তার চরিত্রের দৃঢ়তা কি বেশি নয়?

"সীধু—" সুদাস সীধুকে নিয়েও খানিকটা সময় কাটাতে পারে।

বেলা থাকতেই রান্না সেরে ফেলবার মতলবে ছিল সীধু—খেয়েদেয়ে অবসর হয়ে থাকা ভালো—কখন এসে জাপানীরা হামলা লাগিয়ে দেয় বলা ত যায় না! তেতে-ওঠা কড়াইটাকে নামিয়ে রেখে সীধু এসে উঁকি দিল—বলবার জন্যে তৈরী হয়ে এলো যে চা আর এখন খেয়ে দরকার নেই, রান্না নেমে যেতে পনেরো মিনিট আছে।

"পালাবার কথা যে মুখেও আনছিসনে সীধু—তোর কি ভয়ডরও নেই?" সুদাস হাস্‌তে সুরু করল।

"পালিয়ে কোথায় যাবো?"

"কেন, দেশে?"

"কলকাতা না থাক্‌লে দেশ কি থাক্‌বে আর দাদাবাবু?"

"কেন?"

"টাকা যাবে কোত্থেকে বল!"

"টাকার জন্যে এখানে থেকে মরবি?"

"টাকার জন্যে না মরে কি না খেয়ে মরতে বলো?" সীধু সুদাসকে আর প্রশ্রয় দিতে চাইলে না।

"শোন—"

"বলো—"

"তুই মারা গেলে তোর আত্মীয়রা আমায় কি বল্‌বে ?"

"আমি চলে গেলে তোমার যদি কিছু হয়—বৌদিদিমণি এসে কি বল্‌বেন আমায় ?" সীধু একটা মস্ত কথা বল্‌তে পেরে হাস্‌তে লাগল।

সীধুকে যাবার সময় দিয়ে অন্যদিকে তাকিয়ে রইল সুদাস।

"চা আন্‌ব বাবু ?"

সীধু তখনো যায়নি বলে সুদাস চোখে ধমক নিয়ে তাকাল তার দিকে। সীধুর কথার জবাব দিয়েই মহীতোষ এসে ঢুক্‌ল ঘরে : "হ্যাঁ খুব গরম ছ'কাপ যাতে শীত তাড়ানো যায় ! ডিসেম্বরের শীত আর ভয়ের শীত !"

হঠাৎ মহীতোষের আবির্ভাব কেন, বুঝতে পারলনা সুদাস। কিন্তু সে-অনুসন্ধানের চেয়ে তার আসাটাই মনের পক্ষে বেশি আনন্দদায়ক।

"আয়—" আন্তরিক সম্ভাষণ জানালে সুদাস মহীতোষকে।

"আজ ত এলুম, কাল আর আস্‌তে পারি কি না সন্দেহ।"

"কাল আমিও ত না থাক্‌তে পারি !"

"দূর, ওকথা কে বল্‌ছে ? বোমায় মরতে যাচ্ছে কে ? কাল গিয়ে হয়ত মিল চালাতে হবে পানিহাটিতে—লেবার ক্রাইসিস্‌ রীতিমতো। কাঁদতে সুরু করেছে কয়েকজন, জানের চাইতে না কি টাকা বড়ো নয় !"

"ওদের মনুষ্যত্ব তাহলে কিছুকিছু রেখেছিস, দেখা যায়—" সুদাস হাসতে লাগল।

"আমার ত সব যেতে বসেছে !"

"ইন্‌ক্রেসনের টাকা কুড়োতে হ'লে এমন একআধটু ঝুঁকি নিতেই হয় !"

"মিলই বন্ধ হবার যোগাড়, আর টাকা !"

"প্রবীরকে নিয়ে যা মিলে, বলে আস্‌বে, মিলে কাজ করে জাপানীদের লড়ো !"

"প্রবীর মনে করতে পারে ওদের কথায় চন্দ্রসূর্য্য ওঠে কিন্তু আমার ত তা মনে করলে চলবেনা !"

"হঠাৎ প্রবীরের উপর বিশ্বাস হারালে চল্‌বে কেন ?" সিগারেটের টিনটা মহীতোষের সামনে এগিয়ে দিল সুদাস : "তোর বিয়েতে দেখলুম ও-ই সবচাইতে ব্যস্ত, শুনলুম তোর স্ত্রী-ও না কি প্রবীরের পরিচিতা—কম্যুনিষ্ট।"

"এ-দিনে কম্যুনিষ্ট কে নয়, জমিদার-আই-সি-এস্‌ থেকে সুরু করে স্কুলমাষ্টার সবাই—তবে যাদের কম্যুনিষ্ট হবার কথা সেই মজুররাই কম্যুনিষ্ট নয় !"

সুদাস প্রাণখুলে হেসে নিলে : "কম্যুনিষ্ট আমারও হওয়া উচিত ছিল কেবল প্রবীরের আবোলতাবোল কথা আর কাজের জন্যে ও-পথে গিয়ে নাম কেনার ইচ্ছে হলনা !"

"প্রবীরকে আর কি দেখেছিস—আমার পরিচিত এক অধ্যাপক আছেন তাঁর স্বপ্নে না কি রোজ এসে ষ্টালিন-সাহেব দেখা দেন এদিকে বিয়ে করেছেন দশহাজার টাকা পণ নিয়ে—আরেকজন অধ্যাপক দেড়শ টাকার জন্যে ভক্তিগদগদ চিত্তে ছাত্রদের বাইবেল পড়িয়ে এসে বাড়িতে বসে ক্যাপিটেলের চতুর্থ অধ্যায় লেখবার তোড়জোড় করছেন ! সত্যি সেলুকস্‌, কি বিচিত্র এই দেশ !" হাসির ঝলকের সঙ্গে সঙ্গে টেবিলের ওপর সিগারেট ঠুকতে সুরু করল মহীতোষ।

"মধ্যবিত্তদের ওপর মার্ক্সের ঝাল ছিল সবচেয়ে বেশি তাই ভক্ত সেজে মধ্যবিত্তরা এবার তাঁকে ডুবিয়ে ছাড়বে—প্রতিহিংসা বস্তুটিও কি ওদের নেই ?" অদ্ভুত ধরণের হাসিতে মনে-মনে কার দিকে যেন তাকাল সুদাস—সে মহীতোষ নয় : "অফিস খুললে হয়ত

দেখতে পাবো অফিসের বাবুদের মুখ ভার! ক্লোজিং-এর কাজে যাঁরা আস্‌ছেন তাঁদের মুখে সব কথার উপর বোমার কথা। তার মানে কি জানিস্‌ মহী, ওআর-এলাউয়েন্স পনেরো টাকা করে দিয়ে দাও তাহলে আর মাথায় বোমা পড়্‌বেনা!"

"ওরা অত্যন্ত ভদ্রলোক। আমি ত ডবল মজুরী কবুল করেও পাঁচজনকে রাখতে পারলুম না, ওরা গেলই!"

"চলে যাওয়াটাই মন্দ নয়! 'তোমার কাজ করবনা'—এ সোজা কথায় রাগ করবার কিছু নেই। কিন্তু চলেও যাবনা আর থেকে কাজের চেয়ে অসন্তোষই দেখাব বেশি, এ-ব্যাপারটাকে হজম করে নেওয়া মুস্কিল!"

"প্রত্যেক বছর হাজার-হাজার গ্রাজুয়েট তৈরীর মেশিন একটা আছে বলে তুই তোর লোকদের চলে যাওয়াকে পরোয়া করিস নে! কিন্তু আমার অবস্থাটা ভেবে দেখ দিকিনি—মিলগুলোতে ডবল-সিফ্‌টে কাজ চলেছে, কাজ-জানা মজুর নিয়ে লোফালুফি লেগে গেছে, নিলেমের ডাকে উঠেছে ওদের মজুরী—তার মানে কাজ-জানা লোক বেশি নেই। ওইত অবস্থা! এখন যদি সেখান থেকে মারীর ভয়ে লোক পালাতে সুরু করে তাকে তুই ঘোরতর ক্রাইসিস্‌ বল্‌বিনে?"

দু'কাপে চা নয় কতগুলো ধুঁয়া পুরেই যেন নিয়ে এলো সীধু।

"গুড্‌"—মহীতোষ তারিফের চোখ নিয়ে তাকাল সীধুর দিকে তারপর সুদাসের দিকে তাকিয়ে বল্‌লে: "সুশিক্ষিত ভৃত্যের সেবা পাওয়া একটা গ্রেট ব্যাপার!"

তারিফ গিলবার সময় নেই সীধুর—কখন সাইরেণ বাজে কে জানে—পনেরো মিনিটের জন্যে রান্নার হাঙ্গামটা চুকোতে পারবেনা তাহলে

"বোমার ভয় দেখিয়েও সীধুকে তাড়ানো যাচ্ছেনা!"

"হাজার প্লেন এলেও বুদ্ধিমানরা কল্‌কাতা ছাড়ছেনা এবার!

মফঃস্বলে একবার পালিয়ে গিয়ে কেউ আর আস্ত ফিরতে পারেনি ত !"

"হুঁ"—সুদাস নিজের মনে ডুবে থাকতে চেষ্টা করল আর সেখানকারই একটা বুদ্বুদ ফুটে উঠল তার মুখে : "হেভি এয়ার-রেডে ডিস্‌লোকেশ্যনের ভয় আছে !"

"তার ভূমিকা ত আমার মিলেই দেখা যাচ্ছে !"

"তাহলেও আর কি উপায় আছে বল্—বড় বড় অফিস-ফ্যাক্টরীর যে-অবস্থা হ'বে আমাদেরও তাই !"—নিরুপায়ের মতো হাসতে সুরু করলে সুদাস : "তবে লেট্ আস্ থিঙ্ক্ যে এটা নুইসেন্স বোম্বিং !"

"এই দুর্ভোগের কোনো মানে হয়না !"

"মন্দ কি ? আমার ত বেশ লাগছে। যুদ্ধের আবহাওয়ায় জীবন কাটাচ্ছে সমস্ত য়ুরোপ অষ্ট্রেলিয়া আর অর্দ্ধেক এশিয়া—আমরা সে-দুর্ভাগ্যে বঞ্চিত হ'তে যাই কেন ? বোম্বিং-এর সময় ত বেশ একটা থ্রিল হয় আমার, সমস্ত পৃথিবীর অদ্ভুত জীবনের সঙ্গে নাড়ীর টান অনুভব করি !"

"রোমান্টিক হলে অনেক কিছুই অনুভব করা যায়।" বারবার চোখ টিপে আরেকটা সিগারেট তুলে নিল মহীতোষ।

"কিন্তু রোমান্টিক ত আমি নই !"

"তাই না কি ?"

"তাই।" অনাবশ্যক জোর দিয়ে ওইটুকু কথা বল্‌লে সুদাস।

সিগারেটটা ঠোঁটে লাগিয়েই হাসতে লাগল মহীতোষ। ভাব্‌তে পারলেনা সুদাস নিজেকে কেন অস্বীকার করছে। শ্যামলীকে নিয়ে দুজনের মধ্যে যে-একটা সঙ্কোচের সম্বন্ধ গড়ে উঠেছিল এখন আর তা থাক্‌তে পারেনা। সুদাস সে-সম্বন্ধটাকে টিকিয়ে রাখতে চায় কেন ?

"হয়ত তুই শ্যামলীর কথা বল্‌বি—" নিজে থেকেই সুদাস নিজেকে পরিষ্কার করে তুল্‌তে চাইল : "জীবনের সে-একটা

পুরোণো অধ্যায়। প্রবীর যেমন একদিন আমার বন্ধু ছিল—শ্যামলীও একদিন পরিচিতা ছিল আমার।”

মুখ থেকে হাসিটা হঠাৎ নিভে গেল মহীতোষের: “একদিন পরিচিতা ছিল মানে?”

“মানে শ্যামলীর সঙ্গে আমার আর এখন সম্বন্ধ নেই।”

“মানে তাই হয় কিন্তু কেন?” চোখে আগ্রহ নিয়ে চেয়ে রইল মহীতোষ।

“মানুষের সম্বন্ধগুলো ষ্টীলে তৈরী নয় যে শীগগীর ক্ষয় হবেনা!”

“ষ্টীলে তৈরী নয় কিন্তু ষ্টীলে তৈরীর মতো হতে পারা কম কথা নয়।”

সুদাস চুপ করে গেল। এখনও চুপ করে না গেলে হয়ত সে অসংযত হয়ে পড়বে। জীবনের বৃত্তে যাকে সে ঠাঁই দিতে চায়না, কি দরকার আছে তার সম্বন্ধে অসংযত কথা বল্‌বার। তার মুখের অসংযম হয়ত মহীতোষকেও অসংযমী করে তুল্‌বে। সুদাসের বিরোধিতা করবেনা মহীতোষ। তাছাড়া মহীতোষ জড়িতও ছিল শ্যামলীর নিতান্ত ব্যক্তিগত জীবনের সঙ্গে। একদিন ত সুদাস ভালো-বাসত শ্যামলীকে! একদিন যাকে ভালোবাসত তাকে অসম্মান করবার কুরুচি সুদাসের নেই।

সিগারেটটা হাতে নিয়ে মনোযোগ দিয়ে ছাই ফেল্‌তে সুরু করলে মহীতোষ: “শ্যামলীর সঙ্গে তোর এমন হতে পারে তা আমি ধারণাও করতে পারিনে সুদাস। অনেক ভালো মেয়ের চেয়ে ভালো ও মেয়ে!” মহীতোষের গলা আন্তরিকতায় ভারি।

“থাক্ ওকথা। অন্য কথা বল! মিলে স্পিনিং এরেঞ্জমেন্ট কবে করছিস্?” নিজেকে হাল্কা দেখাবার জন্যে সোফার উপর নড়ে চড়ে উঠ্‌ল সুদাস।

“ও আর লাভের টাকায় হবেনা—” অমনোযোগী থেকে বল্‌লে মহীতোষ।

"যে করেই হোক করে ফ্যাল্—যুদ্ধের শেষ বলেও একটা সময় আছে। স্মল স্কেলে ব্যবসা আর তখন চলবেনা—আমি বেপরোয়া ব্রাঞ্চ করে যাচ্ছি তাই—ডুবলে ত ওম্নি ডুবব, তবে জাঁকিয়ে বসবার একটা চান্স নিইনা কেন?"

"যুদ্ধের শেষে ত কম্যুনিজ্ম্—" ব্যবসার আলাপে ফিরে এলো মহীতোষঃ "কি দরকার আর ওর পেছনে পরিশ্রম করে?"

"যুদ্ধের শেষে কম্যুনিজ্ম্ জিনিসটা নিশ্চয়ই প্রবীরের?"

"প্রবীর ঠিক কম্যুনিজ্ম্ বলেনা—জনগণের হাতে ক্ষমতা যাওয়ার কথা বলে।"

"আমরাও ত জনগণ?"

"হওয়াত উচিত!"

তুজনেই ওরা হেসে উঠ্ল। হাসির শব্দে উদ্বিগ্ন হয়েই উঁকি দিয়ে গেল সীধু—অনেকদিন সুদাসকে হাস্তে শোনেনি ও।

মহীতোষেরও আর সেই উদ্দাম উচ্ছলতা নেই। শালীনতায় সংযত করে নিয়েছে নিজেকে—থেমে গেছে, ঠাণ্ডা হয়ে গেছে যেন রক্তের চঞ্চলতা। কেন? বয়েসের দরুণ, বিবাহিত জীবনের দরুণ, ব্যবসার দরুণ? এই সাধারণ ঘটনাগুলোর উপরে থাকবার মতো কি প্রাণশক্তি ছিলনা তার? থাক্‌লে যেন ভালো হ'ত। সেই মহীতোষকে যদি পাওয়া যেত যার অদ্ভুত কথায় আর কাজে নিজেকে ভুলে থাকা যায়, নিঃসঙ্গতায় নিজেকে নিয়ে থাক্‌তে দিতনা যে মহীতোষ! তাকে আর পাওয়া যাবে না। এই ত কথা বলে গেল সে খানিকক্ষণ, বসে গেল মুখোমুখি—সুদাসের মনে হয়েছে নিজেকেই যেন আলাদা জায়গায় বসে থাক্‌তে দেখছে সে। তারই মতো নিষ্প্রভ মুখ, নিরুত্তাপ কথাবার্ত্তা!

কিন্তু তবু যেন এতক্ষণ মনকে উপরে ভাসিয়ে রাখবার একটা আশ্রয় ছিল। মহীতোষের যাবার পর থেকে আবার ঘরটাতে নিষ্প্রাণ স্তব্ধতা। সমস্ত দিনরাত্রি সমস্তক্ষণ সাইরেন পড়ে আছে

তার ঘরে—কখনো আর অল্‌ক্লিয়ার হবেনা! গ্রহণ-লাগা মন! মহীতোষ যদি তার আগের জীবনে চলে যেত! তার সেই উচ্ছৃঙ্খল জীবনের সঙ্গী হওয়া কি ভালো নয় এ ভাবে থাকার চেয়ে? পচে যাওয়ার চেয়ে কি অপচয় ভালো নয়?

লেকে যাবে কি সুদাস—রাত্রি ন'টায় বা দশটায়? সেই মেয়েটি এখনও আসে কি লেকে? হয়ত কলকাতায় নেই—বোমার ভয়ে পালিয়ে গেছে। থাক্‌লেও সাইরেন বাজে বলে হয়ত আর লেকে আসেনা!

অবাক হয়ে যায় সুদাস—বিষণ্ণ হয়ে যায়। কবেকার দেখা সেই একটি মেয়েকে আজও ভুলে যায়নি সে! কতো অসংখ্য পুঁজিওয়ালা, দালাল, ফড়ে, উমেদারের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় হয়ে গেল তার—কতো লাভলোকসান, দাদনসুদের স্রোত বয়ে গেল, চোখ বুলিয়ে নিল সে কতো বড় বড় অঙ্কের উপর—কাজের এই বিরাট পাহাড়ের নীচে থেকেও মরে গেলনা দুমিনিটের দেখা একটি মেয়ের মুখ? কথার স্তূপে চাপা পড়ে গেলনা সে, কাজের স্রোতে ভেসে গেলনা, চোখ তাকে ভুলতে পারলনা! আশ্চর্য্য! অদ্ভুত তার মনের আচরণ! মানে, কোনো মেয়েকে ভুলবার শক্তিই নেই তার মনের।

শ্যামলীকে ভুলে থাকবার ইচ্ছা-ও কি তাঁর মনের সঙ্গে জবর দস্তিই নয়? রোদের দিকে এগিয়ে যায় যে ডালপালা কোন্‌দিকে জোর করে তার মুখ ফিরিয়ে দেবে সে?

কিন্তু ফিরিয়ে দিতেই হবে। একটা কিছুকে জড়িয়ে ধরতে হবে। জোর করেই হোক কিছু নিয়ে ব্যস্ত হ'তে হবে তাকে—যাতে তার দিন হয়ে ওঠে অনবসর। কি যে তা—সুদাস তা জানে না—খুঁজে নিতে হবে তেমন কিছু। এভাবে পচে যেতে দেওয়া যায়না নিজেকে। বাঁচতে হচ্ছে যখন বাঁচতেই চাই, পচতে চাইনে।

ভাবনার কিছু ছিলনা শমীনের মতো যদি তার সাহস থাকৃত!

ভাবতে না চাইলেও ভাবতে পারে শমীন একটা কিছু সে করেছে। আন্দোলন সফল হ'লনা—দেশের পক্ষে তা দুঃখের হতে পারে কিন্তু ব্যক্তির মনের কাছে তা বড়ো কথা নয়! আন্দোলন করবার সার্থকতায়ই ভরে আছে শমীনের মন—পরিপূর্ণ সে-মন আনন্দের, উৎসাহের, উদ্দীপনার পবিত্রতায়। ঈর্ষা করতে ইচ্ছা হয় শমীনকে—তার সহজ, সরল, উজ্জ্বল, মধুর জীবনকে শ্রদ্ধা করতেও ইচ্ছা হয়। নিরাবরণ শুভ্র পাহাড়কে প্রণাম করতে ইচ্ছা হয়না কি—প্রণাম করে না কি তাকে অরণ্যের জটিল অন্ধকার?

১৯৪৩

এক

হুতাশে যেন ফিরে এলেন শরৎবাবু কল্‌কাতায়। বোমার ভয়ে কী রাজ্য ফেলে তিনি মফঃস্বলে পড়ে ছিলেন! বোমার আবার একটা ভয়—ক'টা দিনই বা আর উৎপাত হ'ল আর মরলও বা ক'জন? পরিচিতের পরিচিতদেরও মধ্যে ত কেউ মারা গেছে বলে শুন্‌লেন না তিনি! অথচ কল্‌কাতা ছেড়ে ম্যালেরিয়ায় আর কেরোসিন-চিনির অভাবের মধ্যে গিয়ে বসেছিলেন এতদিন! তবে হ্যাঁ, মিলিটারী কন্‌ট্র্যাক্ট যারা জুটিয়েছে তাদের ওখানে বসে থাকার মানে আছে—নূতন নোটের গাদায় বসে থাক্‌লে মশা, অন্ধকার আর গুড়ের সরবতেও অরুচি ধরে না। কন্‌ট্র্যাক্ট পাবার জন্যে গোপনে দু'একটা উঁকিঝুঁকি যে না দিয়েছিলেন শরৎবাবু এমন নয় কিন্তু ছেলেছোকরাদের ভীড়ে এগোতে সাহস করলেন না। কন্‌ট্র্যাক্ট পেয়ে গেলেও সমবয়সীদের কথার জ্বালায় কাজ করবার কি উপায় ছিল? 'বুড়োবয়সে কন্‌ট্র্যাক্টে জড়িয়ে কি জাপানীদের হাতে প্রাণ দেবে শরৎ?'—হয়ত বলতেন তাঁরা। সন্ধ্যাআহ্নিক ছেড়ে' তিন বেলা তাঁরা রেডিওতে কান পেতে আছেন এখন—জাপান হয়ে উঠেছে জপমন্ত্র! কি দরকার মফঃস্বলের এই সঙ্কীর্ণতায় মুখ গুঁজে মরবার! বাঁচতে হয় কলকাতায়ই বাঁচবেন শরৎবাবু, মরবেন এখানেই, যদি মরতে হয়। আর রোজগারের কথাই যদি বলো—কনট্র্যাক্টরিতে ফেঁপে উঠলেও মফঃস্বল মফঃস্বলই—কলকাতার কাছে সেই বারিবিন্দু! টাকার এই যে ঢেউ এসে মফঃস্বলে পৌঁচেছে তার উৎস কোথায়?—কল্‌কাতায়। এই ঢেউ-এ চোখ ধাঁধিয়ে যাবে কেন শরৎবাবুর, এই খালবিলের ঢেউ-এ? যেতে হয় খোদ নদীতেই যাবেন তিনি। তাছাড়া সুদাসকে চিঠি লিখে জবাবে যে খবর

পেলেন তাতে আর এক মুহূর্ত্তও এখানে বসে থাকা যায়না। চালের সব মোটা মোটা কনট্র্যাক্ট-সাবকনট্র্যাক্ট নাকি বেরিয়ে যাচ্ছে, শরৎবাবু গিয়ে অনায়াসেই এক-আধটাকে পাকড়াও করতে পারেন।

অমিতাকে সঙ্গে আনবার ইচ্ছা ততটা ছিলনা আর এবার শরৎবাবুর। ওকে বিয়ে করা যখন অসম্ভবই তখন ও একটা বোঝা ছাড়া আর কি? -সোজা সহজ কথা তাঁর! অমিতার দূরসম্পর্কীয় মামা রাজী ছিলেন কিন্তু অমিতার দেখা যাচ্ছে ঘোরতর আপত্তি। শমীনের আপত্তিরই ছোঁয়াচ হয়ত লেগেছে অমিতার মনে! যাক্—বিয়ের নেশা শরৎবাবুর আর নেই—যে ক'টা দিন আছেন সচ্ছল-ভাবে কেটে গেলেই হল। এ বয়েসে টাকাটাই আসল। কিন্তু যাবার দিন বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ অমিতা এসে উপস্থিত হল তার মামাবাড়ি থেকে মামার সঙ্গে। মামা বললেন, কলকাতা যাবে অমিতা—আপনিই ত ওর আশ্রয়, আপনি ছাড়া ··ইত্যাদি; অমিতা শুধু বললে, কলকাতা যাবে। যাবে ত চলুক—শরৎবাবু নির্ব্বিকার ভাবে বললেন। কিন্তু মন তাঁর ততটা নির্ব্বিকার থাক্তে চাইলনা, মামা কি ওকে রাজী করিয়ে নিয়ে এলেন? কিন্তু মামার কাছে ওই ইত্যাদি-র মতো ছাড়া পরিষ্কার কোনো কথা পাওয়া গেলনা, অবশ্যি পরিষ্কার কোনো প্রশ্ন করতেও সঙ্কোচ ছিল শরৎবাবুর।

পুরোণো বাড়ি হাতছাড়া হয়ে গেছে। মফঃস্বল ছেড়ে কলকাতায় আসার মতো বিচক্ষণতা শরৎবাবু ছাড়াও অনেকেরই ছিল। তাছাড়া বর্ম্মার ভীড়! তিনি নিজেও বর্ম্মা-ফেরত কিন্তু তা বলে বর্ম্মা থেকে আসা এই নূতন অতিথিদের সহ্য করা যায় না! বাড়িগুলো নিয়ে লুটপাট সুরু করে দিয়েছে—বোমার ভয় নেই, টাকার পরোয়া নেই। বাড়ি ভাড়া নিলেমের ডাকে চড়িয়ে দিলে ওরা! সুদাস কোনো রকমে একটা ফ্ল্যাট যোগাড় করে দিয়েছে—আগে গোটা বাড়িটার ভাড়ায় তিন কোঠার এক চিল্‌তে ফ্ল্যাট—শ্বাস নেবার যো নেই, নড়াচড়া ত দূরের কথা! শমীনের জন্যেই এই দুর্ভোগ।

বাড়িটাতে থেকে নিরিবিলি প্র্যাকটিস্ করতে কি হয়েছিল তার? বাড়িটা ছেড়ে দিয়ে জেল খাট্‌তে চলে গেল! জেল খাটলেই যেন উদ্ধার হয়ে গেল দেশ! একমাসে স্বরাজ পাবেন আশায় শরৎবাবুও জেল খেটেছেন—তারপর পঁচিশ বছর চলে গেছে, মরীচিকার মতো পেছনেই হটছে স্বরাজের আশা। ওসব কিছু হবার নয়—জেল খাটছে খাটুক শমীন—পরে বুঝতে পারবে কিছু হবার নয়। ওটা বুঝতে পেরেই স্বদেশী ছেড়ে দিয়েছেন শরৎবাবু—শমীনও বুঝতে পারবে একদিন! তবে স্বদেশীর রং গায়ে মাখা থাক্‌লে প্র্যাকটিসের কিছু সুবিধে আছে—ওটুকুই যা লাভ! স্বদেশীর দৌলতেই যে এসেম্‌ব্লির টাকাটা, এ কথা শরৎবাবু কৃতজ্ঞচিত্তে স্বীকার করেন।

ছোট ফ্ল্যাটে খুব বেশি যে ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে শরৎবাবুর তা নয়। বাড়িতে থাকেনই বা তিনি কতক্ষণ? সারাদিন ইঁদুরের মতো দৌড়ুচ্ছেন। কখনো খদ্দরের ধুতিপাঞ্জাবিতে, কখনো পাৎলুন আর গলাবন্ধ কোটে। পুরোদস্তুর স্যুটে বেরোতেই পরামর্শ দিয়েছিল সুদাস, এ বয়েসে নূতন করে ও-পোষাক ধরতে কিছুতেই রাজি হলনা মন। তাই আধাআধি ব্যবস্থা হল—পাৎলুন আর গলাবন্ধ কোট। সুদাসের কথা একেবারে অবহেলা করা চলেনা। বুদ্ধিমান ছেলে সুদাস—ব্যবসা শিখেছে বলতে হয়। ধুতিপাঞ্জাবি ব্যবসার বাজারে সব সময় খাটেনা—সুদাস মিথ্যা বলেনি! এক'দিন সুদাসের সঙ্গে চলাফেরা করে সুদাসের গুণমুগ্ধ হয়ে উঠেছেন শরৎবাবু—অনুগতই হয়ে উঠেছেন বলা যায়। শরৎবাবুর এ আনুগত্য সুদাস অসঙ্কোচে গ্রহণ করে যাচ্ছে, তার কারণ সুদাস মনে করে ভদ্রলোকের বিষয়বুদ্ধির খুবই অভাব।

"একেই ত তিন হাত ঘুরে আপনার কন্‌ট্র্যাক্ট তাতে আবার পার্টনার জুটিয়ে বস্‌লেন কেন?" কয়েকদিন অনুপস্থিতির পর একদিন এসে জিজ্ঞেস করল সুদাস।

"আলীর কথা বলছ? গাঁয়ের হাটবাজার গেরস্ত মহাজনের চেনা-জানা লোক কোথায় পাব? খুব একটা কম পার্সেন্টেজে রাজী হয়ে গেল ও। পুরোণো বন্ধুমানুষ—সেই নন্‌কোঅপারেশন যুগের পরিচয়!" কৈফিয়ৎ দিতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন শরৎবাবু।

পাছে নন্‌কো-অপারেশন যুগের কাহিনী এই নিয়ে একশ একবার শুনতে হয় তাই উচিতেরও বেশি বিরক্ত হয়ে সুদাস প্রায় ধমকে উঠল: "কিছু বুঝতে চাইবেন না আপনি, জিজ্ঞেস করবেন না কোনো কথা—চট করে একটা কাজ করে বস্‌বেন!"

"ভুল হয়ত করেছি—" শরৎবাবু মীইয়ে গেলেন: "বলো ত কি করা উচিত ছিল?"

"ব্যাঙ্ক থেকে টাকা নিয়ে ডিরেক্ট দাদনের ব্যবস্থা করলেন না কেন আপনি—বেতনে কাজ করতেন না হয় আলীসাহেব। তা না করে ওর সঙ্গে পার্সেন্টেজে রাজী হয়ে বস্‌লেন! ফাইভ পার্সেন্ট সুদে ব্যাঙ্ক আপনাকে টাকা দিত। অন্য কনট্র্যাক্টরদের কাছ থেকে টেন্‌-টুয়েল্‌ভ নিই—আপনি পেতেন ফাইভে! পাঁচজনকে দিয়ে-থুয়ে আমাদের থাকবে কি?"

"সত্যি ব্যাঙ্কের কথাটাই ভাবা হয়নি, ভাবলুম হাতে টাকা নেই—ঠিক তেম্নি সময়ে আলী বললে সে-ই টাকাটা ইনভেষ্ট করবে—"

"আপনি যে একটা ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর তা-ও মনে হলনা? মনে হলনা আমি যে আপনার পার্টনার? আশ্চর্য্য!"

"ভাবলুম সিকিউরিটি ছাড়া ব্যাঙ্ক কেন টাকা ইনভেষ্ট করবে,—"

কয়েক সেকেণ্ড চুপ করে থেকে হাসিতে ফেটে পড়ল সুদাস: "সিকিউরিটি নিশ্চয়ই চাই! ব্যাঙ্কের ডিরেক্টর কি ব্যাঙ্কের কাছে যথেষ্ট সিকিউরিটি নয়?"

হয়ত নয়—শরৎবাবুর মনের ভীরুতা মনে মনে বলতে থাকে—হয়ত নয়। টাকা-পয়সা লেনদেনের যে প্রতিষ্ঠান, শ্লথ, শিথিল

নিয়মে চলা তার উচিত নয়—থাকা চাই তার কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা —শরৎবাবুর সেকেলে মন অন্তত তা-ই বলে। কিন্তু তা প্রকাশ করতে পারেন না। কে বলবে ব্যবসার উন্নতির পক্ষে তাঁর বিচারই সত্য? সুদাস যখন যুক্তি দিতে সুরু করবে, নিজের ভুল ধারণার জন্যে হয়ত তখন তাঁকে লজ্জিত হ'তে হবে!

শরৎবাবুর চুপ করে যাওয়াতে সুদাস একটু শান্ত হয়েই এলো। ব্যাঙ্কের পলিসি এতোটা সরাসরি বলে ফেলা উচিত হয়নি—শত হোক শরৎবাবু একজন ডিরেক্টর। ভাবতে পারেন শরৎবাবু ব্যাঙ্কটাকে সুদাস নিজের উপার্জ্জনের যন্ত্র হিসাবেই ব্যবহার করছে! এক-আধটু যে সুদাস তা করছেনা এমন নয় কিন্তু ব্যাঙ্ককে যথেষ্ট লাভ করিয়ে দিয়ে উপরি একটা টাকা নিজের হিসেবে টেনে নেওয়া নির্দ্দোষ নয় কি? কনট্র্যাক্টাররা ক্যাপিটেল পেলে লাভের অর্দ্ধেকটাও সুদ বাবদ ছেড়ে দিতে রাজী—সুদাস তাদের উপর জুলুম করতে চায়না—টাকা নিক তারা, ব্যাঙ্ক দশ পার্সেণ্ট পেলেই খুসী আর আড়াই পার্সেণ্ট দিক সুদাসকে। এই নির্দ্দোষ ব্যাপারটার দোষ সম্বন্ধে সুদাস খুবই সচেতন, সে চায়না কোনো ছিদ্রপথে তা প্রকাশ্য হয়ে পড়ুক। একটু আগে নিজেই সে সেই ছিদ্রপথ তৈরী করতে সুরু করেছিল বলে এখন অনুতপ্ত। তাড়াতাড়ি তাই প্রসঙ্গটাকেই ঘুরিয়ে দিতে হল তাকে:

"নূতন দু'একটা কনট্র্যাক্টের চেষ্টা করুন এবার—পরিচিত লোকের ত অভাব নেই আপনার!"

"নাঃ—" শরৎবাবুও যেন অনুতপ্ত হয়ে পড়েছেন: "একটাই হোক। দৌড়ুদৌড়ি আর খোসামোদ ভালো লাগে না! দৌড়ুদৌড়ি করতে পারবনা বলেই ত আলীকে দিয়ে দিলুম সব ঝক্কি!"

"কিন্তু এ-চান্স হারানো কি উচিত হবে? কত লক্ষ মণ চাল যে কেনা হ'বে তার ইয়ত্তা নেই!"

"একা মানুষ আমি—খুব বেশি টাকায় আমার কি দরকার বলো—কোনোরকমে চলে গেলেই হ'ল!"

"কোনোরকমে চালাতে গেলেও আজকাল বেশি টাকারই দরকার। আপনারা চাল কিন্‌ছেন, চালের দাম হু-হু করে বেড়ে যাবে যদ্দিন না গভর্ণমেণ্ট বাঁধা দরে চাল বিক্রি সুরু করেন। আর চালের দাম বেড়ে যাওয়ার মানে সমস্ত জিনিষের দামই চড়ে যাওয়া। তাছাড়া কে বলবে জাপানীরা ল্যাণ্ড করবেনা—বাংলার বাইরে পালিয়ে গিয়ে যদি কোথাও আপনার বাঁচতে হয় টাকা না হলে ত বাঁচতে পারবেন না আপনি। বর্ম্মা থেকে চীনেরা যে পালিয়ে এসেছে আর কিছু ওরা সঙ্গে না আনুক—দশ বিশ বছর এখানে থাকবার মতো টাকা নিয়ে এসেছে!" রুমাল দিয়ে মুখ ঘষতে সুরু করে সুদাস—ঘাম মুছবার ইচ্ছায় হয়ত নয়, মুখে যদি অর্থলোভের চিহ্ন দেখা যায় তা ঢাক্‌বার জন্যেই।

"ঠিকই বলছ তুমি।" একটু চুপ করে থেকে অসহায়ের মতো হাসলেন শরৎবাবুঃ "কিন্তু কি জানো, ওসব কনট্র্যাক্টের কাজ করতে গেলে নিজের কাছে যেন পরিষ্কার থাকা যায়না! পরিষ্কার থাকার বয়েস ত হয়েছে!"

শরৎবাবুর হঠাৎ-বৈরাগ্যে সুদাস মনে মনে কৌতূহলী হয়ে উঠল। সাতদিন আগেও কনট্র্যাক্ট পাবার জন্যে মেতে উঠেছিলেন যিনি, উৎসাহ ছিল যার আঠারো বছরের যুবকের মতো হঠাৎ তাঁর ঝিমিয়ে পড়বার কি কারণ থাকতে পারে? অমিতার সঙ্গে সুদাসের কয়েকদিন দেখাশোনা আর আলাপের ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বলেই কি? কিন্তু অমিতার সঙ্গে সুদাসের ঘনিষ্ঠতার সম্ভাবনা আর কই? অমিতার কঠোর ঠাণ্ডা ব্যবহারকে উষ্ণ বা অমায়িক করে তুলবার মতো সম্মানহানিকর ধৈর্য্য সুদাসের নেই। তাছাড়া তির্য্যক হয়ে আছে যে মন তাকে সোজা সহজ ভঙ্গীতে নিয়ে আসার চেষ্টা-টা যে পণ্ডশ্রম হবেনা তা-ও বা কে বলতে পারে? বাঁচতে থাকুক অমিতা

শরৎবাবুর আশ্রয়ে তার দুর্বুদ্ধি নিয়ে। অমিতার জন্যে সুদাস সম্ভ্রম বা সম্মান বিসর্জ্জন দিতে পারে না। যদি সামান্য চেষ্টায় অমিতার আন্তরিকতা পাওয়া যেত—অনায়াসলভ্য হত যদি অমিতার উন্মুখতা সুদাসের আপত্তি ছিলনা। তারই একটা পরীক্ষা মাত্র করতে চেয়েছিল সে—শরৎবাবুকে কল্‌কাতায় ডেকে আনবার প্রেরণা তার সেই পরীক্ষারই জন্যে। পরীক্ষায় সে বিফল হয়েছে। কিন্তু বিফলতায় আহত হয়নি। অমিতা সম্বন্ধে তার আর উৎসাহ ছিলনা—কিন্তু উৎসুক হতে হল এখন। শরৎবাবুব আশ্রয় থেকেও কি মুক্ত হয়ে এল অমিতা? বিচিত্র নয়। বড়ো বেশি উজ্জ্বল দেখাচ্ছিল এবার অমিতার চোখ—একটা দীপ্তির প্রতিফলন যেন—অন্ধকার ভবিষ্যতের ধূসবাভ ছায়া নয় আর।

"তোমাদেব বয়েস অল্প—" শরৎবাবু লক্ষ্য করছিলেন সুদাসের ঠোঁটে একটা কৌতুকেব হাসির আভাসঃ "সব কিছু করাই তোমাদের মানায়। অন্যায় কবলেও। অনেকখানি জীবন পড়ে আছে—অনেক সময় আছে হাতে—অন্যায় যদি কর মুছে ফেলার অবকাশ পাবে!"

"এসব কথা আপনি কেন বলছেন, বলুন ত?" শরৎবাবুর মুখের চেহারায় অস্বস্তি বোধ করছিল সুদাস।

"কি জানি, কনট্র্যাক্ট-টার পর থেকে ভালো লাগছেনা!"

ভাল লাগছেনা! ভালো কি সুদাসেরও লাগে? তবু ব্যবসা করতে গেলে ব্যবসাকে ভালো লাগাতে হয়। একটা কিছুকে ভালো না লাগালে জীবনও কি চলতে চায়? কোনো সৌন্দর্য্য, কোনো আকর্ষণ, কোনো মোহ জীবন এনে সহজভাবে তুলে ধরেনা আমাদের চোখের উপর। আমাদের সৃষ্টি করে নিতে হয় মোহ।

"জলে বাস করে জল আপনার ভালো লাগছে না?" আবার অভিভাবকত্ব ফুটে উঠল সুদাসের গলায়ঃ "কে না আজ কনট্র্যাক্টরি করছে—সাপ্লাই ছাড়া কারো মুখে কোনো কথা শুনতে পাবেন?

আমার অফিসের লোকেরা অফিস ছুটির পর কুইনাইন আর এমিটিনের দালালী করে বেড়ায়!"

শরৎবাবু কথা বললেন না—তাকিয়ে রইলেন শূন্য চোখে সুদাসের দিকে। চোখের কোণগুলোতে ছোট ছোট জ্যামিতিক রেখায় ফাটল ধরেছে মনে হয়—ঠোঁটের দু'কোণ থেকে খানিকটা করে মাংস ঝুলে গেছে নিচের দিকে—থুতনির পেছনের মাংস ক্ষয়ে গিয়ে তুমড়ে উঠেছে চামড়ার আটসাঁট বাঁধুনি—সত্যি বয়েস হয়েছে শরৎবাবুর। বার্দ্ধক্যের করুণ আভাস উঁকি দিয়ে যাচ্ছে মুখের মিনতিভরা ভঙ্গীতে। চোখ ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হল সুদাস। অভিভূত হয়ে লাভ নেই। মনে করে লাভ নেই শরৎবাবু শমীনেরই বাবা। শমীনকে মনে করেও বা কি লাভ? দুজনের মনের ব্যবধান কি বেড়েই চলবেনা দিনের পর দিন? যে প্রাণহীন আনন্দহীন শুষ্কতায় বাংলার বাতাস ভরে উঠছে শমীন তার কি খবর রাখে? শমীন জানে বাংলাদেশে আছে মেঘের স্নিগ্ধতা, নদীর সজলতা—জানেনা স্নেহসজল বাংলা শুকিয়ে মরুভূমি হয়ে গেছে!

"আচ্ছা—" বিচারকের ভঙ্গীতে প্রায় সুদাস উঠে দাঁড়াল: "আলী-সাহেবকে বলবেন—টাকার দরকার হলে ব্যাঙ্ক তাঁকে টাকা দেবে! খানিকটা সুদ যদি ঘরে আসে মন্দ কি?"

"ব্যাঙ্ক রাজি থাকলে নেবে না কেন টাকা?"

"ব্যাঙ্ক রাজি।" দুপকেটে দুহাত ডুবিয়ে দাঁড়াল সুদাস। দুপাশে শরীরটাকে একটু দুলিয়ে নিলে—জুতোর গোড়ালিটা বার কয়েক মেঝেতে ঠুকে তিনদিকের দেয়ালে চোখ বুলিয়ে শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল

আসবাবপত্র-ঠাসা পাশের ঘরের ছোট্ট একটু ফাঁকা জায়গায় মাদুর বিছিয়ে অমিতা চরকা কাটছিল। এই নূতন আসবাবটী

শমীন জোগাড় করে রেখে গেছে বাড়ির খাটআলনা টেবিলচেয়ারের সঙ্গে। আসবাবগুলো পৌঁছে দেবার সময় সুদাস বলেছিল: "চরকাটা হয়ত আপনার জন্যেই রেখে গেছে শমীন,—চরকায় সুতো কাটতে পারেন না কি আপনি?"

"পারিনে কিন্তু পারব!" অমিতা নারকেল তেল আর ন্যাকরা নিয়ে চরকা পরিষ্কারে লেগে গেল তক্ষুণি। মনে হল, ডুবে গেল এই অদ্ভুত যন্ত্রটার ভেতর। খানিকক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাওয়া ছাড়া সুদাসের আর তখন কিছু করবার ছিলনা।

সুদাসের উপস্থিতিকে ভুলে থাকবার জন্যেই আজও অমিতা চরকা নিয়ে বসে গেল। তারপর যদি সামনে এসে উপস্থিতই হয়, সুতোকাটায় ব্যস্ত বলে আলাপ না করেই বিদায় করা যাবে তাকে। ভালো-লাগেনা সুদাসকে অমিতার যেমন একসময় অমিতাকে ভালো লাগতনা সুদাসের। তখন অমিতাকে সুদাসের ভালো লাগতে পারত না কি? গরীব, নিরাশ্রয় একটি মেয়ের কাছে তার আশ্রয়দাতা সুবিধে খুঁজে বেড়াচ্ছে—এই ত ছিল অমিতার অপরাধ? সুদাসের চোখে-মুখে গঞ্জনা ফুটে বেরোত। অমিতা লক্ষ্য করেছে। বোঝাবার সুযোগ না পেলেও অত্যাচারের ব্যথা দুর্ব্বল অসহায়ের গায়ে লাগে। অত্যাচারকে মেনেও নিতে পারে সে হাসিমুখে—প্রতিবাদের সুযোগ জীবনে আসবেনা ভেবে। জীবনে হয়ত সে-সুযোগ আসেনা অনেকেরই—দুর্ব্বলতার হাসি নিয়েই তাদের বাঁচতে হয়, মরতে হয়। কিন্তু জীবনের কাছে সুযোগ প্রার্থনা কর—জীবনের রূপ সঙ্কীর্ণতায় সীমাবদ্ধ নয়, বিশাল তার পরিধি—সুযোগ সে এনে দেবে। তুমি জানোনা কল্পনাও করতে পারোনা কোথা থেকে আসবে সে-সুযোগ—কিন্তু সুযোগ আসে। ভাবতে কি পেরেছিল অমিতা কোনোদিন, রঞ্জন বলে একটি ছেলে অবহেলা নিয়ে চাইবেনা তার দিকে—কল্পনা কি করা যায় রঞ্জনের আর অমিতার চিঠি বিনিময়ের বাহন হয়ে উঠবে

শমীন? অম্বুর মতো আশ্চর্য্য মেয়ের সঙ্গে দেখা হ'বে তা-ই বা জান্ত কি অমিতা? শুধু প্রার্থনা—জীবনের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছে অমিতা মুক্তির জন্যে—যেন তুর্ব্বলের রুগ্ন হাসি নিয়ে তাকে মরতে না হয়! সে-প্রার্থনা শুনেছে হয়ত শমীন, শুনেছে অম্বু - পৌঁছিয়ে দিয়েছে তাকে জীবনের দ্বারপ্রান্তে। আর কেউ শোনেনি তা। সুদাস শোনেনি। শুন্‌তে পারত সুদাস তবু শোনেনি। তবে এবার অত্যাচারের প্রতিবাদ শুনুক সে।

অনেকগুলো সুতোর বিনুনি জমে উঠেছে এ ক'দিনে! এই সুতোতে কাপড় হ'বে? সে-কাপড় পরতে পারবে সে? বুক থেকে আনন্দের একটা ঢেউ উঠে গলার ভেতরে কোথায় যেন আছড়ে পড়ে—শ্বাস বন্ধ হয়ে আস্‌তে চায়। কি আশ্চর্য্য, পরবার কাপড় হবে ওই সুতো দিয়ে! তুলোগুলো জড়িয়ে জড়িয়ে কি করে এমন সুন্দর সুতো হয়ে যায়, তাও আশ্চর্য্য! আর সবচেয়ে আশ্চর্য্য অমিতা নিজে তৈরী করতে পারছে সুতো! এই আশ্চর্য্য সৃষ্টির পথে মন তার ছুটে বেরিয়ে গেছে কখন ঘরের বদ্ধ কারাগার থেকে মুক্ত আকাশের নীচে—তুলোর মতো সাদা মেঘ জড়ো করা অগাধ আকাশে—জ্যোৎস্নার রেসমি সুতো ঝরে পড়ছে যেখান থেকে।

শরৎবাবু এসে উঁকি দিয়ে চলে যাচ্ছিলেন। চাকার হাতলটা ছেড়ে দিয়ে বল্‌লে অমিতা: "শমীনের খবর পেলেন কিছু?"

"সুদাস খবর জানেনা!" শরৎবাবু দরজায় এসে দাঁড়ালেন।

"সুদাসবাবু না জানুক আর কেউ ত জান্‌তে পারে!"

খোঁজ নিয়ে হয়ত জানা যায়। এসেমব্লির কেউ হয়ত খবরটা জেনে দিতে পারেন। কিন্তু এই কন্‌ট্র্যাক্টের পর সে খবরের জন্যে উৎসাহী হওয়া কেমন যেন বেমানান মনে হয় শরৎবাবুর নিজেরই কাছে। কোন্ দিক যে উচিত বুঝতে পারছেন না তিনি। সবাই টাকা করছে বলে একবার মনে হয়েছিল তাঁর টাকারই বুঝি দরকার। কিন্তু শমীন তাঁর ছেলে, শুধু আত্মজই নয়, মনোজ।

কোনোদিন দেশের জন্যে একটু ব্যথা অনুভব করেছিলেন তিনিও, সে ব্যথা বিরাট হয়ে উঠেছে শমীনের মনে! এ-ব্যথাকে অস্বীকার করতে চাইলেও কি তিনি তা পারবেন? চরকাটার দিকে তাকিয়ে রইলেন শরৎবাবু—নিবিড় হয়ে এলো তাঁর চোখ।

"রঞ্জন আস্‌বে কি আজ? রঞ্জনকে বল্‌তে পারো ওর খবরটা জেনে দিতে?" অপরাধী পিতা আড়ালে মুখ লুকোতে চাইলেন।

"তাই বল্‌ব—আসেন যদি।"

"ওর সঙ্গে অনেক লোকের পরিচয় আছে—মেদিনীপুরের কারো সঙ্গে যদি জানাশোনা থাকে তার কাছ থেকেই জানতে পারবে খবরটা!"

"সরকারী দপ্তর থেকে আপনিও ত খবরটা জান্‌তে পারতেন।"

"কি দরকার?" শরৎবাবু চলে যাচ্ছিলেন।

"আপনাকে চা দিতে বলে এসেছিলাম মানিককে—ওর কিছু মনে থাকেনা—চা খেয়েছেন?"

এমন সহজ ধারালো ভঙ্গীতে কি অমিতা কথা বল্‌তে পারত আগে? দুর্ব্বলভাবে হেসে শরৎবাবু বল্‌লেন: "খেয়েছি।"

"আজ কতোটা সুতো কাটা হয়ে গেল দেখুন—এক ছটাক হ'বে, না?"

শরৎবাবুর আন্দাজ নেই, তবু মাথা নাড়তে লাগলেন।

"রঞ্জনদা বলছিলেন আমি না কি সেবাগ্রামের জন্যে তৈরী হচ্ছি!" চাকা ঘুরিয়ে চল্‌ল অমিতা।

"জার্নেলিষ্ট মানুষ ওঁরা—দুদিকেই কাটেন!" নির্দ্দোষ হাসিতে সুন্দর হয়ে উঠল শরৎবাবুর মুখের বার্দ্ধক্য।

"আমার কিন্তু আরো তুলো চাই—ওয়ার্দ্ধা কটন্।"

"এবার মানিককে নিয়ে যাবো সঙ্গে—এরপর থেকে ও-ই হয়রানি হোক।"

অমিতার চাকা থাম্‌ল না—ছোট্ট একটু পরিষ্কার হাসি ফুটে

উঠল ঠোঁটে। তুলোর পাঁজ থেকে ওর নরম নিটোল আঙুলগুলো সরে যাচ্ছে সুন্দর ছন্দে—যেন কোনো গীতযন্ত্রের গাঁটে আঙুল বুলিয়ে নিচ্ছে অমিতা। তাকালে ভালোই লাগত দেখতে শরৎবাবুর—কিন্তু তিনি তাকালেন না। চলে যাবার জন্যে তৈরী হলেন আবার।

ফ্ল্যাটের সদর দরজায় হঠাৎ তখন একা রঞ্জনই একটা কোলাহল তৈরী করে তুলেছে : "এই মানিক, চটপট চা করে ফ্যালো ত দুকাপ চার কাপ যা-ই হোক—আর তার সঙ্গে খানিকটা ফুড—মানে খাবার! না পারো ত আমিই হালুয়াটা তৈরী করে দিচ্ছি—ডাল আছে, ডাল? সুজির মোহন-মূরতি নয়—ডালের নিরেট হালুয়া—দিল্লীব্র্যাণ্ড!"

শরৎবাবু এগিয়ে এলেন : "এসো রঞ্জন—বাংলার মোহনমূর্ত্তিটাই চালাতে দাও মানিককে।"

"ক্ষিদে পেয়ে গেছে ভীষণ- চাকরি আমার পোষাবে না, কাকাবাবু!"

শরৎবাবুর বসবার আর শোবার ব্যবস্থায় জটিল ঘরটার এসে বসল দুজনেই। কাজের অজুহাতে এক্ষুণি বেরিয়ে যাবেন শরৎবাবু। তার মানে দেশপ্রিয়পার্কের একটা বেঞ্চিতে বসে থাকবেন খানিকক্ষণ। তার আগে রঞ্জনের সঙ্গে দুচার মিনিট আলাপ করে যাওয়া দরকার। ওদের যে তিনি সুযোগ দিচ্ছেন, চোখে আঙুল দিয়ে তা বুঝিয়ে দিতে চান না। এ বাড়িতে গোড়ার দিকে সুদাসও যখন প্রায়ই আসত, তিনি ইচ্ছা করেই বাইরে-বাইরে থাকতেন সে সময়টা। বাঁচবার ইচ্ছা যদি থাকে অমিতার বাঁচুক ও। অমিতার সে-ইচ্ছার উপর জবরদস্তি করে নিজের প্রয়োজনে তাকে টেনে আনতে চান না শরৎবাবু। আগেও তা চাননি! ভেবেছিলেন নিজের ইচ্ছায়ই অমিতা আসবে। অমিতা যাতে ইচ্ছুক হয় তারই একটা প্রস্তুতি ছিল নিজের মধ্যে তাঁর। বাইরে থেকে সে-প্রস্তুতি অন্যের চোখে

বীভৎস দেখাতে পারে—সমাজের ন্যায়বিচারে মনে হতে পারে গর্হিত—কিন্তু মনের বিচারে হয়ত তিনি অপরাধী বলে সাব্যস্ত হবেন না।

"তোমাদের যে চাকরির মেজাজ নেই—দেশের পক্ষে এটা শুভলক্ষণ!" জামা খুঁজতে সুরু করলেন শরৎবাবু।

"ভাবছি বাংলাদেশে এখন না এলেই হ'ত—এয়ার রেডের খবরটাতে একটু চঞ্চল হতে হ'ল—ভাবলুম একটা নূতন অভিজ্ঞতা হবে—আমিও এলুম আর জাপানীও পালাল। গতবছরটা বেশ কেটে গেল ওদিকে—বিপ্লবের একটা অভিজ্ঞতা নিয়ে এলুম!"

জামাটা গায়ে চড়িয়ে বল্‌লেন শরৎবাবুঃ "শমীনকে ছেড়ে দেবার সময় হ'ল কি না খবরটা নিতে পার রঞ্জন?"

"শুন্‌লুম ওর এক বছরের জেল হয়েছিল—ছুটিছাটা বাদ দিয়ে এখন ত আসবার কথা!"

"সঠিক খবরটা নেবার চেষ্টা কর না!"

"প্রবীরের বোন ত কবেই এসে গেছে—প্রবীর বল্‌লে। শমীনের আসা উচিত।" সহজভাবে কথাটা বল্‌তে গিয়ে কেমন যেন ঘোরালো করে তুল্‌ল রঞ্জন, নিজের কানেই ভালো লাগলনা শুন্‌তে।

"আচ্ছা—" বেতের লাঠিটা হাতে তুলে নিয়ে বল্‌লেন শরৎবাবুঃ "একটু কাজে বেরোতে হচ্ছে আমায়!" ঘর থেকে বেরিয়ে রান্নাঘরে উঁকি দিলেন তিনি, অমিতাকে পেয়ে উৎসাহিত হয়েই বললেনঃ "ডালের হালুয়ার কথা বল্‌ছিল রঞ্জন, শিখে রাখো ত কি করে তৈরী করতে হয়!"

অদ্ভুত মানুষ এই শরৎবাবু—অবাক হয়ে যাচ্ছে রঞ্জন! নিজেই কেবল সাধারণ সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে নন—সবাইকে তিনি সঙ্কীর্ণতার উর্দ্ধে ভেবে নিতে পারেন! উদারতার স্পর্শে উঁচুতে তুলে নিয়ে যাবার মন্ত্র জানা আছে তাঁর। তাঁর অভিভাবকত্বে তাই কারো বিকৃতির সম্ভাবনা নেই, খোলা আছে পরিপূর্ণ বিকাশের পথ। অমিতার

প্রথমদিনের মুখ মনে পড়ে রঞ্জনের। সার্থক বিকাশের জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে যে তাকে তেমনই গম্ভীর দেখায়—রঞ্জন তাকে বিষণ্নতা বলে ভুল করেছিল। আছ সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, হতাশার গভীরতাই ছিল সেদিন অমিতার চোখে।

"হালুয়া না-ই হোল, একটু চা পেলেও বাঁচা যেতো।" অমিতার দেরিতেই রঞ্জন একটা রুদ্ধ আবেগের তাড়া খেয়ে চল্‌ছিল সমস্ত শরীরে। কিন্তু রঞ্জন জানে এই চঞ্চলতার প্রশ্রয় অমিতার কাছে নেই। ধৈর্য্যে অভ্যস্ত অমিতার স্নায়ুগুলো—শীতল কিন্তু শীতালু নয়, দপ করে জ্বলে ওঠেনা বলে নিরুত্তাপ বলা যায় না তাকে।

হালুয়া-চা যা কিছু দিতে হবে রঞ্জনকে সব নিয়েই অমিতা এলো কয়েক মিনিট পরে।

"তোমার চিঠি পেয়েই কলকাতায় আসা—এখন দেখা যাচ্ছে এসেও কিছু লাভ হলনা!"

কোন্ কথা বল্‌বার জন্যে যে কি ভুমিকা সুরু করে রঞ্জন অমিতা বুঝতে পারে না, মুখ টিপে হাসতে থাকে তাই। জানে, নিজে থেকেই রঞ্জন সে ভূমিকা ছাড়িয়ে বক্তব্যে চলে আসবে। দেখা যাবে তখন, ভূমিকাটা যতো গম্ভীরই ছিল বক্তব্য অত্যন্ত সাধারণ। প্রথম দুয়েকদিন ভয়ই পেয়ে গিয়েছিল অমিতা, রঞ্জনের কথার শেষে হাঁফ ছেড়ে বল্‌তেও হয়েছে তাকে: 'এমন ভয় পাইয়ে দাও যেন কি সাংঘাতিক কথাই বলবে!' রঞ্জন সাদাসিধে উত্তর দিয়েছে: 'ওটা জার্নালিজমের অভ্যাস!'

"এখানে এসেও যদি এককাপ চায়ের জন্যে চায়ের দোকানের ভীড়ের দশাই হয় তাহলে বিদেশই ছিল ভালো!" অমিতার হাত থেকে চায়ের কাপটা তুলে নিল রঞ্জন।

"দেখা যাচ্ছে চা খেতেই কলকাতায় এসেছ তুমি?"

"চা খেয়েই কল্‌কাতা থেকে বিদায় নিয়েছিলাম কি না!"

অমিতা চুপ করে যায় কিন্তু মুখ তার উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

"বাংলাদেশের মেয়েরা সাংঘাতিক—এম্নি ওদের স্মৃতি যে কিছুতেই ভোলা যায়না—" রঞ্জন অমিতার উজ্জ্বলতার ভেতর থেকে একটা উষ্ণ প্রদীপ্তি টেনে বার করতে চেষ্টা করেঃ "বাংলার বাইরের মেয়েরা আমাদের পায়ে-পায়ে চল্‌তে পারে, হাত মিলিয়ে কাজ করতে পারে, এ-সহকর্ম্মিতায় ভালো যে না লাগে তা নয় কিন্তু ওদের কাছ থেকে চলে এলে মনে রাখবার মতো একটি কথাও থাকে না! ওরা ঝকঝকে দিনের মতো—বাংলার মেয়েরা রাত্রি!"

"তোমার ক্ষিদে পেয়েছে জানতুম—তা যে বক্তৃতার ক্ষিদে ভাবিনি!" চোখে কৌতুক ফুটিয়ে তোলে অমিতা।

"তোমরা তোমাদের জানো না বলেই আমাদের বক্তৃতা দিতে হয়!"

"তোমরাও কি তোমাদের জানো? কিন্তু তা বলে আমরা বক্তৃতা দিয়ে তা তোমাদের জানাতে যাইনে।"

কথা বন্ধ করে হালুয়াতে মনোযোগ দিলে রঞ্জন তারপর মুখ তুলে বল্‌লেঃ "প্রবীরের স্ত্রীকে তুমি হয়ত চিন্‌তেনা--প্রবীর—আমাদের বন্ধু—অনুর দাদা! এমন মিষ্টি চরিত্রের মেয়ে আমার চোখে পড়েনি কখনো—মিষ্টি বলেই ব্যাপারটা সাংঘাতিক। আর বেঁচে নেই বলেই হয়ত জীবনে ভুলতে পারবনা ওকে!"

"এক ধরেণের ছায়া-পূজারী আছে, তুমি বোধহয় তাই, রঞ্জনদা—" হেসে উঠ্‌ল অমিতা—সুরের ছোট ছোট নুড়ি ঢালু পথে গড়িয়ে গেল যেন।

"রোমান্টিক? হতে পারে। বল্‌তে পারো আমার পালিয়ে বাঁচার চেষ্টা-টা জড়িয়ে পড়বারই পূর্ব্বাভাস।"

"এতো বড় কথা আমি ভাবতেও পারিনে। আমার মনে হচ্ছিল স্মৃতি নিয়ে থাকৃতেই তুমি ভালোবাস!" একটা চেয়ারের হাতলে ভর দিয়ে বসবার ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে রইল অমিতা।

"ঠিক তা নয়। মানুষটাকে অস্বীকার করতে আমার মন চায় না

কিন্তু হয়ত আমার সাহসের অভাব।" রঞ্জন হাস্তে সুরু করলে ঃ "কিন্তু তোমার সাহসের কাছে হার মান্তে রাজী হলামনা!"

অমিতা ম্লান হয়ে গেল ঃ "তোমার কাছে কি সব আবোলতাবোল লিখতাম হয়ত চিঠিতে—"

"ওটা ভুল ধারণা। চিঠি-লেখায় তোমরা জিনিয়াস্—আবোল-তাবোল বরং আমাদের চিঠিতেই ছড়িয়ে থাকে।" রুমালে মুখ মুছে নিয়ে রঞ্জন সোজা হয়ে বসল ঃ "ক্ষিদের জ্বালায় কাণ্ডজ্ঞান ছিলনা বলে হালুয়াটা একাই খেতে হ'ল—কিন্তু চা-টা একা খাবনা!"

"সে কি, আমি এখন চা খাবনা—"অমিতা চেয়ার ছেড়ে সরে দাঁড়াল।

"তাহলে চা খাওয়া আর হলনা।"

"ও বুঝি শাস্তি দেওয়া সুরু হচ্ছে?"

"শাস্তি পাওয়াটাও ত সুরু করতে চাও তুমি! নিজে উপোস করে খাওয়ানোর অভ্যাসে শরৎচাটুজ্জে বাহবা দিতে পারতেন, আমি দিইনে।"

"আমাদের বুঝি বাহবা কুড়োবারই লোভ?"

"মোটেও তা বল্‌ছিনে। দুরবস্থায় থাকবার অভ্যাসটার কথাই বলছি!"

একটু অন্যমনস্ক হয়ে গেল যেন অমিতা। সহানুভূতিতে ও কি পুরুষ মেয়েদের অনুভূতি ছুঁয়ে যেতে পারে? পুরুষের ভালোবাসায়ও তাই নিজেদের একা, অসহায় মনে হয় একেক সময়। এই নিঃসঙ্গতা থেকে অমিতা নিজেকে মুক্তি দিতে পারেনা—ফাঁকা হয়ে ওঠে মন, ব্যথাহীন, আনন্দহীন, ধূ ধূ সাদা।

অমিতার এ অবস্থা অনেক সময়ই লক্ষ্য করেছে রঞ্জন আর মনে করেছে এ সময়টাতে মুখর হয়ে ওঠাই প্রশস্ত। মেয়েদের সেন্টি-মেণ্টাল মনের আর কোনো চিকিৎসা নেই।

"একসিপ হলেও খেতে হবে তোমাকে। নইলে জোর করে খাইয়ে দোব। তারপর না-হয় বমি করে ফেলে দিও। যখন-তখন চা খাওয়ার অভ্যাস না থাকলে তুমি কি ভেবেছো দুবেলা ভাত খেয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে দেশের কাজ করা যায়?"

অমিতা হাসতে সুরু করলে।

"জুড়িয়ে গেল। নিয়ে এসো একটা কাপ।" অনুনয় ফুটে উঠ্‌লে রঞ্জনের গলায়।

"সসারেই ঢেলে দাও।" দু'পা এগিয়ে এলো অমিতা।

বাড়ি ফিরে সুদাস দেখতে পেল মোহিতবাবু এসে আধ ঘণ্টার উপরে বসে আছেন। মোহিতবাবুর মতোই কাউকে আশা করছিল সুদাস—বাড়ির ঠিকানা অনেকেরই জানা: ব্যাঙ্কে বসে সব-রকম আলাপ করা যায়না! শেয়ার মার্কেটে কাজ করতেন মোহিতবাবু, সুদাসের কাজও অনেক করে দিয়েছেন - সম্প্রতি মার্কেটের দুঃসময় চলেছে—কয়েক টন কাগজ কিনে বসেছেন। লাফিয়ে চলেছে কাগজের দাম নির্ঘাত মুনফা দেবে কাগজটা। ব্যাঙ্ক ফিনান্স করুক আদ্ধেক টাকা--ব্যাঙ্কের গুদামেই থাক্‌বে মাল—লাভের আধাআধি ভাগ হবে। ফ্যাইনাল কথা বাড়িতে হবে, সুদাস বলে দিয়েছিল। ফ্যাইনাল কথা হয়ে গেল, লাভের সিকিভাগ পেলেই ব্যাঙ্কের চলবে—বাকি সিকিভাগ সুদাসের।

মজুরীর হক পয়সাই যেন হিসেব করে চুকিয়ে নিল সুদাস— মুখের রেখায় একটু সঙ্কোচ নেই। মোহিতবাবুকে বিদায় করে স্নান করতে গেল সে। ঠাণ্ডা জলে সমস্ত দিনের গ্লানি ধুয়ে যাক্! এক মাসও হয়নি সিরাজগঞ্জে ব্রাঞ্চ খুল্‌তে গিয়ে সে বক্তৃতা দিয়েছিল 'ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক' আর 'ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল ব্যাঙ্কিং'-এর আদর্শ নিয়ে। খুবই ন্যাশনাল ব্যাঙ্কিং করা হচ্ছে! নিজেকে ঠাট্টা করবার জন্যেই শাওয়ারের জলের শব্দের সঙ্গে খানিকটা হাসির শব্দ মিশিয়ে দেয়

সুদাস। দেশের ধনোৎপাদনে আর ধনবণ্টনে সাহায্য করবে ব্যাঙ্ক—কথাগুলো বলতে ভালো, শুনতে ভালো—ব্যাঙ্ককে বড়ো করে তুলবার চমৎকার কৌশল! মানুষের আবেগপ্রবণতা আর আদর্শ-প্রবণতাকে শোষণ করাইত বড়ো হবার উপায়! ব্যাঙ্ক ফেঁপে উঠ্‌তে থাক্‌লে সুদাস আর চুপ্‌সে থাকতে পারেনা। এ যন্ত্রের সে-ও একটা অবয়ব। না চাইলেও সুযোগ এসে উপস্থিত হবে তার সামনে। সুদাস সে-সুযোগ ঠেলে দিচ্ছেনা।

স্নানের পর শরীরে স্নিগ্ধতা আসে—উত্তপ্ত মন উষ্ণতায় মৃদু হয়ে যায়। একটা চায়ের কাপ সামনে নিয়ে নিজের দিকে পুরোপুরি তাকাবার সময় এই। খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়বার আগে এই এক-আধ ঘণ্টা সময়। জুয়াখেলার রোমাঞ্চ নিয়ে সে মেতে আছে—টাকার উপর প্রচণ্ড এক কামুকতা নিয়ে এগিয়ে চলেছে। অনেক টাকা আসুক তার হাতে—অজস্র টাকা, যে টাকা দুহাতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দিলেও ফুরোবেনা। খেয়াল-মাফিক ছড়িয়ে দেবে সে টাকা, কোনো প্রয়োজনের তাগিদে নয়। হতে পারে এ ছেলেখেলা। মনের সঙ্গে বোঝাপড়া করে থাক্‌তে হলে এম্নি একটা ছেলেখেলারই দরকার। বলতে পারো তাকে নৈরাজ্য—নৈরাজ্যের এলাকারই বস্তু মানুষের মন, কোনো শাসন, কোনো উপদেশ, কোনো শৃঙ্খলা তা মানতে চায়না!

কেন শাসন আর শৃঙ্খলার কথা বল? তা মেনে চলে কি পাবার আশা আছে তোমার? যা পেতে চাও তুমি, যা হ'তে চাও, তা কি হ'তে পারো? কোনোদিন কেউ কোনো আদর্শে পৌঁছুতে পেরেছে? মার্ক্স‌্লেনিন কেউ কি পেয়েছেন যা চেয়েছিলেন—কতো শৃঙ্খলায়ইত আঁটঘাট বেঁধে জীবনটাকে তৈরী করেছিলেন তাঁরা। হিটলারের কল্পনা ধূলিসাৎ হতে চলেছে অথচ শৃঙ্খলার শৃঙ্খলের শব্দেইত মুখর হয়ে উঠ্‌ছিল জার্ম্মাণ রাষ্ট্র! উপায় নেই—পথ নেই, শৃঙ্খলা নিয়েও কোথাও তুমি পৌঁছুতে পারবেনা, বিশৃঙ্খলা

নিয়ে যেমন পারোনা। তবু বিশৃঙ্খলার শৃঙ্খলার বন্দী-দশা নেই—সেটুকুই ত লাভ!

কি হবে একটা মহৎ আদর্শের মরীচিকার পেছনে যাবার সাজসজ্জা করে? মহৎ বলে কোনো আদর্শ বাস্তব হয়ে বেঁচে আছে কি কোথাও? ভূত দেখার মতোই হয়ত তা মিথ্যা। যদি সে-মিথ্যা সত্য বলে কোনোদিন ধরা দেয়, সে-দিন আজ হতে কতো হাজার বছর পরে কে বলবে? আজ সে আদর্শের ছবি আঁকতে গিয়ে তার উপর কালি মাখিয়েই দিচ্ছি আমরা! আমরা সবাই। নেতা থেকে সুরু করে নগণ্য জনসাধারণ সবাই। করব এই জেদ থাক্‌লেই কিছু করা যায়না। কম্যুনিষ্ট হয়েও প্রবীর কম্যুনিজমের সম্ভ্রম রাখতে পারে না তাই। আন্ধেক পথে ভেঙেচুরে যায় সব। জীবনকে সুন্দর করে গড়ে তুলবার জেদ সুদাসেরও ছিল! সুন্দর করে গড়ে তুল্‌তে পারল কি সে? ও হয়না। সুন্দর বলে যদি কিছু থেকে থাকে সে যে কোন সুদূর ভবিষ্যতে লুকিয়ে আছে কেউ তা জানেনা। জেদ করলেই তার আবরণ উন্মোচন করা যায়না। সে অনিশ্চিতের আসন প্রতিষ্ঠা করে শূন্য আসনের চারদিকে ধূপধূনা জ্বালিয়ে রাখতে পারি, আত্মাহুতি দিতে পারি কিন্তু আমাদের সেই দেবালয়ে দেবতার আবির্ভাব হয়না—দেবালয় কবরখানাই হয়ে ওঠে।

কাপে ধীরে ধীরে চুমুক দিয়ে চল্‌ল সুদাস। সে পণ্ডশ্রম করার চাইতে, সেই অসার্থক আত্মহত্যার চাইতে মন্দ কি এ-জীবন? কিছু ত তুমি পেলে? পৃথিবীর আলোবাতাসের স্পর্শ খানিকটা ত পাওয়া গেল। যে-পৃথিবীকে এসে পেয়েছ, তাকে ত অস্বীকার করা হ'লনা। Our job is to change the world—মার্ক্সের এই প্রতিজ্ঞাটির উপর যখন প্রথম চোখ পড়েছিল সুদাসের, কি রোমাঞ্চই না এসেছিল তার শরীরে! অনেকদিন মনে-মনে প্রতিজ্ঞার মতো করে এ কথাটাই উচ্চারণ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক বাংলা-কবিতার একটি লাইনও মনে পড়েছে তার: 'হে

পৃথিবী, বকযন্ত্র পাশ ফিরে শোও।' কিন্তু পাশ ফিরে শোয়নি পৃথিবী—পৃথিবীকে বদলাতে পারেনি সুদাস!

নিজের জীবনকে অতি সামান্য তৃপ্তি দিতে পারলনা যে, অনিচ্ছুক পৃথিবীর হাত থেকে যে একটু সৌন্দর্য্য ছিনিয়ে আনতে পারেনি—তারই কিনা ছিল পৃথিবীকে বদলে দেবার কল্পনা! চার পাঁচ বছর আগেকার নিজের স্পর্দ্ধিত ছায়ার দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপে সুদাসের রক্তকণাগুলো যেন চেঁচিয়ে ওঠে। কি দরিদ্র স্পর্দ্ধা! হয়ত দারিদ্র্যেরই স্পর্দ্ধা ছিল ওটা। দারিদ্র্যের সঙ্কীর্ণতা নিয়েও যদি থাকতে চাইত সুদাস, খানিকটা তৃপ্তি হয়ত জীবনকে দিতে পারত সে-সময়। নিজের কাছে তাকে পেতেন মা অনেক নিবিড়ভাবে, মার হৃদয়ের অনেক কাছাকাছি পৌঁছুতে পারত তার হৃদয়—মার জীবন পরিপূর্ণ হয়ে উঠ্‌ত তাঁর ছোট ছোট আকাঙ্ক্ষাগুলোর পরিতৃপ্তিতে। সাধারণ জীবনের সাধারণ অপরি-তৃপ্তি নিয়েই মাকে বিদায় নিতে হয়েছে—সুদাস ছিল তখন বৃহতের সাধনায় ব্যস্ত। এখন বলা যায় নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল সে, নিজের জীবনকে সুন্দর করবারই সাধনা ছিল তার। সেখানে মার প্রবেশ অধিকার ছিল না, সুদাস চায়নি তার জীবনের সৌন্দর্য্যে মা উপস্থিত থাকুন। সুদাসের এই নিঃসঙ্গ পরিণতি কোনো আকস্মিক ঘটনায় তৈরী নয়, এ-ইতিহাস তৈরী করবার জন্যে অনেকদিন আগেই তৈরী হচ্ছিল তার মন। শ্যামলী থাক্‌লেও কি এ-পরিণতি থেকে নিস্তার পেত সুদাস? নিজের প্রতি যার ভালোবাসা এতো গভীর তার কাছ থেকে কেউ ভালোবাসা পায়না। বেঁচে গেছে হয়ত শ্যামলী—মানসিক নির্য্যাতনের হাত থেকে বেঁচে গেছে!

চায়ের শেষে একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলে সুদাস। এম্নি আবহাওয়ায় আগে সে বই পড়ত। এখন আর পড়েনা, পড়তে ইচ্ছা করেনা। সহজ সরল উপার্জ্জনের চিন্তাকে ঘোলাটে করে কি লাভ? মাথায় কতগুলো কথার কীট কিল্‌বিল্‌ করবে—

এই ত? বইগুলোত বলবে বৈজ্ঞানিক বৈরাগ্যের কথা, সমাজ-সচেতনতার কথা, বল্‌বে পৃথিবীর আসন্ন বিরোধে প্রগতিশীল শক্তির কথা—শুন্‌তে কি পাবে সুদাস এ-কথাগুলো—এ থেকে যোজন যোজন দূরে চলে এসেছে সে। সেখানে সে একা। ককেশাসের নিঃসঙ্গ উচ্চতায় বন্দী প্রমেথিউসের মতো একাও বল্‌তে পারো তাকে—ঝড়ের ঝাপটা লাগছে তার মুখে, চোখ পুড়ে যাচ্ছে সূর্য্যের বিরাট প্রখরতায়!

কিন্তু এ কি সত্যি, আর কিছু চায়নি সুদাস! বন্ধুরা কি ছিলনা তার—কোনো মুহূর্ত্তে কি সে ভালোবাসেনি তাদের? প্রতিমুহূর্ত্তে মাকে কি সে অবহেলাই করেছে? শ্যামলীকে পেয়ে কোনো সময় কি নিজেকে মনে হয়নি অনেক বড়ো? এসব উজ্জ্বল অনুভবের ছোঁওয়া লাগেনি কি তার হৃদয়ে? আজ তার জীবনে সে-অনুভবগুলো মরে গেছে বলে কি তারা জীবনের কিছু নয়? অপচয়ের স্তূপে কি আজ তাদের সম্ভ্রান্ত স্মৃতি নিশ্চিহ্ন হয়ে ডুবে যাবে? সিগারেটটা অ্যাশ্‌-পটে গুঁজে দিয়ে বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল সুদাস। নীল শেডের আলোতে চোখগুলো তার চক্‌চক্‌ করছে, সজলতায় কি হিংস্রতায় বোঝা যায় না।

দুই

ওয়েলেসলি ষ্ট্রীটে একটা জীর্ণ দোতালা বাড়ীতে প্রবীরকে আজকাল প্রায়ই দেখা যায়। পাঁচ সাত জন মুসলমান ছাত্র আর কেরাণীর মেস ওটা। হাইদরেরও আস্তানা। মফঃস্বলের একজন বড় কর্ম্মী হাইদর, মাইনে-করা নয়—আদর্শের জন্যেই কাজ করে যাচ্ছে। কলকাতার কর্ম্মীদের সঙ্গে মোলাকাৎ করে যাবার জন্যেই এখানে তার আসা। সীমান্তের খবরের লোভে প্রবীর হাইদরের

প্রতি উৎসাহী হয়ে উঠেছিল। আসাম আর চাটগাঁর জনশক্তি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে জনযুদ্ধে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে কি না, সে খবর হাইদরের কাছেই নির্ভুল পাওয়া যেতে পারে। প্রবীরের প্রশ্নগুলোর জবাব কথায় নয় একটা ক্লান্ত হাসিতেই দিয়ে দেবার চেষ্টা করে হাইদর—তার রৌদ্রদগ্ধ মুখের কঠিনতাও কেমন যেন নম্র, বিষণ্ণ হয়ে ওঠে তাতে।

"গাঁয়ের লোকের দুঃখের সীমা নেই, কমরেড—" শুধুই বলে হাইদর, যেন ওই একটি কথাই তার জানাবার আছে।

"ভারতের জাতীয় গণতান্ত্রিক মুক্তি না হলে এ দুঃখেরও শেষ নেই! তাই ত আমরা জাতীয় মুক্তির নেতা গান্ধীজির কারামুক্তি চাই—গণতান্ত্রিক চেতনা উদ্বুদ্ধ করবার জন্য চাই পাকিস্থান—কংগ্রেস-লীগের ঐক্য না হলে আমাদের মুক্তি নেই!" অসাধারণ গাম্ভীর্য্য নিয়ে বলে প্রবীর।

"কমরেড—"হাইদরের মুখে সেই ক্লান্ত হাসি ফুটে ওঠে: "আমি চাষীর ছেলে, আপনাদের মতো পড়াশুনো আমার নেই। জানবার শুনবার অনেক আছে আপনার কাছে। কিন্তু নিজের চোখে আমি যা দেখে এসেছি তাকে একদম বরবাদ করে দেওয়া যায় না—আমার চোখে সেইটেই আজ বড়ো মনে হচ্ছে!"

"নিশ্চয়ই বড়ো। কিন্তু আমাদের এই বড়ো সমস্যাটা এতদিন পৃথিবীর চোখের আড়ালে রয়ে গেছে! আজ সময় এসেছে যখন পৃথিবীর বড়ো সমস্যার সঙ্গে এক হয়ে উঠবে আমাদের সমস্যা!" বর্ত্তমানের সুসময়ে বসে অতীতের দুঃখসময়কে যেন প্রবীর বিদ্রূপ করে ওঠে।

"গাঁয়ে ধান নেই—শুনলে বিশ্বাস করবেন এ-কথা? না খেতে পেয়ে লোক মরতে সুরু করেছে—দুর্ভিক্ষ আসছে। ভাবছিলুম রিলিফ-সেণ্টার খুলবার কথা, তাই এখানে এসেছিলুম।" দুর্ব্বোধ্য হাসি হাসতে সুরু করে হাইদর।

"নিশ্চয় আড়ৎদারের ঘরে গিয়ে জমছে ধান? যুদ্ধ ত ওদের ব্যবসার একটা মস্ত সুযোগ! আজকের যুদ্ধ যে গণতান্ত্রিক অধিকার লাভের জন্যেই—সম্মিলিত শক্তির শিবিরে আজ যে জনশক্তি অগ্রণী হয়ে লড়াই করছে—যুদ্ধের এই রূপান্তর কেউ হৃদয়ঙ্গম করে নি। তাই ত আমাদের আরো বেশি করে প্রচার করা দরকার যে ব্যবসার জন্যে এ-যুদ্ধ নয়। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকেও তাই আমরা জাতীয় যুদ্ধের নায়ক বলতে চাই!"

পাথরের চোখে তাকিয়ে থাকে হাইদর, কথা বলে না খানিকক্ষণ। প্রবীরের কথাগুলো তার কানে গিয়ে পৌছল কিনা বলা যায় না। আপন-মনেই যেন বল্‌তে সুরু করে সেঃ "দেশ বাঁচবে না, কম্‌রেড!"

"কেন?"

"খেতে না পেলে মানুষ বাঁচে না!"

"এসব ক্ষুদে পুঁজিবাদী আড়ৎদারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হ'বে!"

"ত্রিশ সন থেকে ত আন্দোলন করছি কমরেড—অনেক কথা বলেছি—গাঁয়ের লোক কথা শুনতে আর চায়না—চায় ভাত, কাপড়, ওষুধ!" ছোট ছোট চুলের উপর হাত বুলোতে থাকে হাইদর —মাথার দু'ইঞ্চি জায়গায় চুলের পাৎলা আড়ালও নেই—উঁচুনীচু চামড়ায় একটা পুরোণো ক্ষতের দাগ। আইন-অমান্যের দান।

"গাঁয়ের লোকদের মধ্যে একতা নেই, তাই হচ্ছে মুস্কিল!"

এ-মুস্কিল আসান করবার গুরুতর পরিকল্পনায় প্রবীরের মন যেন আচ্ছন্ন হয়ে উঠল।

"অর্থনৈতিক অবস্থা এমন শোচনীয় হয়ে উঠলে মৃত্যুযাত্রায়ই শুধু একতা দেখতে পাবেন কমরেড—আর কোথাও নয়! পাকিস্থান একতার পথ কিনা আমি জানিনে। মেসের ছেলেরা জানতে

চেয়েছিল পাকিস্থান সম্বন্ধে আমার কি মত—তাদের কিছুই বলতে পারিনি আমি! কি বলব? আমার কি পড়াশুনা আছে আপনাদের মতো?" সশব্দে হেসে উঠল হাইদর—সরল, সতেজ হাসি।

"প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণের ইচ্ছাটাকে আমাদের মেনে নিতে হ'বে—যেহেতু আমরা খাঁটি গণতান্ত্রিক। আত্মনিয়ন্ত্রিত প্রত্যেকটি সম্প্রদায় পরস্পরের সুবিধের জন্যেই যে মিলনের বন্ধন তৈরী করবে তার ভেতর আর খাদ থাকতে পারে না।" মুস্কিল আসান করবার থিসিস্‌টা জানা-ই ছিল প্রবীরের, মুস্কিল হয়েছিল শুধু হাইদর এতক্ষণ তা জানতে চায়নি বলে'।

এখনও যে সে তা জানতে চায় মনে হলনা। "দোহাই কমরেড—ও আমার বুদ্ধিতে ধরবে না—গেঁয়ো চাষীর মাথায় ও কি ধরতে পারে?" হাইদরের স্বাভাবিক হাসিটা এবার আর তাঁর মুখে নেই: "ওসব কথা ছেড়ে দিয়ে দু'কাপ চা-ই খাওয়া যাক্ কি বলেন? সিগারেট দিতে পারব না—বিড়ি চল্‌বে?"

"দিন" –পরম উদারতায় হাত বাড়িয়ে দিল প্রবীর: "অনেক-দিন খাইনি--দিন একটা।"

হাইদর পেরেকে-ঝুলান খদ্দরের পাঞ্জাবীর পকেট হাতড়াতে লাগল, সেই সঙ্গে বাবুর্চ্চিকে ডাকতে সুরু করলে: "জলিল মিঞা—ও জলিল মিঞা—"

প্রবীরও তার পকেটে হাত ঢুকিয়ে দিল—বিড়ি যদি না-ই থাকে হাইদরের কাছে, জলিলকে দিয়ে এক প্যাকেট সিগারেট আনানো যাবে।

কিন্তু হাইদরের পকেট থেকে বিড়ি বেরুল—জলিলকে দরকার ছিল তার চায়ের জন্যে।

"মোড়ের দোকান থেকে দু'কাপ চা নিয়ে আসুন না-- মেহেরবানী করে—" জলিলের হাতে একটা দু'আনি রেখে অনুরোধ

জানালে হাইদর। তারপর দেশলাইএর উপর দুটি বিড়ি ধরে প্রবীরের সামনে মাদুরে রেখে দিলে।

"কালপশু'ই চলে যাচ্ছি, কমরেড, দেশের দিকে—" আবার এসে প্রবীরের মুখোমুখি বসল হাইদর।

"সে কি?" একটা বিড়ি তুলে নিয়ে দুই আঙুলে অনভ্যস্ত ভাবে আয়ত্ত করবার চেষ্টা করতে চাইল প্রবীর।

"হ্যাঁ। দেখে ত গেলুম কল্‌কাতা—সবাই পেটপুরে খেতে পাচ্ছে। পেটপুরে খেতে পাওয়া খুব বড়ো ব্যাপার না। তবু অনেকদিন পর দেখলুম বলে ভালোই লাগছে!" কথাগুলোর মানে দুর্ব্বোধ্য নয় কিন্তু হাইদরের হাসির ভঙ্গিতে তা দুর্ব্বোধ্যই শোনাতে লাগল।

"একটা রিলিফ সেণ্টার খুলে আপনি জানিয়ে দেবেন আমাদের —শ্লোগান তুলে কিছু কালেকশন হবে আশা করি।"

"দুশো-পাঁচশো টাকার রিলিফে কি দুর্ভিক্ষ ঠেকানো যায়, কম্‌রেড?"

"আপনার কি প্ল্যান?"

"প্ল্যান কিছু করি নি।"

"মজুতদারদের বিরুদ্ধে প্রচার করা উচিত, নইলে জনগণের খাওয়ার দাবী কি করে আর প্রতিষ্ঠিত করা যাবে?"

হাইদর আবারও গম্ভীর হয়ে গেল। তার মুখের তামাটে রং-টা কালো হয়ে উঠল। দাঁতে চেপে একটা বিড়ি ধরিয়ে নিলে সে।

"আপনাদের পূর্বাঞ্চলের চাষীদের যদি এ-অবস্থা হয়ে থাকে—" আঙুলের মধ্যে বিড়িটা দুবার নিভে গেল বলে ওটাকে ছুঁড়ে দিয়ে বললে প্রবীর: "সে-খবর রাষ্ট্র হয়ে জাপানীদের কানে গেলে ত সর্ব্বনাশ!"

"তার আগে আমাদের নিজেদেরই সর্ব্বনাশ হ'তে চলেছে!

শুধু পূর্ব্ববাংলা নয়—কল্‌কাতার আশে-পাশে গাঁগুলোতেও একই অবস্থা।”

“তাই নাকি?”

“আমি ডায়মণ্ডহারবার পর্য্যন্ত গিয়ে দেখে এসেছি। ক্ষেতমজুর এদিকে বেশি—তাই আরো ভীষণ অবস্থা হয়ে উঠছে এদিককার।”

জলিল চা নিয়ে এলো—ছোট ছোট দু’টি ফুলদার কাপে। উল্টে রাখা চা ঠিকভাবে কাপে বসিয়ে দিয়ে চলে গেল জলিল। মালাই চা—সাদা সাদা সরের টুক্‌রো ভেসে আছে চায়ের উপর।

“নিন কমরেড—”একটা কাপ প্রবীরের সামনে এগিয়ে দিয়ে হাইদর চায়ে চুমুক দিলে।

প্রবীর সচেষ্ট হয়ে কাপটা তুলে নিল আঙুলে, অন্যমনস্ক হয়ে চুমুক দিতে গিয়েও দেখা গেল চা-টা সরবতের মতোই মিষ্টি। ঠোঁটের সতর্ক পাহারায় সরগুলো আটকে রেখেও চায়ের পরিচিত স্বাদ যখন আবিষ্কার করা গেলনা তখন আর ধীরে ধীরে ওতে চুমুক দেবার সাহস করা যায় না। নিজেকে বিপন্ন মনে করেই প্রবীর একচুমুকে যতটুকু সাধ্য ততটুকু টেনে নিলে মুখের ভেতর—তারপর এক সিকি তলানি রেখে প্লেটের উপর ছেড়ে দিল কাপটা। সার্টের হাতায় ঠোঁট ঘসে নিয়ে প্রবীর বল্‌লেঃ “বাংলাদেশে দুর্ভিক্ষ হ’বে শুনতে অবাক লাগে!”

প্রবীরকে লক্ষ্য করবার দরকার ছিলনা হাইদরের। “বাংলা-দেশের গাঁয়ে কখন্ দুর্ভিক্ষ ছিল না?” অন্যমনস্ক হয়ে বল্‌লে সে।

“তা অবশ্যি বলা যায়।”

“বলা যায় কম্‌রেড—”কাপের চা-টুকু শেষ করে নিয়ে হাইদর বললেঃ “কিন্তু কোনোদিন কাউকে বলতে শুনি নি। যে-দেশ খেতে পায়না—সেদেশের মাটিতে বাস করে অনেক সৌখীন কথাই আমরা বলেছি শুধু বলতে চাইনি আসল কথাটাই।” কঠিন হয়ে উঠল হাইদরের মুখঃ “কবে আমরা সব এক হয়ে যাব, এখানকার

মতো ইমারত তৈরী হবে সবার জন্যে তা আমি জানিনে কম্‌রেড—শুধু জানি আজও আমাদের মধ্যে আশমান জমিন ফারাক!"

"সে ত চোখ মেল্‌লেই দেখতে পাওয়া যাচ্ছে—"প্রবীর অসহায়ের মতো বলে।

"দেখতে পেয়ে কিছু কি আমরা করতে পেরেছি- দিতে পেরেছি কারো মুখে ভাত?"

"কি করা যায় বলুন?"

"আমি কতটুকু জানি যে আপনাদের বলব। ওরা আমার বাপচাচা, ভাই বোন—ওদের সঙ্গে শুধু মরতে পারি আমি। আর কিছু করতে পারিনে এক গোরের নীচে যাওয়া ছাড়া। তবু তাই ভালো—মাটির উপর নিমকহারাম হয়ে থাকার চেয়ে তাই ভালো। নিমকহারামের দল থেকে একটা মাথা ত কমে যাবে!" খানিক-ক্ষণের জন্যে জ্বলে উঠল হাইদরের চোখ! তারপর আবার তা নিস্প্রভ হয়ে এলো—গলায় ক্লান্তি নিয়ে আবার বললে হাইদর: "ওদের বাঁচাবার কোনো সাড়া এখানে নেই, কম্‌রেড- খুবই আফশোষ!"

প্রবীর উত্তর দিতে পারলনা। হাইদরের এই শান্ত বিনীত চোখ কি করে আগুন ছিটিয়ে দিতে পাবে তা-ই ভাবতে সুরু করেছে তার মন! এ কি শুধু আবেগের একটা দুর্বিনীত উচ্ছ্বাস—না সত্যকারের আগুনের শিখা! তর্ক করে কি উদ্ধার করে আনা যাবে সত্যি এ কি? তর্কে ধরা দেবে হাইদরের রূপ? কতটুকু সে চেনে হাইদরকে—কতটুকু বা চিনতে পাবে? 'আমাদের মধ্যে আশমান জমিন ফারাক!' হাইদরের কথাটাই মনে মনে উচ্চারণ করতে লাগল প্রবীর! হাইদরকে হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করবার জন্যে কি পরিচিত হয়েছে সে তার সঙ্গে? হয়ত নয়। একটা অদ্ভুত কিছু দেখবার বা জানবার মোহ ছিল প্রবীরের—একটু নূতন অভিজ্ঞতার মোহ। তাছাড়া আর কোন মহৎ আকাঙ্ক্ষা সে তার মনে খুঁজে

পাবে না। নিজের আকাঙ্ক্ষার সঙ্কীর্ণ, লজ্জাকর চেহারায় প্রবীর অন্যমনস্ক হয়ে থাকতে চায়। ঘরের বিশীর্ণ দেওয়ালগুলোতে চোখ বুলোতে থাকে অনর্থক।

"আপনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে অনেক উপকার হল আমার, কম্‌রেড—" হাইদরকে লজ্জিত দেখাল: "অনেক দামী কথা জেনে নিলুম—হয়ত পরে কাজে লাগবে।"

একথারও জবাব দিলনা প্রবীর—ভাবতে লাগল বিদ্রূপ করতেও হয়ত হাইদর লজ্জা বোধ করে।

হাইদরের মেস থেকে বেরিয়ে প্রবীর একটা সিগারেটের জন্যে লোলুপ হয়ে উঠল। চায়ের সেই মিষ্টি বিস্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। লালায় মসৃণ হয়ে উঠেছে মুখের ভেতরটা। সিগারেটের ধোঁয়া লাগিয়ে খরখরে করে তুলতে হবে জিভ। সিগারেটের গুণপনায় খানিকক্ষণ নিজেকে ব্যস্ত রাখতে চাইল প্রবীর। ওয়েলিংটন স্কোয়ার পর্য্যন্ত। হাইদরকে ভুলে যাবার চেষ্টায়ই হয়ত। এবং এক প্যাকেট সিগারেট হাতে তুলে নিয়ে সে ভুলে গেল হাইদরকে। সিগারেটের ঝাঁজাল স্পর্শে ঠোঁটের বিষণ্নতাটুকুও কেটে গেল প্রবীরের। ভুলে যাবার অপূর্ব্ব কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে সে। মনটাকে প্যাভলভের কণ্ডিশন রিফ্লেক্সের অনুচর করে ফেলেছে। স্নায়ু দিয়ে গ্রহণ করেছে সে মার্ক্সবাদ। নইলে সুদাসকে সে মন থেকে মুছে ফেললে কি করে? যেন সুদাস বলে তার পরিচিতদের মধ্যে কেউ কোনদিন ছিলনা। সুদাসের অধঃপতনেও যেন কোনো কথা তার বলবার নেই, কোনো তিক্ততা বা অনুযোগ নেই, প্রবীরের মনে। মাঝে-মাঝে সুদাসের প্রচণ্ড লোভের ইঙ্গিত দিয়েছে সন্তোষ তার কথাবার্ত্তায় কিন্তু প্রবীর নির্ব্বিকার। সুদাসের

জীবনের উপর তার হাত নেই, কাজেই তাকে সমালোচনা করবারও দরকার নেই।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে ভাবছিল প্রবীর, কোথায় যাওয়া যায়! মহীতোষ, প্রণব, রঞ্জন—পরপর তিনটে নাম মনে পড়ল তার। মহীতোষের ওখানে গিয়ে ওদের বিশ্রম্ভলাপের ব্যাঘাত করা হয়ত উচিত হবেনা। তাছাড়া রত্নাবলীরও নিজের সত্তা আর বেঁচে নেই। মহিমবাবু আর মহীতোষের জীবনেরই একটা অংশ হয়ে উঠেছে সে। তবে এটুকু যা রক্ষা—কোনো নাচের আসরে বা গানের মজলিসে ঠোঁটরাঙা করে মহীতোষকে পেছনে টেনে নিয়ে উপস্থিত হয়না, বাড়িতে বসে কোম্পানীর কাজকর্ম্ম দেখে। কাজের মেয়ে ছিল রত্না, নষ্ট হতে বসেছে। সুখের স্বপ্নে আছে ওরা! ভাবছে আজকের মতো সর্ব্বশ্রেণীর ঐক্যের দিন চিরকালই চলবে। গণতান্ত্রিক শক্তির যে বিস্ময়কর পরিচয় রাশ্যার লালফৌজ দিনের পর দিন দিয়ে চলেছে তারপরও কি ধনতন্ত্রের অন্তঃসারশূন্যতা তাকে ধ্বংসের পথে নিয়ে যাবেনা? হিটলারের পরাজয় কি ধনতান্ত্রিক লোভেরই মৃত্যুর সুচনা নয়? সুদাসের কাছে গিয়ে প্রশ্নটা করা যেত, আগেকার সুদাস যদি বেঁচে থাকত আজ! বিপ্লব সম্বন্ধে রোমান্টিক ধারণা যাদের, প্রতিবিপ্লবের টান তাদের জীবনেই সব-চাইতে বেশি।

যাক্—বাসের অপেক্ষায়ই দাঁড়িয়ে আছে প্রবীর—স্ট্যাডি সার্কেলে বক্তৃতা দেবার মহড়া দিচ্ছেনা। দোতলা বাসের হাওয়ায় দু'টি সিগারেটের উপর নির্ব্বিবাদে কালিঘাট পৌঁছানো যাক।

বাসে প্রায়ই দেখা হয় প্রণবের সঙ্গে—আজও দেখা হ'তে পারত। না হওয়া মন্দ নয়। ওর লেখার স্তুতিপাঠ করতে হত বাধ্য হয়ে। নিজের লেখার স্তুতি ছাড়া আর কিছুই শুনতে রাজি নয় সাহিত্যিকরা। নিজের মত ছাড়া মানতেও রাজি নয় অন্য মত। প্রণব ফিরে যাচ্ছে তার আগের মতে: where our heart is, there also is our

Art—এ ধরণের কথা বলে সে আজকাল। বলেঃ "আপনারা বলতে চান বলুন—ফ্যাসিজম্—আমরা অমানুষিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করেছি!" নিজেকে নিয়ে এতোই ওরা ব্যস্ত যে সায়েন্টিফিক্ আউট্‌লুক্ কোনোদিন আসবে না ওদের।

রঞ্জনকে তার বোর্ডিং-এ পাওয়া যায়না। কাগজের অফিসে গিয়ে পাকড়াও করা যায় তাকে। কিন্তু সে-ও অদ্ভুত কথা সব বল্‌তে সুরু করেছেঃ 'বাংলার বাইরের কম্যুনিষ্টদের দেখে এলাম—নাম মাত্র ক'টি টাকা মাইনের জন্যে যে অনেকে পার্টির কাজ করছে তা নয়, আদর্শটাই তাদের কাছে বড়ো কথা! কিন্তু কি তাদের আদর্শ বলতে পারিস প্রবীর? মিত্রশক্তির সৈন্যদের ভেতর থেকে কম্যুনিষ্ট খুঁজে বার করে, তাদের মুখে যুদ্ধের শেষে রাম-রাজত্বের কাহিনী শোনা ছাড়া নিজেদের কোনো রাজত্বের বনিয়াদ তৈরী করে তুলছে কি তারা?' 'এ তোর একপেশে কথা রঞ্জন—লেবারফ্রণ্টে ওরা কাজ করছেনা?'—প্রবীর রঞ্জনকে প্রতিবাদ করেছে দৃঢ় বিশ্বাসের উপর নির্ভর করে। 'ভারতবর্ষের সত্যিকারের সামাজিক রূপটাকে তোরা চিন্‌তে পেরেছিস কি না আমার সন্দেহ হয়। তা যদি না চিনে থাকিস তাহলে বল্‌শেভিক Radek-এর মতো তোদেরও একদিন খেদোক্তি করতে হবেঃ 'My God, if we had had any other race but Russians behind us in this struggle, we should have upset the world!' —কথার শেষে রঞ্জন সশব্দে হেসে উঠেছিল। 'কিন্তু এ-যুদ্ধে রুশ-জাতি পৃথিবীকে পাল্টে দিয়েছে—কম্যুনিজম্ তৈরী-মাল নিয়ে কারবার না-ও করতে পারে, তৈরীর পথও হতে পারে কম্যু-নিজম্!'—রাশ্যায় তৈরী হচ্ছে কম্যুনিজমের পথ—এ কথাটাই এদের বোঝাতে পারে না প্রবীর। পুরোণো বল্‌শেভিক কারো কারো হয়ত ধারণা ছিল—তাঁদের বিপ্লব একটা মিরাক্‌ল ঘটিয়ে দেবে—মার্ক্সের কথা আক্ষরিকভাবে ফলে উঠবে রাতারাতি। কিন্তু

রাশিয়ার মতো দেশে তা হতে পারে না। প্রবীর বুঝতে পারে ভারতবর্ষেও তা হবে না। তবে মার্ক্সবাদ বিজ্ঞান—ইতিহাসের গতিপথের নির্ভুল ইঙ্গিত—আজ না হয় কাল ধরতেই হবে এ-পথ। সবাইকে ধরতে হবে। সহজে নিজের বৈশিষ্ট্য হয়ত হারাতে চাইবেনা ভারতবর্ষ—কিন্তু একাদন আব সে-বৈশিষ্ট্য পুরোপুরি ধরে রাখা যাবেনা। ইতিহাসের দেবতা সমাজ-মন এক অপূর্ব্ব নূতন সৃষ্টির প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠছে দিনের পর দিন।

হাতের সিগারেটটা পুড়ে পুড়ে নিকোটিন-রাঙা আঙুলের কাছাকাছি এসে গেছে—নেহাৎই তাপ-সহ আঙুল বলে খেয়াল ছিলনা প্রবীরের। কিন্তু আগুনকে উপেক্ষা করবার ক্ষমতা নেই তার, একসময় খেয়াল করতেই হল!

নূতন একটা সিগারেট ধরিয়ে নেবার মুখে হঠাৎ হাইদরের কথাই প্রবীরের মনে পড়ে গেল। কোনো কারণ ছিলনা তবু। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়্যালের কালো রং-টা ভয়ঙ্কব দেখায়—রং সাদা থাক্‌তে বিকেলের আকাশে কেমন দেখাত ওটা মনে করতে চেষ্টা করে প্রবীর। মনে পড়ে না। হাইদরকেই মনে পড়ে আবার। মফঃস্বলের লোক একটু বেশি সেন্টিমেন্টাল হয়। ওই একটি কথায় প্রবীর হাইদবকে খারিজ করে দিতে চায়। তারপর ভাবতে থাকে ব্ল্যাক্‌ আউট শেষ হলে কেমন দেখাবে কল্‌কাতা? হঠাৎ আলোর ঝলকানি! 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত'। রবীন্দ্রনাথ আমাদের অনুভবের সঙ্গে মিশে আছেন! 'কৃষাণের জীবনের শরীক যে জন—' লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথ—অনেকদিন আবৃত্তি করেছে বলেই কি এখন কথাটা মনে পড়ল প্রবীরের? কিন্তু হাইদরের চেহারাটাও মনে পড়ল কেন তার সঙ্গে সঙ্গে? 'মাটির উপর নিমকহারাম হয়ে থাকার চেয়ে তাই ভালো—নিমকহারামের দল থেকে একটা মাথা ত কমে যাবে।...' কথাগুলো মনে করতে চায়নি প্রবীর, ভাবতেও পারেনি কথাগুলো যে মনে

আছে তার হুবহু। সেন্টিমেন্টাল কথা মনে থেকে গেল কেন তার? এই সেন্টিমেন্টাল কথাগুলো বল্‌তেই আগুনের মতো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল হাইদরের চোখ।

কল্পনা-মাফিক মুখটাকে তৈরী করা গেলনা সিগারেটে। টুবাকোর কোয়ালিটিই ফল করেছে! কি আর করা যায়? গুণগুণ করে একটা জনযুদ্ধের গান গাইতে সুরু করল প্রবীর।

বাড়ী ঢুকবার মুখে প্রবীর ভাবছিল নিজেকে নিয়ে দুঃখ করবার তার কারণ নেই। যথেষ্ট নির্বিবকার হতে পেরেছে সে। নিজের জীবনকে সাজিয়ে তোলার লোভ থেকে মুক্ত হয়ে আসা কি কম কথা? অথচ বিবেকানন্দীয় ত্যাগ এ-নয়—সবার ভোগের সঙ্গে জড়িয়েই তার ভোগের ইচ্ছা। ভোগ থেকে অধিকাংশ বঞ্চিত বলেই এ-ত্যাগ। আর কিছু না হোক এই নূতন মহৎ আদর্শকে ত জড়িয়ে আছে প্রবীর। তাতে যথেষ্ট তৃপ্তি আছে, যথেষ্ট আনন্দ! সবাইকে হাইদর হতে হবে এমন কোনো কথা নেই! হাইদরেরই দরকার আছে সমাজে আর সে অবান্তর এ কথার কোনো মানে নেই। কিন্তু কে তাকে প্রশ্ন করছে—কার প্রশ্নের জবাব দিচ্ছে প্রবীর মনে-মনে? কেউ নয়, অনর্থক এই জবাবদিহি!

বাইরের ঘরে বসে অনু একটি অপরিচিতার সঙ্গে আলাপ করছে—প্রবীর গম্ভীর মুখে পাশ কাটিয়ে উপরে চলে যাচ্ছিল। অনুর কথায় দাঁড়াতে হ'ল তাকে: "বড়দা, একে চেনোনা—শমীনদার মাসী—অমিতা!"

"ও" প্রবীর দু'পা এগিয়ে এসে একটা চেয়ারের পিঠে হাত দিয়ে দাঁড়াল: "শমীনের খবর কি?"

"মেদিনীপুর জেলে আছে!" অমিতা সহজ, স্বাভাবিকভাবে বল্‌লে যেন কোনো পরিচিতের কুশল প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে।

"মেদিনীপুর গিয়ে ওধরা পড়ল কেন?" বিশেষ কাউকে নয়, ঘরের আবহাওয়াটাকেই যেন জিজ্ঞেস করল প্রবীর।

"পঞ্চমবাহিনীর কাজ করে' নিশ্চয়ই নয়!" ঝর্ণার মতো হেসে উঠ্‌ল অনু।

অপ্রতিভ হয়ে প্রবীর চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল—অনুর প্রচ্ছন্ন অভিযোগের উত্তর দেওয়া উচিত—অনুকে শোনাবার জন্যে নয়, অমিতা আছে বলেই।

"শুন্‌লাম কংগ্রেসকে না কি আপনারা পঞ্চমবাহিনী বল্‌ছেন!" সোজাসুজি ধারালো প্রশ্নে অমিতা প্রবীরকে কৈফিয়তের জন্যে পুরোপুরি তৈরী করে তুলল।

"গান্ধীজির অনশনের সময়কার তাঁর চিঠিপত্রে যে কথা প্রকাশিত হয়েছে তার বাইরে কোনো কথা ত আমরা বলিনি—" দেবদেবীর বরাভয়ের ভঙ্গীর মতো মহিমময় হয়ে উঠ্‌তে চাইল প্রবীর: "আগষ্ট আন্দোলনে অনেক সাচ্চা কংগ্রেসকর্ম্মীও আত্মসংযম হারিয়ে ফেলেছিলেন। 'সাবতাজ' আন্দোলন গান্ধীজি চান না—এদেরও তা চাওয়া উচিত নয়, বরাবর আমরা এ-কথাই বলেছি।"

"কিন্তু কোনোরকম সহিষ্ণুতা নিয়ে দেশকে তোমরা সে কথা বুঝিয়েছিলে কি বড়দা?" অনু হাস্‌তে লাগল: "এখনো যে-সব পুস্তিকা বেরোচ্ছে তোমাদের, তাতেও 'সাবতাজে'র সঙ্গে কংগ্রেসের নাম জড়িয়ে দিচ্ছ।"

"যে-সব কংগ্রেসকর্ম্মী বাইরে আছেন তাঁদের কি উচিত নয় 'সাবতাজে'র বিরুদ্ধে বিবৃতি দেওয়া?"

"বিবৃতি দেবার অধিকার কর্ম্মীদের নেই, নেতাদেরই আছে!"

"এসব কাজ গান্ধীজি 'deplore' করেন!"

"তাঁর অহিংস-নীতির ব্যতিক্রমে তিনি দুঃখিত হয়েছেন এ ত সত্যি কথা—"

"কংগ্রেসের বা গান্ধীজির নাম ভাঙিয়ে সাবতাজের যেসব ইস্তাহার বেরুচ্ছে দেশকে তা আত্মঘাতের পথে নিয়ে যেতে পারে—" শিক্ষকতার গাম্ভীর্য্য নিযে প্রবীর তাকাল অমিতার দিকে: "এসব বিষাক্ত প্রচার থেকে দেশবাসীকে বাঁচানই সত্যিকারের দেশভক্তের কাজ। আমরা সে-কাজই করছি!"

"ভক্তি জিনিষটা কি এত আঁকা বাঁকা পথ নিয়ে চলে?" অমিতার ঠোঁটে হাসি ফুটে উঠ্‌ল।

"ভক্তির চেহারাটা কি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যায়না বল্‌তে চান?"

"তাহলেও পুরোণো চেহারাটা ভক্তিরই চেহারা, বিদ্রোহের চেহারা নয়!"

তর্কটা অনেকদূর যেতে পারে আশঙ্কায় অনু বলে উঠ্‌ল: "গান্ধীজির মুক্তি চাওয়াটা কিন্তু তোমাদের মানায় না, বড়দা — গান্ধীজির সঙ্গে তোমাদের কি সম্বন্ধ আছে বলো—তিনি কম্যুনিষ্ট নন—ঘোরতর জাতীয়তাবাদী; তিনি চান অখণ্ড ভারত, তোমরা বল অখণ্ড ভারতের আইডিয়া রিয়্যাক্‌শ্যনারি। কংগ্রেস-লীগ ঐক্য মানে ত কংগ্রেসকে হিন্দুর প্রতিষ্ঠান বলে স্বীকার করে নেওয়া— গান্ধীজি তা মান্‌তে পারেন কোনোদিন? কংগ্রেসে কি উদারপন্থী বিরাট মুসলমান সমাজ নেই যাঁদের নেতা আবদুল গফুর খাঁ, যাঁদের হৃদয়মনের উদ্গাতা মৌলানা আজাদ?"

"কংগ্রেস-লীগ ঐক্য মানে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নেওয়া। গান্ধীজি ত ভারতবাসীর আত্মনিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী, একটি সম্প্রদায়ের আত্মনিয়ন্ত্রণে তাঁর আপত্তি থাক্‌তে পারে না!"

"হিন্দুমুসলমানের ঐক্যে তিনি বিশ্বাসী, কংগ্রেসেরও বিশ্বাস তাই!"

"মুসলমান সম্প্রদায়ের দাবীই লীগের মুখে উচ্চারিত হচ্ছে!"

"ভারতবর্ষের উপর দাবী ভারতবাসীমাত্রেরই ত আছে বড়দা—

আলাদা জাতি বলে নিজেদের আলাদা করে নিয়ে ভারতবর্ষকে টুক্‌রো-টুক্‌রো করে ফেল্‌লে কি আমরা খুব উপকৃত হ'ব এখন? তোমাদের লেনিন কি রাশিয়ার আলাদা জাতিগুলোকে সমাজতন্ত্রের একান্নবর্ত্তী পরিবার থেকে পৃথক করে দিয়েছিলেন বিপ্লবের পরে?" অম্নুর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল। এ-উজ্জ্বলতা প্রশংসা করবার মতো। প্রশংসাই করত প্রবীর অম্নু না হয়ে অন্য কোনো মেয়ের চোখে যদি এমন অসাধারণ দীপ্তি দেখা যেত! অমিতাও যদি পারত এ-কথা বল্‌তে, এক দফা প্রশংসার পর নিজের বক্তব্য ধীরে ধীরে উপস্থিত করত প্রবীর। কিন্তু অম্নুর মুখের কথা বলেই কেমন একটু অস্বস্তি অনুভব করল সে—মনে হ'ল নেহাৎই এ মুখরতা, অসুস্থ তর্কবৃত্তি।

"তখন দেননি—এখন বেঁচে থাক্‌লে দিতেন—এবং এখন তা দেওয়া হয়েছে।" প্রবীরের গলার স্বর কঠিন হয়ে এলো।

অম্নু চুপ করে রইল। প্রবীরকে সে চেনে। আবহাওয়াটা বিশ্রী হয়ে উঠ্‌ত যদি অমিতা হঠাৎ অবান্তর একটা প্রশ্নে কৌতুকী করে না তুলত প্রবীরকে:

"গান্ধীজিকে তাহলে আপনাদেরও নেতা বলে মেনে নিচ্ছেন এবার?"

"যদি মান্‌তে দেন আপনারা।" চেয়ার ছেড়ে দাঁড়াল প্রবীর।

"আমরা মান্‌তে দিই মানে?" অমিতা কোলাহল করে উঠল।

"আমরাও যে ভারতবর্ষের লোক এ কথাটা ভুলে যান কি না!"

"ভুলিয়ে দিলে কি আর করব বলুন?"

কথা বলতে আর ইচ্ছা হলনা প্রবীরের—এলোমেলোভাবে একটু হেসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। হয়ত অম্নুই তাতিয়ে তুল্‌ছে এ-মেয়েটির মন—সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠ্‌তে উঠ্‌তে ভাবছিল প্রবীর। পলিটিক্স করবার মতো ঝাঁজাল চেহারা অমিতার নয়—ও-চোখে আব্দারেই মানায়, বিদ্রূপ নয়! এ-বিদ্রূপের মানে কি বিদ্রূপ ছাড়া আর কিছু হ'তে পারে না? অমিতার মুখের প্রত্যেকটি রেখা মনে

করতে চেষ্টা করল প্রবীর। শ্রদ্ধার একটু স্নিগ্ধতা কি ছিলনা তাতে? কিন্তু কি দরকার—কি দরকার খুঁটে খুঁটে শ্রদ্ধা আবিষ্কার করবার। মোহ তৈরী করে কি লাভ? রত্নার চোখে কি শ্রদ্ধার সেই স্নিগ্ধতা ছিলনা? কি হ'ল তাতে। উঠ্‌লনা ত রত্না প্রবীরের স্বপ্নের আর আদর্শের আশ্রয় হয়ে! একসঙ্গে কয়েক পা এগিয়ে আস্‌তে পারে হয়ত অমিতাও, কিন্তু সবটুকু পথ চলা তার হ'বেনা! সুপ্রভাকে মনে পড়ল হঠাৎ আজ।

সরাসরি নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকল প্রবীর—ঝাঁক বেঁধে সুপ্রভার স্মৃতি মনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ছে যেন। প্রবীরের সঙ্গে সঙ্গে পথ চলার শক্তি হয়ত ছিলনা সুপ্রভার—কিন্তু প্রবীরের আদর্শকে ত সে গ্রহণ করেছিল অন্তর দিয়ে। ওটুকুই যথেষ্ট। তাতেই তৃপ্ত ছিল প্রবীর, তার বেশি সে আশা করেনি, আশা করে না। তার সে সামান্য আশা সুপ্রভার মৃত্যুতে বিফল হয়ে গেছে। সুপ্রভার জায়গায় এসে দাঁড়াতে পারে তেমন মেয়েও খুঁজে পেলনা সে একটি। কেউ এলোনা। একটা অভিমানের ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠ্‌ল প্রবীরের চোখ—অভিমান হ'ল সুপ্রভার উপর। চিরদিনের জন্যে একা ফেলে গেলে আমায়!—তোমার মন নিয়ে কেউ এলো না আর!

জামা নিয়েই সটান বিছানায় শুয়ে পড়ল প্রবীর। দুহাতে চোখ ঢেকে অন্ধকার তৈরি করে নিলে—আলোতে সুপ্রভার মুখ ফিকে হয়ে যায় বলে। সুপ্রভার এ-ছবিটুকুই তার ভয়ঙ্কর নিঃসঙ্গতার পার্শ্বচর। আর কেউ নেই।

"খোকা এসেছিস্?" আঁচলে চোখ পরিষ্কার করতে করতে মা এসে ঘরে ঢুকলেন।

চোখের উপর থেকে হাত সরিয়ে নিয়ে তাকিয়ে রইল প্রবীর।

"সুবি-র ইণ্টারভিউ পাওয়া গেছে শনিবার—আমাকে বাপু নিয়ে যাস—"

"আমি ও পারব না—অন্নুকে বলো—" আবারও চোখ ঢেকে ফেল্‌ল প্রবীর।

"অন্নু পারবে আর তুই পারবিনে ?"

প্রবীর চুপ করে রইল তবে যদি মা চলে যান। কিন্তু চলে যাবার কোনো লক্ষণই দেখা গেলনা তাঁর। প্রবীরের উদাসীনতা গা-সওয়া হয়ে গেছে—তার উপেক্ষায় অপমানিত বোধ করেন না তিনি। জবরদস্তি করে মার দাবী খাটাতে তাঁর একটুও সঙ্কোচ নেই।

"সুবি-কে তোর দেখ্‌তেও ইচ্ছা করে না একটিবার ?" প্রবীরের হৃদয় খুঁজতে সুরু করলেন মা।

"কেন খামকা বিরক্ত করছ ?" প্রবীর চোখ ঢেকেই রইল।

"বিরক্তই বা হবি কেন ?"

চুপ করে থাকতে চেয়েও কথা বলে ফেলেছে বলে প্রবীর অনুতপ্ত হ'ল—কথায় যে মাকে নিরস্ত করা যাবে না তা জেনেও চুপ করে থাকলনা কেন সে ?

"ইণ্টারভিউতে তোর নাম দিয়ে দিলে অন্নু—"

"অন্নুকে এ সর্দ্দারি করতে কে বলেছে—আস্কারা দিয়ে তোমরা ওকে মাথায় তুলেছো—" শুধু চোখ থেকেই হাত নামিয়ে নিলেনা প্রবীর, বিছানার উপর সোজা উঠে বসে গেল।

"কি বল্‌ছিস্‌ তুই—অন্নু কি অপরাধ করলে—ছোটভাইকে দেখতে যাবি নে তুই, তা অপরাধ হলনা—তুই যাবি ভেবেছে বলে অন্নু করলে অপরাধ!" বিরক্তি বা অভিযোগ কিছুই ছিলনা মার গলায়—অনুযোগ তিনি করেন না, বিরক্ত হওয়াও ভুলে গেছেন। তাঁর কল্পনার আর ইচ্ছার অনেক বাইরে চলে গেছে ছেলেমেয়েরা, বিরক্তি বা অভিমান দিয়ে ততদূরে তাদের স্পর্শ করা ত যাবেই না—আরো দূরে সরিয়ে দেওয়া হবে মাত্র। স্নেহের স্পর্শও ততদূরে পৌঁছয় না—একটা অক্ষম শাসনের সম্বন্ধ বাঁচিয়ে রেখেই এখন তার তৃপ্তি।

"অনুকে তোমরা খুব বুদ্ধিমতী ঠাউরেছ।"

"তোরা সবাই বুদ্ধিমান—বোকা ত শুধু উনি আর আমি! বোকা বলেই চুপ করে থাক্‌তে পারিনে—একবার তোর কাছে একবার অনুর কাছে ছুটোছুটি করি!" মা ধীরে ধীরে চলে গেলেন। কথাগুলো বিষণ্ণ শোনালেও মুখ তার বিষণ্ণ হলনা।

মনের নিঃসঙ্গতায় গুঞ্জন উঠ্‌ছে—তারপর কলরব। প্রবীরের চারদিকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে ছায়ার দল—সেখানে আছে তার মা আর বাবার মুমূর্ষু মুখ, আছে অনু আর সুবীর—সুপ্রভা পেছনে সরে অন্ধকারে মিশে গেছে। পারছেনা ত প্রবীর সুপ্রভার স্মৃতির ছায়ায় নিজেকে নিঃসঙ্গ করে তুল্‌তে—শাসন মান্‌ছেনা মন, কণ্ডিশনিং ব্যর্থ হয়ে যাচ্ছে যেন। মধ্যবিত্ত মনের অত্যাচার—নিজেকেই সে সাবধান করে দিতে চায়। টেবিলের উপর বই পত্রিকা, পুস্তিকাগুলো নাড়াচাড়া করতে সুরু করে প্রবীর বসে বসে। এলোমেলো ছিল টেবিলের উপরটা—গুছিয়ে রেখেছে কে যেন—অনুই হয়ত। দরকার ছিলনা। খুসী হলে একদিন নিজেই গুছিয়ে রাখতে পারত সে। দ্বান্দ্বিক আর ঐতিহাসিক জড়বাদ নিয়ে লেখা ষ্ট্যালিনের একটি পুস্তিকার ভারতীয় সংস্করণ কবে যেন সংগ্রহ করে রেখেছিল প্রবীর—সুদাসের সঙ্গে যখন তর্ক হ'ত সে সময়ই হয়ত। অনেকবার পড়া পুস্তিকাটির উপর আবারও সে চোখ বুলোতে লাগ্‌ল, চোখ আটকে গেল একটি জায়গায় এসে: "......There are different kinds of social ideas and theories. There are old ideas and theories which had outlived their day and which serve the interests of the moribund forces of society. Their significance lies in the fact that they hamper the development, the progress of the society......." এই সাধারণ সহজ কথাগুলোর উপর চোখের টানা পোড়েনে ঠাসবুনোট দিয়ে মন তৈরী করে

তুল্‌তে চাইল প্রবীর। 'There are old ideas and theories which had outlived their days'—কথাটা মন্ত্রের মতো সে জপ্‌তে সুরু করলে—যেন পরম আকাঙ্ক্ষিত একটি দৈববাণী আজই হঠাৎ শুন্‌তে পেয়েছে! 'There are old ideas—' গা থেকে জামা খুলে পুস্তিকাটি আগাগোড়া পড়ে নেবার জন্যে তৈরী হল প্রবীর। পড়াশুনো ছেড়ে দিয়েছিল বলেই অনেক বাজে চিন্তা এসে ভীড় করছে আজকাল তার মাথায়।

তিন

রত্নার বিশ্রাম নেই। কাজের চেয়ে জঞ্জালের পাহাড়ই জড়ো করে তুল্‌ছেন মহিমবাবু রত্নার জন্যে! হিসেবপত্র ঝকঝকে করে রাখা চাই, অডিটরের প্রশ্নের কাছে যেন কাবু হয়ে না পড়তে হয়। মহিমবাবুর মতে রোজ নিয়মিতভাবে দুচার ঘণ্টা কাজ করে গেলেই ব্যাপারটা সোজা হয়ে যায়। রত্না মনে করে দরকারেই হোক বা অদরকারেই হোক নিয়মিতভাবে দুচার ঘণ্টার কাজ মহিমবাবু যোগাড় করে রাখেন। তারপর অবিশ্রান্ত চিঠি লেখা—টাইপ রাইটার কিনে টাইপ করা শিখ্‌তে হয়েছে রত্নাকে। বুড়ো মানুষের এই উৎসাহের মুখে বাধা সৃষ্টি করতে চায়না রত্না। মহিমবাবুর সমস্ত জীবনের সাধনা সফল হয়ে উঠেছে একটি কাপড়ের কলে! দেশকে আত্মনির্ভর করে তুলবার প্রেরণা কতো লোকের মনে কতো ভাবেই জাগিয়ে দিয়েছিল অসহযোগ আন্দোলন, সেই বিরাট প্রেরণার একটি স্ফুলিঙ্গই যেন রত্না দেখ্‌তে পায় মহিমবাবুর সাধনায়। তাই একেক সময় বিরক্ত হতে গিয়েও রত্নার মনে শ্রদ্ধা জেগে ওঠে। 'চাহিনা অর্থ চাহিনা মান'—ধরণেরই একটা প্রতিজ্ঞা ছিল মহিমবাবুর মনে—কিন্তু অর্থ তাঁকে চাইতে হয়েছে—শুধু চাওয়া নয়, নিজের প্রয়োজনে

একসময় তিনি এই জাতীয়-শিল্প তৈরী করবার টাকা অন্যায়ভাবে ব্যবহার করেছিলেন—সেই অপরাধ থেকে আজ মুক্তি লাভ করেও তিনি মনকে নিরপরাধ করে তুলতে পারেন নি—তাই আজ তাঁর একমাত্র চিন্তা, অপব্যয়ের দায়ে যেন কেউ তাঁকে দায়ী করতে না পারে! মহিমবাবুর সততাবোধ মনে পড়লে হিসেবের অঙ্কের উপর আর ক্লান্ত হয়ে আসেনা রত্নার চোখ।

অনেকসময় মনে হয় রত্নার, নিজের কাজগুলো সমর্থন করতে যতো ঘোরালো যুক্তিই টেনে আনুক সে, আসলে মেয়েদের মনের মানিয়ে চলার বৃত্তিকেই সে অনুসরণ করে চলেছে। এই বৃত্তি থেকেই মেয়েরা অবাঞ্ছিত স্বামীর ঘর করে যায় অনায়াসে কিম্বা আজীবন কুমারী থেকে পরিবার প্রতিপালন করতে রাজি হয়। রত্নার জীবনটা তারচেয়ে একটু নূতন ধরণের—কিন্তু পেছনে তার একই রকমের মন! এই টাবু থেকে মনকে মুক্ত করে এনে যদি রত্না জিজ্ঞেস করে এধরণের জীবন ভালো লাগছে কিনা, হয়ত সোজা উত্তর পাওয়া যাবে -না।

কি যে তার ভালো লাগবে আজও বুঝতে পারছে না রত্না। ভালো লাগেনি তার মাষ্টারি। তারপর বিবাহিত জীবন! সেখানেও অপরাধবোধের একটা ছায়া তাকে জড়িয়েছিল কয়েকদিন—মহিমবাবুর কাজের ধাঁধায় ঢুকে সে পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু এখানেও তাই—ভালো লাগেনা। ভালো লাগার অনুভূতিটাই কি ভুলে গেল সে? না কি সত্যি কোনো অভাব অনুভব করছে তার মন? অভাবের চেহারাটা খুঁজে পাওয়া যায়না। টাকা নিয়ে যা-খুসী করতে পারে রত্না। ডবল শিফ্‌টে কাজের ঝঞ্ঝাট মিটিয়ে মহীতোষ ক্লান্ত হয়ে বাড়ি এলেও রত্না সম্বন্ধে উদাসীন নয়, মন তার আগেকার মতোই সজীব, সতেজ। তাই একেকসময় মনে হয় রত্নার, ভালো না লাগাটা তার অন্যায়। খুঁটিনাটি প্রত্যেকটি কাজ তাই সে ভালো লাগাতে চায়। মহিমবাবুর উপর অভিমান

করে' তাঁর চোখ দুটো অসহায় করে তোলে—অভিমানের মুখোসটা ফেলে দিলেই মহিমবাবুর মুখের সরল, উজ্জ্বল হাসি বেশি ভালো লাগবে বলে'। মহীতোষের কথায় অকারণেও হেসে লুটিয়ে পড়ে রত্না; নূতন একটা রান্না খাওয়াতে পারলে ঠাকুরকে পাঁচটাকা বকশিশ কবুল করে। হয়তো ভালো লাগে সে-সময়টুকু কিন্তু ভালো না লাগার-ফাঁক তার চেয়ে ঢের বেশি।

"তোমার কারখানা দেখ্‌তে যাব—" রত্না একদিন হাঁপিয়ে উঠে বলে।

"সর্ব্বনাশ! কোনো রকমে দুটো শিফ্‌টের লোক যোগাড় হয়েছে—তুমি গিয়ে আন্‌রেষ্ট্‌ ছড়াতে চাও নাকি!" এম্নি ধরণে হাস্‌তে থাকে মহাতোষ যেন রত্নার সঙ্গে নূতন করে প্রেমে পড়েছে।

"না—সত্যি, দেখব কি ভাবে কাজ হয়।"

"তারপর সেখানে কাজ করতে সুরু করবে বুঝি?"

"মন্দ কি?"

"প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধটা ভালো বলে ত জানিনে!"

"দেখা যাক না কি রকম!"

"সে পরীক্ষায় আমি রাজি নই!"

কিন্তু ও-পরীক্ষাটাই রত্নার বাকি আছে। সাধারণ একটি মেয়ের মতো গ্রহণ করা যায় না কি জীবনটাকে—সেবা করার আনন্দ দিয়েই যা পরিপূর্ণ? কেমন সে জীবন? হয়ত ভালো লেগে যেতেও পারে তার। কিন্তু মহীতোষ তাকে কিছুতেই দেবেনা ততটুকু নেমে যেতে। ইস্পাতের মতো কঠিন আর প্রদীপ্ত হয়ে উঠুক রত্নার জীবন—বাইরের আলোতে হয়ে উঠুক উজ্জ্বল আর দীপ্তিময়—মহীতোষ তা-ই চায়। রত্নার সে-জীবনের জন্যে মহীতোষ নিজের অনেক ইচ্ছাকেই বিসর্জ্জন দিতে পারে। রত্নার ঔজ্জ্বল্যে ঝলসে যাক তার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-পরিজনের

চোখ। সে ইচ্ছার কাছে আর সমস্ত ইচ্ছাই তার ম্লান হয়ে গেছে। কিন্তু উজ্জ্বল হতে গিয়ে নিজের জীবনই কি ঝলসে যাচ্ছেনা রত্নার? এতো আলো, এতো মুক্তি জীবনে এলো তার, তবু ত ভালো লাগছেনা জীবনকে। এই উজ্জ্বলতা থেকে পালিয়ে গেলে কি ভালো লাগবে? 'যদি গাহন করিতে চাও, এসো নেমে এসো হেথা গহন-তলে।' এই উজ্জ্বলতার নীচে আছে কি সুনীল জলের শান্তি? না কি মৃত্যুর মতোই নীল জল সেখানে? মৃত্যুরই প্রশান্তি কি সে-জীবনের মুখে? বুঝতে পারে না রত্না। সেই অজানা জীবনে নেমে যেতে সাহস পায়না তাই।

"এবার পূজোর ছুটিতে লম্বা প্রোগ্রাম নিয়ে বেরিয়ে পড়ব—কি বল?" মহীতোষ রত্নার চোখের ক্লান্তি লক্ষ্য করে।

"কোথায়?"

"কাশ্মীর পর্য্যন্ত—পথে দু'চারদিন করে এখানে-সেখানে।"

রত্না খুব উৎসাহিত হলনা:—"একা কি করে থাকবেন বাবা?"

"একা কোথায়? কোম্পানীর হিসেবপত্রের মতো সঙ্গী তাঁর আর কেউ আছে না কি?"

"টাইপ ত আর তিনি করতে পারবেন না—তাহলে চিঠি লেখাই বন্ধ!" হাস্‌তে লাগল রত্না।

"টাইপিষ্ট রেখে নেবেন—পার্ট টাইম কাজ করে যাবে!"

"বেশ বল্‌ছ—আমার চাকরী বাতিল!"

"আমার চাকরিটার শিক্ষানবিশী করবে—একবছর পর রিটায়ার করে নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে যাব!"

"মানে তখন তোমার বসে বসে খাবার পালা?" নিজের জীবনের একটা অস্পষ্ট ছায়াই কথাগুলোতে রত্না তুলে ধরতে চেষ্টা করল।

মহীতোষ বুঝতে পেরেও সেদিকে যেতে চাইলনা: "কেন, আমি ড্রাইভিং জানি—তোমার মোটর চালাব।"

"প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ কি ভালো?" রত্না ফিরিয়ে দিল প্রশ্নটা মহীতোষকে।

সে-প্রশ্নের উত্তর দিলনা মহীতোষ—অবশ্যি উত্তর দেবার মতো কোনো কথাও ছিলনা। নিরুপায় হয়ে প্রচণ্ড ভাবে হেসে উঠল তাই সে। তারপর হাসির শেষে বল্‌লে: "কাশ্মীরের প্রস্তাবটা কিন্তু ঠিক।—পূজোর ছুটিতে এখানে থাকা চলবেনা—যা সুরু হয়েছে, কলকাতায় থাকা মুস্কিলই হয়ে উঠবে!"

"তার মানে?" শঙ্কিত হয়ে উঠল রত্নার চোখ।

"ভিখিরির ভীড় বেড়ে চলেছে দিনের পর দিন। ফুটপাতে চলা মুস্কিল ওদের জ্বালায়! হাঁড়িকুড়ি, মালসামগ, কাঁথামাদুর নিয়ে দিব্যি সংসার জাঁকিয়ে বসেছে একেকজন!" পাইপে টুবাকো টিপতে সুরু করলো মহীতোষ।

"তাতে কলকাতায় থাকা মুস্কিল হ'বে কেন—ভিখিরি আর বড়লোক নিয়েই ত চিরদিনের কল্‌কাতা!" বোঝা গেল মহীতোষের কথায় রত্না কোথায় যেন একটা অস্পষ্ট আঘাত পেয়েছে।

"মুস্কিল হ'বেনা? এপিডেমিক সুরু হয়ে যাবে ওদের নোংরামিতে!"

"ফুটপাতে যারা থাকে নোংরা না হয়ে উপায় কি তাদের? এপিডেমিক যদি সুরু হয় সুরু হবে শুধু আমরা ওদের ফুটপাতে থাক্‌তে দিচ্ছি বলে!" মহীতোষের কাছে নিজেকে কেমন যেন খাপছাড়া করে তুল্‌ল রত্না। এতক্ষণ যেন মহীতোষের মনেই হয়নি রত্না যে একটি সাধারণ লালপেড়ে শাড়ি পরে আছে, শাড়িটার দৈন্য স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠল মুখের করুণ বিষণ্ণতারই ছায়ায়।

"হাউএভার—" পাইপটা দাঁতে চেপে বললে মহীতোষ: "কলকাতায় থাকাটা নিরাপদ নয়!"

রত্না চুপ করে চেয়ে মহীতোষের পাইপ ধরানোটাই দেখতে লাগলো। ঝলক ঝলক আগুন জ্বলে উঠতে চায় কিন্তু আগুন জ্বললে

চলবেনা, চাই ধোঁয়া—আঁকাবাঁকা রেখায় যা একসময় হাওয়াতে মিশে যাবে। কোত্থেকে এলো এই ভিখিরিরা কেন এলো! ভিখিরির দেশে কোত্থেকে আসবে আর ভিখিরিরা! নিজের প্রশ্নে নিজেরই হাসি পায় রত্নার। কিন্তু কেন এলো এরা কল্‌কাতায়? কাদের কাছে এলো? যারা এদের নোংরামিতে ভয় পেয়ে পালিয়ে যেতে চায় তাদের কাছেই কি? উজ্জ্বল চোখে তাকিয়ে রইল রত্না—যেন সে ভয়াল দৃশ্যের একটা মিছিল দেখে চলেছে—যেন চিন্তা করে চলেছে তার চোখগুলোই।

"তাছাড়া"—পাইপটা হাতের উপর নিয়ে এলো মহীতোষ: "ক'দিন ঘুরে না এলে তোমার মন কিছুতেই ভালো হবেনা—"

বারান্দায় একসঙ্গে অনেকগুলো জুতোর আওয়াজে মহীতোষ রত্নার মনের অসুখের সম্পূর্ণ ব্যবস্থাপত্র তৈরী করতে পারলনা—পাইপটা আবার দাঁতে চেপে নিয়ে আগন্তুকদের প্রতীক্ষায় দরজার পর্দ্দার দিকে তাকিয়ে রইল।

কারা এলো? ভিখিরির মিছিল মুছে ফেলে রত্নার চোখও প্রগাঢ় অভ্যর্থনার জন্যে স্নিগ্ধ হয়ে উঠল যেন হঠাৎ।

পর্দ্দা সরে গিয়ে উঁকি দিল রঞ্জনের মুখ।

"আরে—রঞ্জন যে—" প্রায় লাফিয়েই মহীতোষ দরজার কাছে এগিয়ে এলো।

"আমি ছাড়াও এঁরা এসেছেন তোর সঙ্গে দেখা করতে—"

এঁরা কে? পর্দ্দার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে পথ জুড়ে রঞ্জন দাঁড়িয়ে আছে—কারা আছে পর্দ্দার ওধারে কে বলবে!

"ভেতরে আয়—" অগত্যা 'এঁদের' ঘরে আনবার জন্যে মহীতোষকে পশ্চাদপসরণ করতে হল।

এসেছে অমু আর অমিতা—পরিচয়ের পর কয়েক সেকেণ্ড ধরে নমস্কার বিনিময়ের উষ্ণতায় উৎসাহিত হয়ে উঠল ঘরের নিস্তেজ আবহাওয়াটা।

"তারপর ?" পরিতৃপ্ত হাসিতে মহীতোষ চারপাশে চোখ বুলিয়ে নিল, কোনো জমাট সভার সভাপতি যেন সভার কাজ সুরু করতে যাচ্ছেন।

"আপনার কাছেই এসেছিলুম কারণ মিসেস মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় ছিল না—" অসঙ্কোচে বলে যেতে লাগল অনু : "এখন যখন মিসেস মুখার্জির সঙ্গে পরিচয় হয়ে গেছে আপনার কাছে আর আমাদের দরকার নেই—" কথাটার ভঙ্গী অপমানকর হয়ে গেল বলে অনু ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠল।

মেয়েদের কোনো কথা কোনো সময় অপমানকর মনে হয়না মহীতোষের মনে—তার ধারণা, ও ধরণের কথায় মেয়েরা কথা বলবার সুযোগ করে দেয় মাত্র। বিচিত্র ভঙ্গীতে পাইপটা তার হাতের উপর নড়তে সুরু করল—অতি শালীন হাসিতে নিজেকে এদের কাছে উপভোগ্য করে তুলে বল্‌ল : "আমার ত দু'একটা কথার দরকার থাকতে পারে আপনার সঙ্গে—আপনি যেহেতু প্রবীরের বোন !"

"যেহেতু প্রবীরের বোন সেহেতুই আমি 'আপনি' হতে পারিনে—" অনু তার হাসির ছোঁয়াচ ধরিয়ে দিল সবার মুখে।

"ওতে আমারও সঙ্কোচ হচ্ছিল—" মহীতোষ অপ্রতিভ হলনা : "যাক্‌, প্রবীর কি করছে এখন, অনেক দিন ওর সঙ্গে দেখা নেই—"

"ভূমিকাটা সাহিত্যের মতো এতো দীর্ঘ করে তুলছ তোমরা যে আসল খবরটাই উঁকি দেবার সুযোগ পাচ্ছেনা—" উপরে পড়ে বলতে হল রঞ্জনকে। বলা যায়—অনুকে একটা বড় দায় থেকে মুক্ত করে আনবার চেষ্টা করল রঞ্জন। প্রবীরের খবর অনুর জানা নেই—মহীতোষের জিজ্ঞাসায় অনুজ্জ্বল হতে সুরু করেছিল অনুর মুখ।

"খবর গিলিয়ে তোরা বাংলাদেশের এমনি হাল করেছিস রঞ্জন, যে সাহিত্যের সেখানে বাঁচবার উপায় নেই।" হাসতে লাগ্‌ল মহীতোষ।

"ব্যবসায়ীর পক্ষে সাহিত্য-প্রীতিটা কিন্তু মারাত্মক !"

"মে বি—" মহীতোষ দাঁড়াল এবার: "কিন্তু অনুর যখন আমাদের দিয়ে দরকার নেই তখন এখানে বক্‌বক্‌ না করে বারান্দায়ই চল। অসুবিধে ত ওদের সামনে আমাদেরও কম নয়—তামাক সিগারেট খাওয়া যাবে না! অমিতা হয়ত আমার হাতের পাইপটা দেখেই গম্ভীর হয়ে গেছে!"

"সে কি! বসুন আপনি।" হাসিতে এক ঝলক স্নিগ্ধতা ছড়িয়ে দিল অমিতা।

"পাগল—বস্‌লেই কথাবার্ত্তায় সাহিত্যের গন্ধ শুঁকে নিয়ে রঞ্জন সাহিত্যিক বলে ব্ল্যাকমেলিং সুরু করে দেবে—জার্নেলিষ্ট—ওদের চেনোনা ত! —ব্ল্যাকমেলিং-এর ফল দাঁড়াবে এই, মোটা চাঁদা আদায়ের লোভে সাহিত্যসভায় সভাপতি করতে আসবে আমায় যতো সব সংঙ্ঘ-সংসদ আর চক্রের চক্রীরা!"

"আমরাও কিছু চাঁদা আদায়েই এসেছি!" আসবার কারণটা পরিষ্কার করে নিল অনু।

"শুধু চাঁদাইত—প্রেসিডেণ্ট হওয়া ত নয়!"

"প্রেসিডেণ্টের বালাই আমাদের নেই।"

"বাঁচা গেল—" টুবাকো ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে মহীতোষ বললে: "সিগারেটের টিন নিয়ে পালিয়ে আয় রঞ্জন, রত্নার সঙ্গে বোঝাপড়া করুক ওরা।"

অনুর কথায় উজ্জ্বল হয়ে উঠছিল রত্নার মুখ—নিবিড় দৃষ্টিতে সে তাকিয়ে ছিল অনুর মুখের দিকে। ঠিক এম্নি একটি মেয়ের কল্পনা তার মনে ছিল যেন একদিন—যেদিন মাষ্টারির জীবনে এসে প্রথম ঢুকেছিল রত্না। জীবন হবে তার চলার আনন্দে চঞ্চল, জড়তায় পঙ্কিল হবেনা মন, আড়ষ্ট হবেনা কথা—কল্পনার এ মেয়েটিকে নিজের মধ্যে সে দেখতে চেয়েছে, এ মেয়েটিকেই ঘিরে তৈরী হয়েছে তার কামনার উষ্ণতা। কিন্তু সে যেন হারিয়ে গেল রত্নার পথ

থেকে ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে গেল তার শরীর পথের অন্ধকারে! সেই হারানো কল্পনা এতো বাস্তব হয়ে উঠতে পারে কি করে? রত্নার চোখের বিস্ময় অমিতা লক্ষ্য করছিল বারবার। অনুর বক্তব্য ফুরিয়ে এলে তাই তাকে বলতে হল: "এতো করে বোঝাবার কি দরকার, রত্নাদি ত আমাদের সঙ্গেই কাজ করবেন!"

"সত্যি করব কাজ—তোমাদের ক্যান্টিন কোথায় হচ্চে অনু?" রত্নার মুগ্ধ চোখ প্রাণচঞ্চল হয়ে উঠল।

"ভাবছি বালিগঞ্জ ষ্টেশনের কাছাকাছি কোথাও করলে হয়না?" অমিতার দিকে তাকাল অনু—কারণ এসব খুঁটিনাটি ব্যাপারে অনু নিজেকে কেমন যেন অসহায় মনে করে।

"ওখানকার ভীড়ে?" অমিতা হাসতে লাগল: "চাঁদার উপর ক'জনকে আমরা খাওয়াতে পারব?"

"হাত পাতলে সবাই দেবে চাঁদা—দেবেনা রত্নাদি?"

"কেন দেবেনা?"

"সবাই ত তোমার মতো নয় রত্নাদি—"অমিতার মন বাস্তবতাকে ডিঙোতে চায় না।

"চোখের উপর না খেতে পেয়ে লোক মরবে, ওদের খাবার জন্যে চাঁদা দেবেনা যারা দুবেলা খেতে পায় তারা?" রত্নার গলায় কথার শেষ দিকটা কেমন একটু নিস্তেজ হয়ে এলো। মনে হল দুবেলা যারা খেতে পায় তাদের দানের উপর রত্নার বিশ্বাস খানিকটা টলে গেছে।

"আগে থেকে সে-কথা ভাবতে সুরু করলে তুমি কিছু করতে পারবে? সিনিক্যাল রিয়্যালিষ্ট হয়ে কি লাভ? প্র্যাক্‌টিক্যাল আইডিয়্যালিষ্ট হয়েই কাজ সুরু করতে হয়!" অনুর উৎসাহে ভাটার টান নেই।

অমিতার বস্তুনিষ্ঠতাও ভেসে যায় সে-উৎসাহের জোয়ারে: "অবশ্যি রত্নাদির সাহায্য পেলে আমরা অনেকদূর পর্য্যন্তই সাহস করতে পারি!"

জীবনকে ছেড়ে পাঁচমিনিট দেশের জীবনের কথা ভাবতে পারে একশোতে একজন এমন লোক পাবেনা তুমি।"

"লোকদের অবস্থা ঠিক আমাদেরই মতো—সেকেলে মেয়েদের মতো রত্নাদি। সব দেখেশুনেও চুপ করে থাকা!"

"তোমার সেকেলেপনার ইতিহাসটা সহজ নয়, অমিতা, তা আমি বুঝ্‌তে পারছি!"

"দেখ্‌তে ও ঠাণ্ডা মেয়ে—কিন্তু আসলে মোটেই তা নয়। আর যা-ই হোক রত্নাদিকে ফাঁকি দিতে পারোনি অমিতা।" অমিতার গৌরবে গর্ব্বিত হয়ে উঠল যেন অনু: "যাক্—তাহলে রত্নাদি, তোমাকে আমরা পাচ্ছি ত?"

"তোমাদের কাজ হ'বে আমাকে দিয়ে?"

"বেশ কথা বল্‌ছ! একাজে দায়িত্ব যেমন সবার তেম্নি সবাই তা সমানভাবেই করতে পারে! মানুষ মারার না কি থ্রিল্ আছে —জানিনে, সৈন্যেরা তা বল্‌তে পারে—আমার মনে হয় মানুষকে বাঁচাবার থ্রিল তার চেয়ে ঢের বেশি! বজ্‌রার জল নয়, একটু দুধ পেয়ে বেঁচে উঠ্‌ছে কচি-কচি মুখগুলো—একটু ভাত জীবনের আগ্রহ ফুটিয়ে তুল্‌ছে ঘোলাটে মুমূর্ষু চোখে, আমাদের একটু মমতায় সন্তানের জন্যে ফিরে আস্‌ছে মায়ের মমতা, স্ত্রী ফিরে পাচ্ছে স্বামীর ভালোবাসা—কতোখানি থ্রিল এতে ভাবতে পারো রত্নাদি? এ-থ্রিল কতো সাহস, কতো শক্তি এনে দেয়! কাজ করবার এর চেয়ে বড়ো সুযোগ জীবনে আর ক'টা আসে?" রক্তের আভায় অদ্ভুত দেখাল অনুর মুখ—মনে হচ্ছিল তার, আবারও যেন কোনো ছাত্রসভায় আবেদন জানাতে দাঁড়িয়েছে সে। আকুলতায় ঠিক তেম্নি ভরে উঠেছে বুক—কথাগুলো যেন সে-আকুলতারই উষ্ণ অবারিত স্রোত।

মুগ্ধের মতো তাকিয়ে রইলো রত্না—অনুর মুখের দিকেই অথচ অনুর মুখ তার দৃষ্টিতে নেই। কোনো দৃষ্টিই যেন ছিল না রত্নার—

শুধু জেগে আছে মন, মনের ক্ষীণ একটি ধারা ছোট ছোট কথার ঢেউ তুলে চলেছে। হয়ত সবারই শক্তি আছে। আছে রত্নারও। কিন্তু শক্তি থাকাটাই সব নয়। নিজের শক্তিতে আনন্দ পাওয়া চাই। অনু যেমন পায়। সে আনন্দের ছবি তার চোখেমুখে। অনুই পারে—অনুর মতো যারা তারাই পারে জীবনকে সঙ্কীর্ণতা থেকে মুক্তি দিতে। নিজেকে হারানো তা নয়। নিজেকে বড়ো করে পাওয়া। বড়োর মধ্যে নিজেকে পাওয়া। মনকে উপোসী থাকতে হয়না তবেই। অতৃপ্তিতে তেতো হয়ে ওঠেনা জীবন।

রত্নার মুখে হাসি ফুটে উঠল। দুর্য্যোগের রাত্রি শেষ হয়ে একটি সুন্দর প্রভাত ফুটে উঠেছে যেন তার চোখে।

অনু আর অমিতার মুখেও তেম্নি হাসি। ঘরের আবহাওয়াটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল আলোর শুচিতায়। রৌদ্রস্নাত কোনো উন্মুক্ত প্রাঙ্গন যেন দেয়ালগুলো ভেঙে হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ঘরের এই অবরুদ্ধ ছায়ায়। মহীতোষের দামী আসবাবগুলোর কোনো অর্থ, কোনো অস্তিত্বই যেন নেই আর সেখানে। নিবিড় নিঃশব্দতায় অনু শুনতে পাচ্ছে তার হাতঘড়িটার আওয়াজ—কান পেতে রত্না শুনতে পাচ্ছে হৃদপিণ্ডের উপর প্রথম আলোর চরণধ্বনি।

একটা বড়ো রকমের পট ভর্ত্তি কফি নিয়ে বসেছে মহীতোষ। রঞ্জন অবাক হয়ে গেছে—তার যাযাবরী মেজাজও এতোটা কফি কোনো সময় বরদাস্ত করতে পারবে বলে মনে হলনা।

"কফির অভ্যাসটার জন্যে প্রবীরের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নির্দ্দোষ অথচ অদ্ভুত ঝাঁজালো নেশা।" কৌতুকী হাসিতে অতীত দিনের দিকে যেন একটা সেলাম ঠুকে দেয় মহীতোষ।

আশ্চর্য্য গম্ভীর দেখাচ্ছিল আজ রঞ্জনকে। তাকেও যেন অতীত দিনের অস্থিরতা থেকে আজকের দিনের স্থিরতায় কে ঠেলে

দিয়েছে। তারও কথা বলায় নেশায় ঝিমুনি এসে গেছে যেন। চুপ করে রইল রঞ্জন।

"একটা কথা অদ্ভুত লাগে ভাবতে, জানিস রঞ্জন?" মদ ঢালার ভঙ্গীতেই মহীতোষ পেয়ালায় কফি ঢালতে সুরু করল: "সিরিয়াসলি ব্যবসা করব কোনো দিন মনে করিনি—কিন্তু সিরিয়াস্ হয় উঠতে হ'ল।"

"টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রীর বৈঠকে বোম্বে যাচ্ছিস্ না কি?"

"ওয়াইণ্ডিং, ওয়ার্পিং আর উইভিং মাত্র যে কারখানায় হয়, টেক্সটাইল ইণ্ডাষ্ট্রীর বৈঠকে তার পরিচালকের নিমন্ত্রণ হয়না—যাক্—ওকাজগুলোও সিরিয়াসলি করতে হচ্ছে কারখানায়, চার বছর আগে যা স্বপ্নেও ভাবিনি। শমীনও ঠিক তেমনি, আজকের মতো ঘোরতর 'স্বদেশী' হয়ে যাবে পাঁচ বছর আগে কি সে-কথা ভাবা যেত? আর সুদাস—কি রকম যেন হয়ে গেল ও।"

"সুদাসের কথা বলে লাভ নেই, টাকার নেশায় ধরেছে ওকে। রঞ্জন তাড়াতাড়ি একটা সিগারেট হাতে তুলে নিলে কারণ সুদাসের প্রসঙ্গে মন দিলে, মনে হচ্ছিল তার, বন্ধুত্বের সম্মান রাখতে পারবেনা।

"তুই আর প্রবীর কিন্তু যে-কে-সেই—" মহীতোষের হিসেব-নিকেশ বন্ধ হলনা।

"এক নিশ্বাসে প্রবারের মতো মহাজন ব্যক্তির নামের সঙ্গে আমার নাম উচ্চারণ করছিস কেন?" ঘাড় কাৎ করে সিগারেটটা ঠুক্‌তে লাগল রঞ্জন: "ওরা কাজের মানুষ—জিগির তুলে দুর্ভিক্ষ তাড়াবে, সংকীর্ত্তন করে গাঁয়ের লোক যেম্নি ওলাউঠা তাড়াতে চায়? ওদের কাজের রিপোর্ট ছেপে দেশের লোককে আশ্বাস দেওয়াই ত এখন আমাদের মতো জীবদের জীবিকা! এক্সটার্নেল-ইণ্টারন্যাল ডিফেন্সের গুরুভার মাথা পেতে নিয়েছে ওরা—পত্রিকার মালিকরাও মেনে নিচ্ছেন ওদের এ-দায়িত্বের কথা!"

দেশলাই-এর আগুনটা রঞ্জনের সিগারেটে ছুঁইয়ে এনে নিজের পাইপের উপর ধরে দাঁত-চাপা আওয়াজে বল্‌লে মহীতোষ : "দুর্ভিক্ষ? —দুর্ভিক্ষ হবেই মনে করছিস না কি?"

"মনের রাজ্য ছেড়ে পথেঘাটে ওর বিচরণ সুরু হয়ে গেছে।"

"প্রবীরের বোন—মানে অনুর কাজটা তাহলে এড্‌মিরেব্‌ল্‌।"

"হয়ত!"

"কিন্তু তুই কি করে এসে জুটলি এদের দলে?"

"ওরা জুটিয়ে নিলে!"

"বটে? তা-ও আজকাল হয় নাকি?"

ভয় পেয়ে শুকিয়ে উঠ্‌ল রঞ্জন। আগেকার মতোই আছে না কি মহীতোষ?

মহীতোষ আপন মনে হাস্‌তে সুরু করল। কথার পর কথা খুঁজে চলল রঞ্জন মনে-মনে। মহীতোষের কথার বাঁকটা ঘুরিয়ে দেওয়া দরকার—পাশের ঘরেই অমিতা আর অনু বসে আছে!

কিন্তু বসেও বা আছে কোথায় ওরা—আর্ত্ত চোখে তাকাল রঞ্জন—অনু প্রায় চ্যালেঞ্জ করে এসে দাঁড়াল মহীতোষের সামনে। পেছনে রত্না আর অমিতা।

"আপনি এ কি করেছেন, মহীদা—"

চম্‌কে উঠ্‌তে হল মহীতোষকে। অনুর সস্মিত অনুযোগের জন্য নয়, 'মহীদা' কথাটার সুরের জন্যেই। আশ্চর্য্য, ঠিক শ্যামলীর গলা যেন শুন্‌তে পাচ্ছে মহীতোষ! অভিভূতের মতো তাকালো সে অনুর দিকে।

"এক ট্রে বোঝাই করে খাবার দিতে বলেছেন আমাদের! আর কখ্‌খনো আপনার বাড়ি আসব না ত!"

"খাবার দিতে বলেছি কিন্তু ট্রে বোঝাই করতে ত বলিনি!" মহীতোষ মনে-মনে একটা মিষ্টি স্বাদ উপভোগ করে চলেছে।

"এক কাপ চা ছাড়া আর কিছুই মুখে তোলেনি অনু—অমিতাও তাই!" নালিশ জানালে রত্না।

"ওরা ত খেতে আসেনি, মিসেস মুখার্জ্জি, অন্যের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে এসেছে!" দুশ্চিন্তার শেষে রঞ্জন খুসী-খুসী মুখে বল্‌লে।

"রঞ্জনদার সাহিত্যে কান দেবেন না মহীদা—খিদে নেই বলেই কিন্তু খাইনি আমরা!" রঞ্জনের কথায় অনুর আপত্তি আছে।

"তোমাদের দুজনেরই একসঙ্গে খিদে নেই? চমৎকার কম্রেড্‌শিপ ত!"

"এ কম্রেড্‌শিপে রত্নাদিও জয়েন করলেন কিন্তু!" অমিতা হাস্‌তে লাগল।

"তাহলে খাবারগুলো মাঠেই মারা যাচ্ছে? কি আর করা যায় রঞ্জন, আমার আর তোর ভাগ্যেই শিকে ছিঁড়ল!" সশব্দে হেসে উঠ্‌ল মহীতোষ।

সঙ্গে সঙ্গে হাস্‌তে লাগ্‌ল সবাই।

হঠাৎ হাসি থামিয়ে বল্‌লে অনু: "আজ চলি মহীদা। আরেক-দিন নয় আরো অনেক দিন আস্‌ব!"

হাসিটা ম্লান হয়ে অন্যমনস্ক হয়ে উঠ্‌ল মহীতোষের মুখ। ছোট করে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালে সে, তারপরই একটি বিস্মৃত মেয়ের মুখ স্মরণ করতে লাগল মনে-মনে। অদ্ভুতভাবে এখনও কি করে বেঁচে আছে শ্যামলী তার রক্তের অতলে। হয়ত বেঁচে ছিল সে—যখন মহীতোষ মনে করেছে বেঁচে নেই—তখনও। বেঁচে না থাক্‌লে অনু এসে তাকে মনে করিয়ে দিতে পারতনা! মহীতোষের মনের বনিয়াদই হয়ত তৈরী করে দিয়ে গেছে শ্যামলী। শ্যামলীর হাসি আর বিষণ্ণতা রত্নার কাছে খুঁজে পেয়েছিল বলেই হয়ত হঠাৎ একদিন রত্নাকে ভালো লেগে গেল তার—আজ ভালো লাগ্‌ছে অনুকে, শ্যামলীর নির্ভীকতাই শুন্‌তে পেয়েছে মহীতোষ অনুর গলায়।

"চলো রঞ্জনদা—রত্নাদি যাচ্ছ ত তুমি অমিতাদের বাড়িতে কাল ?" সিঁড়িতে পা বাড়াল অনু।

"যাব কাল শমীনবাবুদের বাড়িতে !" অমিতার দিকে তাকিয়ে রত্না ঠোঁটে হাসি চাপ্‌তে সুরু করল।

"বেশ, তাই যেও।"

ওরা চলে গেল। রত্না আর মহীতোষ চুপ করে রইল খানিকক্ষণ। স্বপ্নে আচ্ছন্ন ওদের চোখ।

"ওদের ক্যান্টিনে আমি কাজ করব।" স্বপ্ন ভেঙ্গে কথা কয়ে উঠ্‌ল রত্না।

"বেশত !" সহজ হাসিতে স্বপ্নের ধূসর আভা কেটে গিয়ে উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌ল মহীতোষের মুখ : "তোমাদের চাঁদা আদায়ের খাতাটা তাহলে আমার কাছে দিও !"

মনোহরপুকুরের মোড়ে ট্রাম থেকে নেমে যাচ্ছিল অনু—অমিতা হাতের ব্যাগ খুলে তাড়াতাড়ি একটা চিঠি তুলে নিয়ে অনুর হাতে গুঁজে দিল : "মনেই ছিলনা—তোমার চিঠি।"

চিঠি হাতে নিয়ে নেমে গেল অনু—ট্রামের ঘণ্টা বেজে গেছে, কথা বলবার সময় নেই।

অমিতা পেছন ফিরে তাকাল রঞ্জনের দিকে—রঞ্জন অমিতার পাশে অনুর জায়গাতে উঠে এল। চিঠি সম্বন্ধে রঞ্জনের উৎসাহ থাকবার কথা নয়—অমিতা নিজে থেকেই হাস্‌তে সুরু করলে।

"কি ?" রঞ্জনকে উৎসুক হ'তে হল।

"ঋণ শোধ করলুম।"

কিসের ঋণ ? 'টাকা লেন-দেনের ব্যাপারে রঞ্জন উৎসুক হ'তে চায়না।

"শমীনের ঋণ। শমীনের চিঠি ওটা।" অমিতা চুপ করে রইলনা।

"ও"—রঞ্জনও নিঃশব্দে হাসতে লাগ্‌ল। অতীতের কয়েকটা পৃষ্ঠা উড়ে এসে তার চোখের সামনে দাঁড়িয়েছে যেন—উজ্জ্বল চোখে সামনের দিকে চেয়ে রইল রঞ্জন, লেখা আছে তাতে তার অন্ধকার দিনগুলোর কাহিনী—অস্থির, উদ্‌ভ্রান্ত আলোর পিপাসায় আকুল হয়ে উঠেছিল যখন তার স্নায়ু! কোথায় সে আলো আছে—জীবনের কোন্ প্রান্তে, পৃথিবীর কোন্ সীমান্তে শেষ হ'তে পারে এ-অস্থিরতার? চোখের উজ্জ্বলতায় আজ যেন রঞ্জন অতীতের সেই কালো কাহিনীকে বিদ্রূপ করতে থাকে। জীবন শুধু অন্ধকারই নয়—অন্ধকার পান করে থাক্‌তে পারেনা জীবন যদি তুমি না চাও থাক্‌তে—আলোতে বিদীর্ণ হবেই এ-অন্ধকার।

অমিতার চোখেও আলোর অফুরন্ত আকাশ। কি করে এল এ-আলোর ইঙ্গিত—কি করে সে সন্ধান পেল এর? এর বুঝি শেষ নেই—তীক্ষ্ণ হতে তীক্ষ্ণতর এর উজ্জ্বলতা যতোই এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে! কি বিরাট ব্যাপ্তিতে জীবনের পরিচয় পাচ্ছে অমিতা! জীবনের উষ্ণ স্পর্শ লেগে লেগে নিঃসঙ্গতার কুয়াসা কেটে গেল বুঝি তার। রত্না, অনু, রঞ্জন—এদের স্পর্শ হয়ত কোনো গভীরতর স্পর্শেরই ভূমিকা! তারপর হৃদয় দিয়ে স্পর্শ করতে পারবে অমিতা অনেক মাকে, অনেক বোনকে, অনেক স্বামীকে—যাদের স্নেহের রঙ তারই চোখের স্নিগ্ধতার মতো, ভালোবাসার রঙ যাদের তারই রক্তের মতো লাল!

চার

আকাশের ভয়ে পৃথিবী যেন আর অন্ধকার নয়—আকাশই এবার অন্ধকার। পিণ্ড পিণ্ড অন্ধকার আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে পৃথিবী, গড়ে তুল্‌ছে রাত্রির শরীর। মাটির কান্নায় তৈরী এ অন্ধকার। বীভৎস, করুণ কান্না।

পায়চারি করতে করতে একেকবারে দাঁড়িয়ে যায় সুদাস—কান পেতে সে-কান্নার সুরই শুনতে থাকে যেন। চার-বছর আগে এমনই একটা কান্না তার বুকেও ছিলনা কি? হাজরা রোডের একটা ঘরে পায়চারি করছিল সে তখন। তখন অবশ্যি রাত দশটা নয়—আসবাবেও ঝক্‌ঝকে ছিলনা তার ঘর, রেডিয়ো ছিলনা, হোয়াটনট ছিলনা, ছিলনা আড়াইশ টাকার এ খাট—তিন টাকা বারো আনার একটা তক্তপোষের জায়গা খালি পড়ে ছিল পায়চারি করবার জন্যে। কিন্তু তখনও একাই ছিল সে এখন যেমন একা। একা থাকবার দুঃসহতা ছায়ার মতো এখানেও বেঁচে আছে। একা থাকবার কান্নাও কি বেঁচে নেই তার বুকে? উপোসী, অসহায় কোনো অনুভব কি তার বুকে লুটিয়ে পড়ছে না কান্নায়, বাইরের এ-স্থূল কান্নার মতো না হোক—অস্পষ্ট, অদৃশ্য কোনো সূক্ষ্ম রেখায়? থম্‌কে দাঁড়িয়ে কান্নার সুর মিলিয়ে দেখতে চায় সুদাস।

আকাশ বড়ো হয়ে গেল—পাখা মেলবার অবকাশ পেল তার জীবন—মার মৃত্যুতে অনেক কথাই ভেবেছিল সুদাস। একটা বিরাট পৃথিবী স্বপ্ন তুলে ধরেছিল চোখে। একটা গতির বিদ্যুৎ ঝিলকিয়ে উঠেছিল চারদিকে। সে কি ভাবতে পেরেছে এ গতি শুধু পৃথিবীকে সঙ্কুচিত করে দেবে—আরো ছোট হয়ে যাবে তার আকাশ—সঙ্কীর্ণ, সরু তার দাঁড়াবার স্থান? তার একাকিত্বকে

তীব্র করে তুলতেই আসবে শ্যামলী—ভাবতে পেরেছিল কি সুদাস একথা? একটা অদৃশ্য ষড়যন্ত্রই কি কাজ করে করে যাচ্ছে না তার জীবনে? এই ষড়যন্ত্রের খেলার পুতুল হয়ে থাক্‌বে না সে। থাক্‌তে সে চায় নি। একা থাকবার শক্তি আছে তার। শক্তি, বলিষ্ঠ স্বাস্থ্য। দুর্ব্বলতায় হাত বাড়াবেনা কারো দিকে—ষড়যন্ত্রের কৌতূহলী চোখ তৃপ্তিতে ভরে তুলবেনা সুদাস।

পায়চারিতে এবার একটু উদ্ধত ভঙ্গী ফুটে উঠল। যথেষ্ট বলিষ্ঠতা আছে তার। সবাইকে উপেক্ষা করে যাবার স্পর্দ্ধা আছে। সবকিছু উপেক্ষা করতে পারে সে। নূতন কনট্র্যাক্টে অংশীদারের কি দরকার—একটা সাপ্লাইং কোম্পানীর নামে সে একাই করতে পারে সব—কারো দরকার নেই, দরকার শুধু টাকার। টাকা আছে তার। চালের দালালরা জানে সুদাসের টাকা আছে। যারা ঘুষের আশায় ওৎ পেতে আছে সুদাসের কথা লুফে নেবে তারা! ভাবনার কিছু নেই—টাকা ছড়িয়ে দিয়ে টাকা কুড়িয়ে আনবে সুদাস—টাকার চাষ, টাকার ফসল!

"মা মাগো—"

কান পেতে শুনছে সুদাস—চীৎকার করে উঠল যেন অন্ধকার, বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে অন্ধকারের আত্মা ও'কটি কথায়। তার বুকেও ছিল না কি এ-অন্ধকার—কোনোদিন—কোনো সময়? ছিলনা এ-করুণতা? এই করুণতার উর্দ্ধে চলে এসেছে আজ সে। নিরেট কঠিনতা বলবে তাকে বলো! বলবে জীবন-বিধাতার উপর প্রতিশোধ? মন্দ কি! প্রতিশোধ নেওয়াও ত শক্তির সংগ্রাম! নুয়ে নুয়ে মার খেয়ে যায়নি ত সে! ওদের ক্ষুধার্ত্ত মুখের সাম্‌নে মুঠো-মুঠো চাল ছড়িয়ে দিতে পারে সুদাস, অনায়াসে পারে—কিন্তু কেন সে দেবে, তার কঠিনতা টলে উঠবে কেন। কেন সেই অদৃশ্য ষড়যন্ত্রের পুতুল হতে যাবে দয়ায় আর্দ্র হয়ে? দয়া, মমতা, স্নেহ, ভালোবাসা—এরা কি ভরে তুলতে পারে জীবন,

না জীবনকে শুধু আঘাতের পর আঘাতই দিয়ে যায়। সে-আঘাতের কাছে আত্মসমর্পণ কেন করবে সুদাস। জীবনকে পূর্ণ করতে গিয়ে বিক্ষত করবে কেন তাকে?

"ফ্যান দাও—মা—"

ভাত চায় না ওরা—শুধু ফ্যান। ভাত দিতে পারে সুদাস—একশো, দুশো, হাজারটা উপোসী মুখে একদিন দিতে পারে ভাত। একদিন দিতে পারে—পারে কি দু'দিন তিনদিন, সপ্তাহ, মাস, মাসের পর মাস? পারে কি দশহাজার, পঞ্চাশ হাজার, লক্ষ, দশলক্ষ মুখে ভাত তুলে দিতে? পারে না। তার স্বপ্নের আর কল্পনার সমস্ত ঐশ্বর্য্য দিয়েও পারে না। নিঃসম্বল বলেই পারে না, অসহায় দুর্ব্বল বলেই পারে না। কঠিনতার স্পর্দ্ধা তার দুর্ব্বলতারই একটা মুখোস নয় কি? শক্তি তার কতটুকু যে হাতে তুলে রেখে বিধাতার মতো স্পর্দ্ধা দেখায়?

"দাও মা—মাগো—"

দিতে যেওনা শ্যামলী—কতোটুকু দিতে পারো তুমি ওদের? …একমুঠো, দুমুঠো; তবুও দিতে পারলুম…বিরক্ত হয়ে উঠল সুদাস, কি সব কথা ভাবতে যাচ্ছে তার মন। কিন্তু একমুহূর্ত্ত আগে মনে মনে ছবিটা সত্যি দেখতে পেয়েছে সে। শ্যামলী হয়ত ছুটে বারান্দায় গিয়ে অন্ধকারে তাকিয়ে ডাকত ওদের। একমুঠো দু'মুঠো দিত ওদের ছেঁড়া ন্যাতায় ঢেলে। যদি থাকত শ্যামলী! যদি থাকত শ্যামলী, সুদাস কি পারত তাহলে ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে টাকার পাহাড় জমিয়ে তুলতে? ওদের মুখের গ্রাস ছোঁবার কল্পনায় কি শিউরে উঠতনা সুদাস? তখন জানত সে হৃদয় দিয়ে মানুষকে কি করে ছোঁওয়া যায়—যখন শ্যামলী ছিল। এখনো জানত তা যদি শ্যামলী থাকৃত। কিন্তু ভুলে গেছে এখন সুদাস সেই অদ্ভুত স্পর্শের কথা। ভুলে যেতে হয়েছে।

আলো নিভিয়ে দিলে সুদাস। বাইরের অন্ধকার ঝাঁপিয়ে পড়ল

ঘরের ভেতর। অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দেওয়া ভালো। কিন্তু এ-অন্ধকার নিয়ে এলো না কি কোনো কান্নার গুঞ্জন—মা, মাগো—তার নিঃশব্দ কান্না কি খুঁজে ফিরছেনা স্নেহকাতর দু'টি চোখ? শুধু বাইরে থেকেই এলো কি এ-অন্ধকার—তারই মন থেকে বেরিয়ে এলো না কি? বুঝবার শক্তি হারিয়ে যাচ্ছে সুদাসের। বিচারের ক্ষমতা কাজ করছে না আর। মাথার স্নায়ুতে নয়, কোথায় যেন একটা অস্থির উত্তাপ তীব্র হয়ে উঠ্ছে ধীরে ধীরে। কোথায়—তা-ও বুঝতে পারেনা সুদাস। হয়ত বুকের কোথাও, হয়ত গলায়, চোখে।

কান্নার অন্ধকারে নিজেকে ডুবিয়ে দিয়ে কি একটুও কাঁদবে না সুদাস?

সিগারেটের মশাল মুখে নিয়ে অন্ধকারে বেহালা থেকে হেঁটে বাড়ি ফিরছিল প্রবীর। একা, তবু যেন একা নয়। তার সঙ্গে সঙ্গে হেঁটে চলছে প্রণব, তার রুগ্ন স্বাস্থ্যহীন স্ত্রী আর শুকনো পাতার মতো তাদের ছেলেটি। হেঁটে চলেছে তার সঙ্গে—প্রবীররা নাকি খেতে দিতে পারে।

'খেতে দিন প্রবীরবাবু—আপনাদের চোখের বাইরেও উপোস করে আছে অনেক লোক—লপসী, খিচুরি যাহোক কিছু দিন তাদের খেতে!'

প্রণবের কথাগুলোই যেন তাড়া করেছে প্রবীরকে। রাত্রি হয়েছে বলে যে প্রবীরের যাওয়া দরকার ছিল বাড়ি তা যেন নয়। মনে হল যেন পালিয়ে এসেছে সে প্রণবের বাড়ি থেকে। পালিয়ে যাচ্ছে অন্ধকারে গা ঢাকা দেবে বলে! কিন্তু কোথায় পালাবে—পেছনে পেছনে আসছে যেন ওরা—প্রণবের কথার ধাক্কায় হোঁচট লাগছে পায়ে।

'যারা খেতে পায়না তাদের নিয়ে গল্প লিখতে কি পথের দিকেই

তাকাতে হয় প্রবীরবাবু—ঘরের একটা ভাঙা বেড়ার আড়াল কি এতোই বেশি? জীবনে যাদের অনেক স্বপ্ন ছিল কিছু যারা পায়নি—আর আজকের দিনে সেই না-পাওয়ার দল একমুঠো ভাতের জন্যে, এক টুক্‌রো কাপড়ের জন্যে, একটু বেড়ার আড়ালের জন্যে নিজেদের যে তিল তিল করে বিকিয়ে দিচ্ছে, ক্ষয় করে ফেল্‌ছে—আপনাদের মনে কি সে-ট্র্যাজেডির কোন দাম নেই?'

দাম হয়ত আছে। কিন্তু কি করতে পারে প্রবীর? দিতে পারে সে দাম? সুস্থ সুন্দর জীবনে ফিরিয়ে আন্‌তে পারে কি তাদের? ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা ছিল কি তার কিছু? ছিল শুধু কল্পনা। কল্পনার আর আদর্শের কি দাম আছে যদি তা শুধু মাথাকেই আশ্রয় করে থাকে? মাথার যন্ত্রণা নিয়েই পালিয়ে এসেছে প্রবীর। প্রণবের আবহাওয়ায় মাথা তার ঝিম্‌ঝিম্‌ করছিল। ভয় করছিল তার রুগ্ন স্ত্রীর চোখের দিকে তাকাতে। পাঁচ বছরের ছেলেটিকে মনে হচ্ছিল মমির মতো। ওরা কি ফুটপাথ থেকেই বেড়ার আড়ালে গিয়ে দাঁড়িয়েছে—প্রণবের স্ত্রী আর ছেলেটি? প্রণব বলছিল: 'প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন খাওয়ার?—তাহলে ফুটপাথে যেতে পারি!'

প্রতিশ্রুতি? এ-প্রতিশ্রুতির কথা কোনোদিন ভেবে দেখেনি প্রবীর। ভেবেছে শুধু শোষণের অবসান হবে পৃথিবীতে—ফ্যাসিবাদের উচ্ছেদে সভ্যতার নবজন্ম হ'বে—বর্ব্বরতার শেষ অঙ্ক অভিনীত হচ্ছে, মনকে তৈরী করে নিতে হবে, দেশকে এগিয়ে নিতে হবে সুন্দর ভাবীকালের অভিনন্দন-রচনায়! ভাবতে পারেনি প্রবীর, দেশের লক্ষ লক্ষ মানুষ হাত পেতে খেতে চাইবে তাদের কাছে—খেতে না পেয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মরে যাবে! হাইদরকে মনে পড়ে হঠাৎ। ঝিমিয়ে আসে প্রবীরের পা। নিরন্নের দল স্তূপ-স্তূপ অন্ধকার তৈরী করে তুলেছে ফুটপাথগুলোতে! হাইদর যাদের কথা বলেছিল এরা তারাই। বাংলাদেশের গাঁয়ের স্নিগ্ধতা মুছে যায়নি

এখনো এদের চোখ থেকে—গায়ে এদের লেগে আছে হয়ত এখনো ধানের ফিকে গন্ধ কিন্তু তবু কতো দিন, কতো মাস এক মুঠো ভাত মুখে পড়েনি এদের! এই অবিচার আর অন্যায়ের বিরুদ্ধে বা কি করতে পেরেছে প্রবীর? হঠাৎ করে সুরু হয়নি এর আক্রমণ—ধীরে ধীরে সমাজের শরীরে প্রবেশ করেছে এর বিষ—সমাজের চিকিৎসক হয়েও বুঝতে পারেনি কেন তারা সে-কথা? হাইদর বুঝতে পেরেছিল কিন্তু প্রবীরের মতো যারা তারা কেন বুঝতে পারেনি এই ব্যাধির আক্রমণ? হয়ত বুঝতে চায়নি। বুঝতে চাইলেও বা কি করতে পারে তারা? কি করতে পারে হাইদর? নিরন্নতার করাল স্রোত বন্ধ করে দিতে পেরেছে কি সে?

কিন্তু প্রবীর কি করে জানে, স্রোতের একটি বা দু'টি মুখ যে হাইদর বন্ধ করে দেয়নি! হয়ত দিয়েছে। স্রোতের এই ভয়াল তীব্রতায় তার চিহ্ন আঁকা নেই বলেই কি ভাবতে পারে প্রবীর যে হাইদর কারো মুখে ভাত তুলে দেয়নি! নিমকহারাম হয়ে বাঁচতে চায়নি সে। যদি বেঁচে থাকে নিমকহালাল হয়েই বেঁচে আছে হাইদর!

হাইড্রেন্টের জল নিয়ে ঝগড়া বেধে গেছে একটা দলের মধ্যে। বজরা জুটিয়ে এনেছে; তা-ই ভেজানো নিয়ে কাড়াকাড়ি। দাঁড়িয়ে দেখছিল প্রবীর। বজরার একটা কাচা পিণ্ড চিবুতে সুরু করেছে এক বুড়ো। জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বাংলার চাষী বিহারের বুনোশস্যের তুষক্ষুদকুঁড়ো আঁকড়ে ধরেছে! প্রবীর দাঁড়াতে পারল না আর। রূপশালি, চামরমণি, মোহনভোগ, ফুলপরশুম ধানের ফুলের পাপড়ি তৈরী করেছে যে আজীবন, জীবনের শেষপ্রান্তে এসে কলকাতার হাতে তার চমৎকার পুরস্কার মিলল! সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল প্রবীর।

আর এই সদর ফুটপাথ নয়। কালিদাস পতিতুণ্ডি লেনের বাঁক ধরল প্রবীর। সেখানেও এরা! ছোট তেকোণা একটা মাঠে

শ্লিট-ট্রেঞ্চের গা' ঘেঁষে দলা পাকিয়ে আছে এক দল। তবুও ভালো, নির্জীব—হয়ত ঘুমিয়ে পড়েছে। দ্রুত পায়ে এদের পার হয়ে গেল প্রবীর। কিন্তু পার হতে পারল কি সত্যি? তার চোখ কি ছবিটাকে তুলে নিয়ে এলোনা সামনে করে? কবরের পাশে অপেক্ষা করছে যেন মৃত্যুযাত্রীরা—মৃত্যুকে এমন সাদর সম্ভাষন জানাতে পারে না আর কেউ, জীবনের এর চেয়ে বড় অপমান বুঝি আর নেই! চোখের সামনে নাচতে স্থরু করল ছবিটা—জোরে জোরে পা চালিয়েও ছবিটাকে প্রবীর পেছনে ফেলে আসতে পারছেনা। চোখ বুঁজে অন্ধকারে সে দাঁড়িয়ে রইল খানিকক্ষণ। দিনের কাজের ছবি স্মরণ করে নিতে চাইল মনে-মনে। খিঁচুরি খাওয়ানোর তদ্বিরে ছুটোছুটির ছবি। লাইনবন্দী হয়ে অপেক্ষা করতে পারে না বলে এদের ধম্‌কে দিতে হয় মাঝে-মাঝে—ধম্‌কে না দিলে শৃঙ্খলা আনা মুস্কিল! কিন্তু কাদের পায়ে শৃঙ্খলা আন্‌তে চায় প্রবীর? মৃত্যুযাত্রীদের পায়ে? কবরের পাশে অপেক্ষা করছে যারা, তাদের পায়ে কিসের শৃঙ্খলা চায় সে? মৃত্যুর অপেক্ষায় তারা স্থশৃঙ্খল, জীবনের জন্যে আর নয়। চোখের অন্ধকারেও ফুট্‌তে স্থরু করেছে ছবিটা—চোখ মেলে ভয়-পাওয়া পায়ে হাঁটতে স্থরু করল প্রবীর—আরেকটা গলি ধরে আবার হাজরা রোডে গিয়ে পড়াই ভালো।

রত্না ঘুমিয়ে পড়েছে কিন্তু ঘুমুতে পারছিলনা মহীতোষ। কান্নায় অভ্যস্ত হয়ে এসেছে কান—তবু খানিকক্ষণ আগে বুড়ির সেই চীৎকার ছুরীর ফলার মতো কেটে দিয়ে গেছে যেন হৃদ্‌পিণ্ড। রত্না ক্যান্টিনে ছিল—শোনেনি কিছু—শোনাতে ইচ্ছাও করছিলনা মহীতোষের ভয় করছিল, শুনে হয়ত ঘৃণায় কালো হয়ে উঠ্‌বে রত্নার মুখ—ক্ষমাহীন কঠোরতায় জ্বলে উঠ্‌বে তার চোখ। সমস্ত পুরুষের হীনতার কাহিনী একটি মেয়ের কাছে বল্‌তে পারেনি মহীতোষ!

কিন্তু সে-কাহিনী নিজেকে বারবারই শুনিয়ে যাচ্ছে তার মন। বাইরের হাওয়ায় কোথাও আর জেগে নেই বুড়ি মার অসহায় কান্না—নিজের হৃদ্‌পিণ্ডে সে-কান্নার ধ্বনি শুন্‌তে পাচ্ছে মহীতোষ। সমস্ত রাত্রিও এ-সুর আর থাম্‌বেনা। "কে নিয়ে গেল বাবা, আমার মাকে—ভাত দেবে বলে নিয়ে গেল—কোথায় গেল আমার মা?" কোথায় গেল। কোথায় গেল এ অসহায় মার মেয়ে—বুঝতে পারে মহীতোষ। কিন্তু এনে দিতে পারে কি? সে তার চাকরকে এদিকে ওদিকে খুঁজতে পাঠাল তবু—খোঁজ মিল্‌বেনা জেনেও। পালিয়েই ঘরে এসে চুপ করে বসে ছিল মহীতোষ। বাইরের অন্ধকারে কি হ'ল তারপর তা সে জানেনা। সে-কান্না ক্ষীণ হয়ে হয়ে মিলিয়ে গেল একসময়।

জানালার কাছে উঠে এসে অন্ধকারে তাকিয়ে রইল মহীতোষ। কেন সে ভুল্‌তে পারছেনা এ-কান্না? তার রক্তকণাগুলোকে রোগবীজাণুর মতো জড়িয়ে ধরেছে কেন এর সুর? কেন এ প্রশ্রয় পাচ্ছে তার রক্তে? তার রক্তের কোনো অপরাধে? প্রায়শ্চিত্তের জন্যে দরকার ছিল বুঝি কান্নার এই অভিশাপ। অশ্রদ্ধা দিয়ে যাদের জীবন অপমানিত করে তুলেছিল মহীতোষ, এ কি তাদেরই অভিশাপ? আজ সমস্ত রাত্রি জেগে থাকলে কি তাদের ব্যথা মুছে দিতে পারবে সে? ক্ষমা করবে তাকে সে-মেয়েরা? তামার টুকরোয় রক্তমাংসের দাম দেওয়ার অপরাধ ক্ষমা করবে কি তারা?

দারিদ্র্যকে অপমান করেছে মহীতোষ, টাকার স্পর্দ্ধাতে নয় মনই তার দরিদ্র ছিল হয়ত।

কিন্তু আজও কি দারিদ্র্য থেকে মন মুক্তি পেয়েছে তার? কি করতে পারে সে? কতটুকু করতে পারে? কলকাতার সমস্ত গলিঘুঁজি ঘুরে খুঁজতে গেলনা ত সে মেয়েটিকে। এটুকু আগ্রহ ত থাক্‌তে পারত তার। নিজেকে ছেড়ে হাত বাড়িয়ে দিতে পারত। কিন্তু ততটুকু দূরে তার দৃষ্টি পৌঁছয় না। নিজেকে—শুধু নিজের

চারটি দিকে পরিচ্ছন্ন করে তুলেছে মহীতোষ। তার বেশি কিছু নয়। একটি পরিচ্ছন্ন বাগান তৈরী হয়েছে শুধু—রত্না একটি দুষ্প্রাপ্য ফুলের গাছ।

জানালায় আর দাঁড়াতে পারছিলনা মহীতোষ—ক্লান্তিতে অবশ হয়ে আস্‌ছে মাথা—ভাবতে পারছেনা সে আর কোনো কথা। চিন্তার পথ বন্ধ হয়ে গেছে।

সবুজ-শেডের আলোটা জ্বেলে রত্নার বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল মহীতোষ। সবুজ আলোতে রত্নার ক্লান্ত মুখ আরো ক্লান্ত দেখাচ্ছে—কিন্তু মসৃণ আর তাই সুন্দর। পাশে বস্‌ল মহীতোষ সন্তর্পণে। নিটোল দেহের সাদর নিমন্ত্রণ পেয়েছে যেন তার চোখ। যান্ত্রিক অভ্যস্ততায় মহীতোষ হাত দিয়ে ছুঁতে গেল রত্নাকে। কিন্তু হাত সরিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল তেমনি একটা অদৃশ্য বিদ্যুৎ তাড়নায়। ঘুমাক রত্না। মহীতোষ নিজের বিছানায় এসে বসল।

সমস্ত দিনের কলরব আর উত্তাপ মুছে ফেলতেই ঘুমোবার আগে অনু ছাদে যায়। ওখানে অনেকখানি স্তব্ধ আকাশ আর অফুরন্ত হাওয়া। দিনের একটি মুহূর্ত্তও চিন্তার অবকাশ দেয়না—নিজেকে একা পাওয়া যায় না একটি মুহূর্ত্তও। এখন সে একা, নিবিড়ভাবে একা। রাত্রির দিকে তাকাতে পারে অনু—সময়কে যেন চোখে দেখতে পাওয়া যায়। সময়ের একটা অস্পষ্ট গুঞ্জন রাত্রির শরীরে শুনতে পাচ্ছে না কি অনু? রাত্রির সওয়ার হয়ে এক দিকপ্রান্ত হতে ছুটে চলেছে সময় অন্য এক দিকপ্রান্তে। এখনো সতেজ, তরুণ রাত্রি। তার খুরের ঘায়ে আহত হচ্ছে পৃথিবী—অসহায় পল্লী আর নগর। হাওয়ায় সেই আহত আত্মার বিলাপ শোনা যায়। দিনের কলরবে শোনা যায়না, রাত্রির হাওয়ায় কেঁপে ওঠে, কেঁদে ওঠে কঙ্কালের সমুদ্র ঃ

"মা-মাগো—ফ্যান দাও—"

কান্নার একটা ক্ষীণ শিখা কেঁপে কেঁপে আকাশের দিকে হাত বাড়ায়, মিনতি জানায় রাত্রিকে। মিনতি—আর কিছু নয়। আর ওদের বলবার নেই—আক্রোশ নেই, দাবী নেই। অশ্রুসজল চোখে ব্যথার নৈবেদ্য তুলে ধরেছে রাত্রির দেবতার পায়ে! তোমাদের কাছেও সেই মিনতি রেখে যাচ্ছে ওরা। মৃত্যুও চোখ থেকে সে মিনতি মুছে নেয়না। তোমাদের ক্ষতি চায়নি ওরা—ভাগ বসাতে চায়না তোমাদের ভোগে। শুধু ফ্যান চায় ওরা যা তোমরা ফেলে দাও, পথের কুকুরও যা শুঁকে যায় না, সেই ফ্যান। ভাত নয়, তোমাদের ভাত তোমাদেরই থাক্—শুধু একটু ফ্যান দাও আমাদের। তা-ও কি দিতে পার না? তোমাদের ফেলে দেওয়া অবহেলা নিয়ে রক্তমাংসে বেঁচে উঠুক তোমাদের মতোই মানুষ, তা-ও কি চাওনা তোমরা?

অনু অন্যদিকের আলসে ধরে দাঁড়ায়। চাঁদার জন্যে অনবরত ঘুরতে হচ্ছে—যথেষ্ট দিচ্ছেন রত্নাদি—ক্যান্টিনের খবরদারি করে অমিতার সময় নেই—একাই ঘুরতে হয় অনুকে। ঘুরেও বা কতটুকু ফল হচ্ছে—শ্রান্তির তুলনায় ক'টা আর টাকা তুলে আন্‌তে পারছে অনু? দুধ আর চাল নিয়ে যায় যারা তাদের তিনগুণ ফিরে যায় রোজ! ক'দিন চলবে অনুর ক্যান্টিন? বড়দা হয়ত হাসছেন, ক্ষুদ্রের দীনতায় মহতের মাহাত্ম্যপূর্ণ হাসি!

শমীনদা যদি বাইরে থাক্‌তেন!

কবে আসবেন শমীনদা? তিনি নিজেও তা জানেন না। কিন্তু আসবেন একদিন তিনি—সেদিন অনু তার সব ক্লান্তি, সব শ্রম শমীনের হাতে তুলে দিয়ে হাসিমুখে তার পাশে গিয়ে দাঁড়াবে। 'তোমার দেওয়া কাজ সবই আমি করতে চেয়েছি শমীনদা—যেটুকু পারিনি তুমি হাতে তুলে নাও। আমাকেও নাও আমার অক্ষমতা ক্ষমা করে!' কাল প্রভাতের সঙ্গে সঙ্গেই আস্‌তে পারে না কি

সে-দিনটি? আস্‌তে পারে। প্রখর প্রতীক্ষায় উজ্জ্বল হয়ে ওঠে অনুর চোখ।

শমীনদার মতো বা সুবীরের মতো আরো যারা হাজার হাজার কারাপ্রাচীরের আড়ালে পড়ে আছেন, তাঁরাও কি হঠাৎ একদিন এই কঙ্কালের মৃত্যুযাত্রার পথরোধ করে এসে দাঁড়াতে পারেন না? তাঁরাই পারেন রক্তমাংসের স্তবকে ফুলের মতো স্নিগ্ধ করে তুলতে এদের জীবন! এদের মিনতিকে দাবীর মর্য্যাদা দিতে পারেন তাঁরাই! তাঁরা আছেন। আছেন। বিশ্বাসে গভীর হয়ে ওঠে অনুর দৃষ্টি। অসহায়, নিঃস্ব ত মনে হয়না নিজেকে—না-ই-বা এলেন তাঁরা চোখের সামনে, তার মনে মনে, তার সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার মতো আছেন ত তাঁরা!

আর দূরে, অনেক দূরে আগা খাঁর প্রাসাদে মন্ত্রের মূর্ত্তির মতো বেঁচে আছেন কুটিরবাসী কেউ! সেই বিরাট দরিদ্রের মন কি আজ বাংলার নিঃস্ব প্রান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছেনা? তাঁর ব্যাকুল কামনা মাটিতে জন্ম নেবেনা কি তারপর? বাংলার কঙ্কালের উপর তৈরী হবে তাঁর স্বপ্নের ছবি: "I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country........" মুহূর্ত্তে-মুহূর্ত্তে এ-স্বপ্ন শপথের রূপ নিয়ে হয়ত চঞ্চল করে তুলছে তাঁর স্নায়ু!

রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকে অনু। মনে হয়, এ রাত্রি নয়। কোনো অন্ধকার সূর্য্য বুঝি ছায়া-রশ্মিতে ঢেকে দিয়েছে আকাশ—যে রশ্মি পান করে কুঁড়ি ফুল হয়ে ফুটে ওঠে।